Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও. রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা –
আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরাফাত শাহারিয়ার
রোলঃ ২৩১০০১১০৩৮৯

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "***<u>ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত</u>***" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে **আরাফাত শাহারিয়ার** , আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৮৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও. রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

<u>এক্সটারনালঃ</u>

মাও. মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "***ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত***" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **মাও. রাহাত আহমাদ** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আরাফাত শাহারিয়ার

আইডিঃ ২৩১০০১১০৩৮৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

১.ভুমিকা.....১

২.পর্যালোচনা.....৫

৩.ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি.....৭

৪.খিলাফতের ধারনা.....১০

৫.মহানবির (স) যুগে খিলাফিত.....১৬

৬.হযরত আবু বকর (রা.) এর যুগে খিলাফত..... ২১

৭. হযরত উমর (রা.) এর যুগে খিলাফত.....৩৪

৮. হযরত উসমান (রা.) এর যুগে খিলাফত.....৬১

৯. হযরত আলী (রা.) এর যুগে খিলাফত.....৭৯

১০.খোলাফায়ে রাশিদিন এর গুরুত্ব ও শিক্ষা.....৯৮

১১. হযরত হাসান (রা.) এর যুগে খিলাফত.....১০১

১২.হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর যুগে খিলাফত.....১০৩

১৩.ইয়াজিদ এর খিলাফত.....১০৭

১৪. দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার খিলাফত.....১০৯

১৫. মারওয়ান বংশ থেকে বাকি উমাইয়া খেলাফত.....১১০

১৬.আব্বাসি খিলাফত.....১১৫

১৭. উসমান অটোমান খিলাফত.....১২০

১৮. খিলাফতের বিলুপ্তি.....১২৬

১৯.খিলাফতের সুবিধা ও অসুবিধা.....১২৬
২০.খিলাফত বনাম আধুনিক বাস্তবতা ১৩০
২১. গনতন্ত্র ও খিলাফতের মিল অমিল.....১৩৩
২১.ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব ১৩৫
২২.বর্তমানে খিলাফতের ধারনা ১৩৭
২৩. আধুনিক বিশ্বে বাস্তবতা.....১৩৮
২৪. খিলাফতের বাধা কারা ১৩৮
২৫.খিলাফত এর জন্য কি করা উচিত.....১৩৯
২৬.উপসংহার.....১৪১

কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে অগনিত দুরুদ-সালাম বিশ্ব নবি মোহাম্মাদ স. এর উপর। স্মরণ করছি উম্মতের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ সাহাবায়ে কারাম রা. ও যুগের আকাবির রহ. দেরকে, যাদের ত্যাগ এবং শ্রম এর উছিলায় আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু তায়ালা তার দ্বীনকে আজকের জায়গায় দাড় করিয়েছেন। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ধর্ম। তিনি এতে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এজন্য ইসলামকে বলা হয় পূর্ণাংগ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবনে করণীয় খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের শাসন কেমন হবে তার বিস্তারিত বর্ণনাকে বলে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও এর প্রধানের হুকুমতকে বলা হয় খিলাফত।

এই লেখনিতে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের সামগ্রিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহুল আজিজ। যদিও ইসলামি শাসন ও খিলাফত ঘটনাটি এতই বিস্তিত যে এর সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সামান্য একটি থিসিস যথেষ্ট হবে না।তবুও এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এখানে খিলাফত ও বায়াত সহ যাবতীয় পরিভাসার সংজ্ঞা ও প্রকার,নবি মুহাম্মদ (স) থেকে নিয়ে খিলাফায়ে রাশেদিন ও তাদের পরবর্তী (উমাইয়া, আব্বাসী, অটোমান) খিলাফত এর নানাবিধ দিকের বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে বর্তমান যুগের মানব রচিত আইন বা গনতন্ত্র এর সাথে ইসলামি শাসন এর সরাসরি তুলিনা করা হয়েছে।তাছাড়া আধুনিক বিশ্বে ইসলামি খিলাফত এর বাধা,বাস্তবতা ও মুসলিম হিসেবে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় করণীয় আলোচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ও এ আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করলাম।

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত

ভূমিকা:

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের রূপরেখা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে এবং এই সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসন পদ্ধতি আবির্ভূত হয়েছে। তবে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা বা 'খিলাফত' কেবল একটি রাজনৈতিক কাঠামো নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের (System of Life) অবিচ্ছেদ্য অংশ।ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধি বা 'খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেখানে ক্ষমতার উৎস হিসেবে জনগণকে গণ্য করা হয়, সেখানে ইসলামি দর্শনে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ এবং রাষ্ট্র সেই ক্ষমতা আমানত হিসেবে পরিচালনা করে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যই ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে অন্য সকল মানবসৃষ্ট মতবাদ থেকে পৃথক করেছে।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "*জেনে রেখো, সৃষ্টি যাঁর, নির্দেশও চলবে তাঁরই।*" (সূরা আল-আরাফ: ৫৪) অর্থাৎ, মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আইন কার্যকর করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,"*সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে।*" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফতের গুরুত্ব

ইসলামি শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি কেবল পরকালীন মুক্তি নয়, বরং ইহকালীন শান্তি ও সাম্য নিশ্চিত করার গ্যারান্টি প্রদান করে।

ঐশী বিধানের প্রয়োগ: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। ব্যক্তিগত ইবাদত থেকে শুরু করে বিচার বিভাগ, অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি—সবকিছুতেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। একটি খিলাফত বা ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া এই বিধানগুলোর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন"*আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির।*" (সূরা আল-মায়েদাহ: ৪৪)সুতরাং, শাসন ব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা ঈমানের দাবি।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হলো 'আদল' বা ন্যায়বিচার কায়েম করা। ইসলামের স্বর্ণযুগে খলিফাদের শাসনামলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিক যে নিরাপত্তা ও অধিকার ভোগ করত, তা সমকালীন বিশ্বে বিরল।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন"*নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট পৌঁছে দিতে এবং যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করবে।*" (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

উম্মাহর ঐক্য: খিলাফত বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে একটি রাজনৈতিক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ

করে। এটি ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে ঈমানি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী বিশ্বশক্তি গঠন করে।রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,"*নিশ্চয়ই ইমাম বা খলিফা হলেন একটি ঢাল স্বরূপ, যাঁর পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং যাঁর মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা হয়।*" (সহীহ মুসলিম)

কেন এই বিষয়টি বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাগুলো যখন মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধানে হিমশিম খাচ্ছে, তখন ইসলামি শাসন ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

নৈতিক অবক্ষয় রোধ: বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনেক সময় নৈতিকতা ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখা হয়। কিন্তু ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় শাসককে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হয়, যা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন"*সেদিন তোমাদেরকে অবশ্যই নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।*" (সূরা আত-তাকাসুর: ৮)

ইসলামি শাসনে শাসককে জনগণের পাশাপাশি আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করতে হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ: সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার করাল গ্রাসে বিশ্ব আজ জর্জরিত। খিলাফতের জাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া রোধ করে দরিদ্র বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন"*যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।*" (সূরা আল-হাশর: ৭)

ইসলামের জাকাত ও ওশর ভিত্তিক অর্থনীতি সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়।

মানবাধিকার সুরক্ষা: বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের বুলি আওড়ানো হলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্বলের ওপর সবলের শাসন চলছে। ইসলামি খিলাফতে অমুসলিমদের (জিম্মি) অধিকার এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ধর্মীয় দায়িত্ব।বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (সা.) বলেন, *"*হে লোকসকল! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের ইজ্জত আজকের এই দিনের মতো, এই মাসের মতো এবং এই শহরের মতোই পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়।*" (সহীহ বুখারী)

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই থিসিসের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামি শাসন ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

* **খিলাফতের মূলনীতি চিহ্নিত করা:** কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন"*হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলিল আমর (কর্তৃত্বশীল) তাদেরও।*" (সূরা আন-নিসা: ৫৯)

***ঐতিহাসিক পর্যালোচনা:** খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমল বিশ্লেষণ করে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের মডেল উপস্থাপন করা।

*** আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এবং জাতি-রাষ্ট্রের (Nation State) যুগে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কতটুকু প্রয়োগযোগ্য তা খতিয়ে দেখা।

*** ভুল ধারণা নিরসন:** খিলাফত বা ইসলামি শাসন নিয়ে বর্তমান বিশ্বে যে উগ্রবাদ বা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে, তার বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত ও মধ্যপন্থা নীতি ব্যাখ্যা করা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন "*দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।*" (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)

গবেষণার সমস্যা ও যৌক্তিকতা

দীর্ঘকাল ধরে খিলাফত ব্যবস্থা অনুপস্থিত থাকায় মুসলিম বিশ্ব আজ রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত এবং পরনির্ভরশীল। আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে খিলাফতের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদিকে যেমন চরমপন্থী ব্যাখ্যা দেখা যায়, অন্যদিকে আধুনিকতাবাদের দোহাই দিয়ে খিলাফতকে অস্বীকার করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। এই দ্বিমুখী সংকটের সমাধান এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরাই এই গবেষণার প্রধান সমস্যা।রাসুল (সা.) সতর্ক করে বলেছেন,"*যে ব্যক্তি (খলিফার প্রতি) আনুগত্যের বাইয়াত বা অঙ্গীকার ছাড়া মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।*" (সহীহ মুসলিম)

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, একটি সঠিক নেতৃত্ব বা খিলাফত ব্যবস্থা মুসলিমদের ধর্মীয় অস্তিত্বের জন্য কতটা জরুরি। বর্তমান সংকটের সমাধান খুঁজতে এই গবেষণার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

গবেষণার প্রশ্নসমূহ

এই গবেষণাপত্রটি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে:

১. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র ও খিলাফতের সংজ্ঞায়ন কী এবং এর মূল স্তম্ভগুলো কী কী?

২. খিলাফতে রাশেদার প্রশাসনিক কাঠামো বর্তমান যুগের জটিল প্রশাসনিক সমস্যায় কী ধরনের সমাধান দিতে পারে?

৩. ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও অবস্থান আধুনিক মানবাধিকার সনদের তুলনায় কতটা বাস্তবসম্মত?

৪. বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক আইনের এই যুগে একটি একক খিলাফত রাষ্ট্র গঠন কি আদৌ সম্ভব, নাকি এর বিকল্প কোনো কনফেডারেশন ব্যবস্থা ইসলাম সমর্থন করে?

৫. ইসলামি অর্থনীতি ও বিচার ব্যবস্থা কি আধুনিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নাকি এটি একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিকল্প?

গবেষণার পরিধি

এই থিসিসটি মূলত খিলাফতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর আলোকপাত করবে।

এতে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে প্রাথমিক রেফারেন্স হিসেবে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওসমানীয় খিলাফতের পতন ও তার কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। পরিশেষে, আধুনিক মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।রাসুল (সা.) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, *"তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ চান, তারপর থাকবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফত..." (মুসনাদে আহমাদ)*

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কেবল একটি ইতিহাস নয়, বরং এটি একটি জীবন্ত দর্শন। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ যখন ক্লান্ত, তখন খিলাফতের আদর্শ হতে পারে বিশ্ব শান্তির নতুন দিশারি। এই থিসিসটি সেই আদর্শের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি অনুসন্ধানের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পর্যালোচনা

ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো 'তাওহিদ' (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) এবং 'শুরা' (পরামর্শ)। এখানে শাসক জনগণের নিকট দায়বদ্ধ এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনায় বাধ্য।ইসলামি শাসনব্যবস্থা বা 'সিয়াসাহ শরইয়্যাহ' সম্পর্কে যুগে যুগে আলীম, ফকিহ এবং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ তাঁদের মূল্যবান মতামত ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী এবং আধুনিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের মতামত

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইসলামি চিন্তাবিদগণ মূলত খিলাফতের আইনি কাঠামো এবং শাসকের যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

* ***আল-মাওয়ার্দি (মৃত্যু: ১০৫৮ খ্রি.):*** তার মতে, *খিলাফত হলো নবুয়তের উত্তরাধিকার এবং দ্বীন রক্ষা ও দুনিয়াবি বিষয় পরিচালনার একটি প্রতিষ্ঠান।*

বই- 'আল-আহকাম আস-সুলতানিয়া'

এই বইটিকে ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবিধান বলা হয়। এতে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা এবং ইমাম নির্বাচনের শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

* ***ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু: ১৩২৮ খ্রি.):*** তিনি 'সিয়াসাহ শারইয়্যাহ' বা শরিয়াহভিত্তিক রাজনীতির ওপর জোর দিয়েছেন। তার মতে, *ক্ষমতার মূল লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।*

বই- 'আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ'

তার আলোচনা মতে, শুধু আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং কেবল খিলাফত নয়, বরং শরিয়াহর প্রয়োগই ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

ইবনে খালদুন (মৃত্যু: ১৪০৬ খ্রি.):তিনি রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে 'আসাবিয়াহ' বা সামাজিক সংহতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তার মতে, *খিলাফতের পতনের পেছনে নৈতিক অবক্ষয় এবং সংহতির অভাব দায়ী।*

বই-'আল-মুকাদ্দিমাহ'

তার গ্রন্থে তিনি আসাবিয়্যাহ' (সামাজিক সংহতি) এবং রাষ্ট্র উত্থান-পতনের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।এছাড়াও,

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (মৃত্যু:১৭৬২ খ্রি) শাসনব্যবস্থায় নৈতিকতা ও সামষ্টিক জনকল্যাণের সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করেন ।

বই-'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'

ইমাম গাজালি (মৃত্যু:১১১১ খ্রি): *তিনি* ধর্ম ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সুলতানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন ।

পরবর্তী ও আধুনিক চিন্তাবিদদের মতামত

বিশ শতকে খিলাফতের পতন এবং জাতিরাষ্ট্রের (Nation-state) উত্থানের পর আধুনিক চিন্তাবিদগণ ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন।

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (মৃত্যু: ১৯৭৯ খ্রি.):তিনি 'থিও-ডেমোক্রেসি' বা 'খোদা-প্রদত্ত গণতন্ত্র' শব্দটির প্রস্তাব করেন। তার মতে, *সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর, আর মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বইয়ের রেফারেন্স: *'ইসলামি রিয়াসাত'* (Islamic State) এবং *'খিলাফত ও মলো কিয়াত'*।*

সাইয়্যেদ কুতুব (মৃত্যু: ১৯৬৬ খ্রি.):তিনি জাহিলিয়াত ও হাকিমিয়্যাহ (আল্লাহর কর্তৃত্ব) এর ধারণাকে সামনে আনেন। তার মতে, *মানব রচিত আইন দিয়ে শাসন করা হলো আধুনিক জাহিলিয়াত।*

বই-'মাআলীম ফিত তরিক'

তিনি 'হাকিমিয়্যাহ' (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব) এবং জাহিলিয়াতমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামি বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন

ড. তাকিউদ্দীন আন-নাবহানি (মৃত্যু: ১৯৭৭ খ্রি.): তিনি খিলাফত পুনপ্রতিষ্ঠাকে বর্তমান যুগের প্রধান ফরজ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং খিলাফতের একটি সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর রূপরেখা দিয়েছেন।

বই- 'নিযামুল ইসলাম'

তার আলোচনা থেকে আধুনিক খিলাফত রাষ্ট্রের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রূপরেখা পাওয়া যায় ।

আধুনিক যুগের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারা

কিছু আধুনিক চিন্তাবিদ মনে করেন যে, খিলাফত কোনো নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো নয়, বরং ন্যায়বিচার ও ইসলামের মূলনীতি রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য।

**** শাইখ রশিদ আল-গানুশি:*** তিনি ইসলামি মূল্যবোধের সাথে আধুনিক গণতন্ত্রের সমন্বয়ের কথা বলেন। তার মতে, *'শুরা' বা পরামর্শের আধুনিক রূপ হতে পারে সংসদীয় ব্যবস্থা।*

বই-'আল-হুররিয়্যাত আল-আম্মাহ ফিল দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ'

তিনি ইসলাম ও আধুনিক গণতন্ত্রের সহাবস্থান এবং তিউনিসিয়ার প্রেক্ষাপটে নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

**** ড. ইউসুফ আল-কারজাভি (মৃত্যু: ২০২২ খ্রি.):*** তিনি আধুনিক যুগে 'শূরা'র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং ইসলামি শাসনের মধ্যপন্থা তুলে ধরেন ।

বিশেষ বিশ্লেষণ ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি:

**** সার্বভৌমত্ব বনাম জনগণের ম্যান্ডেট:*** আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে শাসকের দায়বদ্ধতার আধুনিক ব্যাখ্যা।

**** মাকাসিদ-এ-শরিয়াহ:*** আধুনিক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের (ধর্ম, জীবন, বুদ্ধি, বংশ ও সম্পদ) সুরক্ষা।

**** অমুসলিমদের অধিকার ও নাগরিকত্ব:*** আধুনিক রাষ্ট্রে 'জিম্মি' ধারণার বিবর্তন এবং 'মিথাক-ই-মদিনা'র আলোকে সমান নাগরিকত্বের তত্ত্ব।

পরিশেষে বলা যায়, পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণ যেখানে খিলাফতের আইনি বৈধতা নিয়ে কাজ করেছেন, আধুনিক চিন্তাবিদগণ সেখানে বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামের রাজনৈতিক প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা করছেন।

ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি

ইসলামি শাসনব্যবস্থা মূলত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কোনো প্রচলিত রাজতন্ত্র বা নিছক গণতন্ত্র নয়, বরং এটি একটি 'খিলাফত' বা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ও কাঠামো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

সার্বভৌমত্বের মূল ভিত্তি (আল্লাহর একত্ববাদ) : ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে, মহাবিশ্বের প্রকৃত মালিক এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। মানুষের কাজ হলো তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আইন কার্যকর করা।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: *"জেনে রেখো, সৃষ্টি যাঁর, নির্দেশও চলবে তাঁরই।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৫৪)*এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ আইন প্রণেতা নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া

আইনের অনুসারী। ইসলামে পার্লামেন্ট বা মজলিসে শূরা আইন প্রণয়ন করতে পারে ঠিকই, তবে তা অবশ্যই কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক কাঠামোর মধ্যে হতে হবে।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই।" (সুনানে আবু দাউদ)*এটি রাজনৈতিক দর্শনের একটি মূল স্তম্ভ। শাসক নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতে পারবেন না, কারণ তিনি নিজেও আল্লাহর আইনের অধীন।

খিলাফত ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব: ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসককে 'খলিফা' বা 'আমির' বলা হয়। খলিফা মানে হলো প্রতিনিধি। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) করেছেন।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৬৫)*এখানে 'খলিফা' শব্দটি ব্যাপক। শাসক জনগণের কাছে দায়বদ্ধ এবং শেষ বিচারে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। ক্ষমতা কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, বরং একটি পবিত্র আমানত।

শূরা বা পরামর্শভিত্তিক শাসন :ইসলামি শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক নয়। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে জনগণের বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"এবং তাদের (মুসলমানদের) কাজ পরিচালিত হয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে।" (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৮)* রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে ওহি পাওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করতেন। ওহির বাইরের বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের বা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করাই ইসলামি রীতি।রাসূল (সা.) বলেছেন: *"যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে কখনো লজ্জিত হয় না।" (তাবারানি)*

সামাজিক ও আইনি ন্যায়বিচার :ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ইনসাফ কায়েম করা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা এর মূল ভিত্তি।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের হাতে ফিরিয়ে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)*বিচারব্যবস্থায় স্বজনপ্রীতি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কোনো স্থান নেই। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকেও সাধারণ নাগরিকের মতো আদালতে হাজিরা দিতে হতে পারে, যা ইসলামের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে।রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন: *"হে লোকসকল! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়।" (বুখারি ও মুসলিম)*

আনুগত্যের শর্ত ও সীমা: ইসলামি রাষ্ট্রে শাসকের আনুগত্য করা জনগণের কর্তব্য, তবে এই আনুগত্য নিঃশর্ত নয়। যদি শাসক আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে কোনো আদেশ দেন, তবে তা মানা যাবে না।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলিল আমর (কর্তৃপক্ষ) তাদের।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯)* এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের ক্ষেত্রে 'আনুগত্য করো' শব্দটি আলাদাভাবে ব্যবহৃত হলেও 'উলিল আমর'-এর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর অর্থ শাসকের আনুগত্য ততক্ষণই প্রযোজ্য যতক্ষণ তিনি আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবেন।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: *"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই।" (মুসনাদে আহমদ)*

বায়তুল মাল ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: একটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকের মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) নিশ্চিত করা। এর প্রধান উৎস হলো জাকাত, ওশর, খারাজ এবং জিজিয়া।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"যাতে সম্পদ শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭)*

ইসলামি অর্থনীতি পুঁজিবাদ বা সমাজবাদ নয়। এটি সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে যাতে সমাজের দরিদ্রতম ব্যক্তিটিও খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে।হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন: *"হে বনী আদম! আমি তোমাকে সম্পদ দিয়েছি নামাজ কায়েম করার জন্য এবং জাকাত প্রদান করার জন্য।" (মুসনাদে আহমদ)*

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার : ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা 'জিম্মি' বা সংরক্ষিত নাগরিক। তাদের জান, মাল এবং উপাসনালয়ের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের অপরিহার্য দায়িত্ব।রাসূলুল্লাহ (সা.) হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন: *"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের (জিম্মি) ওপর জুলুম করবে বা তাকে কষ্ট দেবে, কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।" (আবু দাউদ)* ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাদের ওপর জোরপূর্বক ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক জনগণের সেবক হিসেবে পরিচিত। খলিফা আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর শাসনামল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" (বুখারি)*এই জবাবদিহিতা শুধু দুনিয়ার মানুষের কাছে নয়, বরং পরকালে আল্লাহর কাছেও দিতে হবে। এই পরকালীন ভয়ই একজন শাসককে দুর্নীতিমুক্ত রাখে।

জিহাদ ও পররাষ্ট্রনীতি: ইসলামি শাসনব্যবস্থায় যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষা বা জুলুম প্রতিরোধের জন্য বৈধ। অন্য দেশ দখল বা সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য কোনো যুদ্ধ ইসলাম সমর্থন করে না।আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন *"তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯০)*

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি শাসনব্যবস্থার মূল আত্মা হলো 'তাকওয়া' বা আল্লাহর ভয়। এটি কেবল কিছু দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করা নয়, বরং এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ করা যেখানে মানুষ নির্ভয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে এবং প্রতিটি প্রাণী তার অধিকার পায়। কোরআন ও সুন্নাহর এই আদর্শগুলো যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে আধুনিক বিশ্বের অস্থিরতা দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব।খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি আজও ইসলামি শাসনের মূলমন্ত্র হয়ে আছে: *"যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে উমর ভয় পায় যে কিয়ামতের দিন তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"*

ইসলামি শাসন ব্যবস্থার নীতিমালা

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা বা 'খিলাফাহ'মূলত কুরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশিত কিছু মৌলিক স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এটি আধুনিক শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ভিন্নধর্মী এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের কল্যাণ ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রধান নীতিমালাগুলো হলো:

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব: ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে, চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি বা 'খলিফা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কোনো শাসকই আইনের ঊর্ধ্বে নন এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কোনো আইন তৈরি করার অধিকার কারো নেই।

পরামর্শ বা শূরা : ইসলামে একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারের কোনো স্থান নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে নিতে হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:*"এবং তাদের (মুমিনদের) কাজ সম্পন্ন হয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)*

ন্যায়বিচার : ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান বিচার নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। শাসকের নিজের বিরুদ্ধেও যদি অভিযোগ ওঠে, তবে বিচারকের সামনে তাকে সাধারণ নাগরিকের মতো দাঁড়াতে হয়। একে 'আইনের শাসন' বা Rule of Law-এর সর্বোচ্চ পর্যায় বলা যায়।

আমানতদারি ও দায়বদ্ধতা : রাষ্ট্রীয় পদগুলোকে একটি পবিত্র 'আমানত' হিসেবে গণ্য করা হয়। শাসক এবং সরকারি কর্মকর্তারা কেবল জনগণের কাছেই নয়, পরকালেও আল্লাহর কাছে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামল এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

নাগরিকদের অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণ: একটি ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো এর প্রতিটি নাগরিকের (মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে) পাঁচটি মৌলিক অধিকার রক্ষা করা:

জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা, মান-সম্মানের সুরক্ষা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (যতক্ষণ তা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে)

অর্থনৈতিক সাম্য ও জনকল্যাণ : ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না থাকে, সেজন্য যাকাত এবং উশর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অসহায়, বিধবা ও এতিমদের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা হয়। সুদবিহীন অর্থনীতি এবং ইনসাফপূর্ণ বণ্টন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অমুসলিমদের অধিকার : ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের 'জিম্মি' বা নিরাপদ নাগরিক বলা হয়। তাদের জান-মাল, ইজ্জত এবং ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মহানবী

(সা.) বলেছেন, যদি কেউ কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম করে, তবে কিয়ামতের দিন তিনি নিজে তার বিপক্ষে দাঁড়াবেন।

ইসলামি শাসন ব্যবস্থা মূলত একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণা দেয়, যেখানে শাসক জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করেন এবং পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়ে দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে ইনসাফ কায়েম করেন।

খেলাফতের ধারণা ও খলিফার পরিচয়

খেলাফত (Caliphate) হলো ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক একটি শাসনব্যবস্থা, যা মূলত নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'খেলাফত' শব্দটি আরবি 'খলিফা' থেকে এসেছে, যার অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরসূরি।

খেলাফতের মূল বৈশিষ্ট্য এবং এর কাজগুলো হলো:

খেলাফতের মূল উদ্দেশ্য: খেলাফতের প্রধান কাজ হলো দুটি:

* দীন সংরক্ষণ (حراسة الدين): ইসলামের আদর্শ ও বিধিবিধান রক্ষা করা।

* দুনিয়াবি শাসন (سياسة الدنيا): ন্যায়ের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা করা।

খলিফা : খলিফা (خليفة) শব্দটি ইসলামি পরিভাষা এবং রাষ্ট্রচিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শাব্দিক অর্থ: 'খলিফা' শব্দটি আরবি 'খালফুন' (خلف) মূল ধাতু থেকে এসেছে। এর প্রধান অর্থগুলো হলো:

* প্রতিনিধি বা নায়েব: কারও অনুপস্থিতিতে বা কারো পক্ষ থেকে কাজ পরিচালনা করা।

* উত্তরসূরি বা স্থলাভিষিক্ত: একজনের পর অন্যজন আসা বা পূর্ববর্তীদের স্থান দখলকারী।

পারিভাষিক ও ভাব অর্থ: ইসলামি দর্শনে 'খলিফা' শব্দের ভাবার্থ মূলত দুটি স্তরে ব্যবহৃত হয়:

আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে (মানুষ): পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর 'খলিফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। এর ভাবার্থ হলো— মানুষ পৃথিবীর মালিক নয়, বরং সে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও সম্পদের একজন ট্রাস্টি বা আমানতদার। আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী পৃথিবীতে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের মূল দায়িত্ব।

ইসলামের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে: নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের 'খলিফা' বলা হয়। এখানে ভাবার্থ হলো— তাঁরা নবীর পদের উত্তরসূরি (নবুওয়াতের দায়িত্ব নয়, বরং শাসনের দায়িত্বে)। খলিফার কাজ হলো ইসলামি আইন (শরিয়াহ) বাস্তবায়ন করা এবং মুসলিমদের ঐক্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

খেলাফতের মূল চেতনা: 'খলিফা' হওয়ার ভাবার্থ কোনো রাজা বা সম্রাট হওয়া নয়। বরং এটি একটি জবাবদিহিতামূলক পদ।

** খলিফা মনে করেন তিনি জনগণের শাসক নন, বরং সেবক।*

** তিনি তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন।*

** তিনি নিজের ইচ্ছামতো দেশ চালাতে পারেন না, বরং কুরআন ও সুন্নাহর ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে থেকে জনকল্যাণ করতে বাধ্য থাকেন।*

শাব্দিক অর্থে খলিফা মানে 'প্রতিনিধি', কিন্তু ভাব অর্থে এটি এমন এক দায়িত্বশীল সত্তা বা নেতৃত্ব, যে নিজের খেয়াল-খুশিমতো নয় বরং সৃষ্টিকর্তার নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী পৃথিবী বা রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

ঐতিহাসিক পর্যায়: ইসলামের ইতিহাসে খেলাফতকে কয়েকটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়:

**** খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৩২–৬৬১ খ্রি.):*** *এটি খেলাফতের স্বর্ণযুগ। আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.)—এই চারজন খলিফার শাসনকালকে আদর্শ মনে করা হয়।*

**** উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত:*** *পরবর্তীতে খেলাফত বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের দিকে মোড় নেয়।*

**** উসমানীয় (অটোমান) খেলাফত:*** *দীর্ঘ সময় পর তুর্কিরা এই দায়িত্ব পালন করে, যা ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়।*

খেলাফতের মূল ভিত্তি হলো 'শুরা' বা পরামর্শ সভা। খেলাফতে খলিফাকে কুরআন, সুন্নাহ এবং জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। এখানে আইনের দৃষ্টিতে খলিফা ও সাধারণ নাগরিক সমান।

খলিফার দায়িত্ব: ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন খলিফার দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। ইমাম আল-মাওয়ার্দীসহ প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদদের মতে, খলিফার দায়িত্ব মূলত দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে:

১ দীনের (ধর্মের) সংরক্ষণ এবং ২ দুনিয়ার (পার্থিব) শাসন।

একজন খলিফার প্রধান দায়িত্বগুলো হলো:

আদর্শ ও শরিয়াহর সংরক্ষণ: খলিফার প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো ইসলামের মূল আকিদা ও বিধানগুলো রক্ষা করা। সমাজে যাতে কোনো ভ্রান্ত ধারণা বা বিদআত প্রবেশ করতে না পারে এবং কুরআন-সুন্নাহর সঠিক চর্চা বজায় থাকে, সেটি নিশ্চিত করা খলিফার দায়িত্ব।

বিচার ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: সমাজে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার কায়েম করা খলিফার অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

** অসহায় ও দুর্বলের অধিকার রক্ষা করা।*

** জুলুম বা অন্যায় দমন করা।*

** দল-মত নির্বিশেষে আইনের শাসন নিশ্চিত করা।*

শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং নাগরিকদের জান-মালের সুরক্ষা দেওয়া খলিফার আবশ্যিক কর্তব্য। যাতে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে জীবনযাপন করতে পারে এবং যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলতে পারে।

হুদুদ বা দণ্ডবিধি জারি করা: ইসলামি আইনের নির্ধারিত শাস্তি বা দণ্ডবিধি (হুদুদ) কার্যকর করা খলিফার দায়িত্ব। এটি করা হয় সমাজে অপরাধ প্রবণতা কমানোর জন্য এবং মানুষের অধিকার সুরক্ষার জন্য।

সীমান্ত রক্ষা ও প্রতিরক্ষা: রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুসলিম উম্মাহকে নিরাপদ রাখা খলিফার সামরিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা এবং সীমানা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা তাঁর কাজের অন্তর্ভুক্ত।

বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় তহবিল) পরিচালনা: রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালনা করা।

** যাকাত ও কর সংগ্রহ: সঠিক নিয়মে রাজস্ব আদায় করা।*

** সুষ্ঠু বণ্টন: রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা বায়তুল মালের অর্থ নিজের ইচ্ছামতো খরচ না করে জনকল্যাণে, গরিব-দুঃখীদের সাহায্যার্থে এবং রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় করা।*

যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ: রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে (যেমন: গভর্নর, বিচারক বা আমিল) অত্যন্ত সৎ, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া। স্বজনপ্রীতি বা ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং আমানতদারিতাই হবে এই নিয়োগের ভিত্তি।

জনকল্যাণমূলক কাজ: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট এবং কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। খলিফাকে জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা রাখতে হয়।মোটকথা খলিফার দায়িত্ব কোনো ভোগ-বিলাসের পদ নয়, বরং এটি একটি বিশাল আমানত। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি হাদিসের মর্ম অনুযায়ী— *"তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"* খলিফা হলেন সেই সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল যাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতিগুলো

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা নির্বাচনের এই পদ্ধতিগুলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যে চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো:

সাকিফা বা উপস্থিত নেতৃবৃন্দের ঐক্য (নির্বাচন) : এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নির্বাচন পদ্ধতি। রাসূল (সা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্দিষ্ট কারো নাম ঘোষণা করে যাননি।আনসাররা সাকিফা নামক স্থানে সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচনের উদ্যোগ নেন। খবর পেয়ে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) সেখানে যান। এখানে কোনো

পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। যুক্তি-তর্ক এবং উপস্থিত সাহাবীদের সম্মতির ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.)-কে নেতা মানা হয়।এটি প্রমাণ করে যে, সংকটময় মুহূর্তে জাতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

ইস্তিখলাফ বা মনোনয়ন (নিয়োগ): হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর অসুস্থতার সময় অনুভব করেছিলেন যে, রাষ্ট্র তখন শৈশবকালে আছে এবং নতুন করে নির্বাচনের বিতর্ক হলে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে।তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং উসমান (রা.)-এর মতো জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করেন। এরপর তিনি একটি অছিয়তনামা লিখে যান যেখানে হযরত উমর (রা.)-কে খলিফা মনোনীত করা হয়।আবু বকর (রা.) জোর করে চাপিয়ে দেননি, বরং তিনি জনসমক্ষে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং জনগণ তা খুশিমনে গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ এটি ছিল 'প্রস্তাব ও গ্রহণ' নীতি।

শুরা বা নির্বাচক কমিটি (কাউন্সিল): হযরত উমর (রা.) আহত হওয়ার পর যখন বুঝলেন তাঁর

মৃত্যু নিকটবর্তী, তখন তিনি কোনো একজনকে মনোনীত না করে একটি 'নির্বাচক মণ্ডলী' গঠন করে দেন।তিনি ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবীর (আলী, উসমান, জুবায়ের, তালহা, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) একটি কমিটি করে দেন। তাঁদের শর্ত দেওয়া হয় যে ৩ দিনের মধ্যে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচন করতে হবে।আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) নিজে পদপ্রার্থী না হয়ে মদিনার জনগণের ঘরে ঘরে গিয়ে মতামত জরিপ করেন। দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে মত দিচ্ছেন। এরপর তিনি খলিফা নির্বাচিত হন।

ব্যাপক জনমত ও সাধারণ বাইয়াত (গণদাবি): হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মদিনায় কোনো কার্যকর সরকার ছিল না। বিদ্রোহীরা মদিনা দখল করে রেখেছিল।আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় অংশ হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। আলী (রা.) প্রথমে রাজি হননি এবং বলেছিলেন যে এটি শুরা কমিটির কাজ। কিন্তু বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছালে এবং জনগণের বারবার অনুরোধে তিনি মসজিদে নববীতে সকলের সামনে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।এটি ছিল এমন একটি নির্বাচন যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট কমিটি বা পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়ন ছিল না, বরং পরিস্থিতির দাবিতে ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচিত হন।

এই পদ্ধতিগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

যদিও পদ্ধতিগুলো ভিন্ন ছিল, কিন্তু সবগুলোর মধ্যে ৩টি মৌলিক বিষয় কমন ছিল:

1. যোগ্যতাঃ *কেবল বংশীয় পরিচয়ে নয়, বরং তাকওয়া এবং প্রশাসনিক যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।*

2. শুরাঃ *একক সিদ্ধান্তে নয়, বরং সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে খলিফা নির্বাচন করা হতো।*

3. বাইয়াতঃ *নির্বাচন যে পদ্ধতিতেই হোক, সাধারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) না দিত, ততক্ষণ খিলাফত বৈধতা পেত না।*

পরবর্তীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে এই পদ্ধতিগুলো আর টেকেনি; তখন *এটি রাজতন্ত্র বা বংশপরম্পরায়* শাসনে রূপ নেয়, যেখানে পিতার পর পুত্র খলিফা হতেন।

বায়াত

'বায়াত' শব্দটি আরবি 'বাই' (Ba'i) শব্দমূল থেকে এসেছে, যার অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা বা চুক্তি করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, কোনো যোগ্য নেতা, আমির বা আধ্যাত্মিক গুরুর (পীর/শায়খ) হাতে হাত রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার যে চুক্তি করা হয়, তাকে বায়াত বলে। *সূরা আল-ফাতহ-এর ১০ নম্বর আয়াতে* আল্লাহ তাআলা বলেন: *"যারা আপনার কাছে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহর কাছেই বায়াত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে..."*

বায়াতের তাৎপর্য: বায়াত মূলত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। মুমিন ব্যক্তি তার জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাহে সঁপে দেওয়ার অঙ্গীকার করে, আর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন। এটি কোনো দাসত্ব নয়, বরং স্বেচ্ছায় ইসলামের বিধি-বিধান ও নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার একটি প্রকাশ্য ঘোষণা।

বায়াতের প্রকারভেদ: ইসলামের ইতিহাস এবং প্রয়োগের দিক থেকে বায়াত দুই প্রকার:

রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় বায়াত: ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফার কাছে নাগরিকরা যে আনুগত্যের শপথ নেয়, তাকে রাষ্ট্রীয় বায়াত বলে। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) সহ খোলাফায়ে রাশেদিনের দায়িত্ব গ্রহণের সময় এই বায়াত নেওয়া হয়েছিল। এটি আবার দুই ধাপে সম্পন্ন হতো:

বায়াতে খাস (বিশেষ বায়াত): রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারক বা মজলিসে শুরার সদস্যরা (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) প্রথমে খলিফা নির্বাচন করে যে বায়াত নিতেন।

অর্থাৎ বায়াত-ই-খাস বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারক, প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, পন্ডিত এবং 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' (যারা চুক্তি করা বা ভাঙার ক্ষমতা রাখেন, অর্থাৎ সমাজের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি)-দের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রাথমিক আনুগত্য।

বায়াতে আম (সাধারণ বায়াত): খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা মসজিদে বা উন্মুক্ত স্থানে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে যে গণ-আনুগত্যের শপথ নিতেন।

অর্থাৎ বায়াত-ই-আম হলো রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। বায়াত-ই-খাস সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে যখন একজন নেতা বা খলিফা মনোনীত হন, তখন সাধারণ জনগণের সামনে তা পেশ করা হয় যাতে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা মেনে নেয়।

আধ্যাত্মিক বা সংস্কারমূলক বায়াত: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর রাজনৈতিক খেলাফতের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি এবং দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার জন্য যোগ্য আলেম বা বুজুর্গদের হাতে বায়াত হওয়ার প্রচলন শুরু হয়। একে *তাসাউফ বা তরীকতের* বায়াতও বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো গুনাহ ও অন্যায় কাজ ছেড়ে দেওয়ার তওবা করা।একজন আধ্যাত্মিক অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে নিজের অহংকার, হিংসা ইত্যাদি আত্মিক ব্যাধি দূর করা।নিয়মিত জিকির-আজকার এবং সুন্নতের অনুসরণে অভ্যস্ত হওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের বিখ্যাত কয়েকটি বায়াত

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহাবিদের কাছ থেকে বায়াত নিয়েছিলেন, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল:

বায়াতে আকাবা (প্রথম ও দ্বিতীয়): হিজরতের আগে মদিনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) আনসারগণ মক্কার 'আকাবা' নামক স্থানে এসে গোপনে রাসূল (সা.)-এর কাছে বায়াত হয়েছিলেন যে, তিনি মদিনায় গেলে তারা তাঁকে এবং ইসলামকে নিজেদের জীবন দিয়ে রক্ষা করবেন।
বায়াতে রিদওয়ান: হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে যখন গুজব রটে যে হযরত উসমান (রা.)-কে কাফেররা শহীদ করেছে, তখন রাসূল (সা.) একটি বাবলা গাছের নিচে সাহাবিদের কাছ থেকে মরণপণ যুদ্ধের বায়াত নেন। আল্লাহ কোরআনে এই সাহাবিদের ওপর তাঁর সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন।
নারীদের বায়াত: মক্কা বিজয়ের পর নারীরা রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে শিরক না করা, চুরি না করা, ব্যভিচার না করা এবং সন্তানদের হত্যা না করার শর্তে বায়াত হয়েছিলেন *(সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১২)।*

খেলাফতের সূচনা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় খেলাফত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় পরিভাষা হিসেবে '**খেলাফত**' (যেভাবে পরবর্তীতে আবু বকর রা. বা উমর রা.-এর আমলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল) ওই অর্থে বিদ্যমান ছিল না। কারণ '**খেলাফত**' শব্দের অর্থ হলো 'কারো অনুপস্থিতিতে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া' বা 'কারো প্রতিনিধি হওয়া'। রাসুল (সা.) নিজে জীবিত থাকা অবস্থায় এবং সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হওয়ায় অন্য কারো তাঁর স্থায়ী স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রয়োজন বা সুযোগ ছিল না। তবে, **খেলাফত** এর মূল যে চেতনা—অর্থাৎ *ইসলামী অনুশাসন, সুবিচার এবং আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে একটি কল্যাণরাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনা করা*—তা রাসুল (সা.)-এর যুগে সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং তিনিই ছিলেন এর একমাত্র ও চূড়ান্ত প্রধান।

রাসুল (সা.)-এর যুগের সেই শাসনব্যবস্থা ও তার রূপরেখা কেমন ছিল, তা আলোচনা করা হলো:
১. মদিনা সনদ ও প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র: হিজরতের পর রাসুল (সা.) মদিনায় যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন, তা একটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছিল, যা **'মদিনা সনদ'** নামে পরিচিত।এর মাধ্যমে মদিনার মুসলিম, ইহুদি এবং অন্যান্য গোত্রগুলোকে নিয়ে একটি সম্মিলিত 'উম্মাহ' বা রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলা হয়। রাসুল (সা.) ছিলেন সেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা, বিচারক এবং সেনাপতি।

২. মদিনার রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

* **আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসুল (সা.)-এর নেতৃত্ব:** শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন এবং আল্লাহর নির্দেশ। যেকোনো বিতর্ক বা সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করতেন রাসুল (সা.) স্বয়ং।
* **ইনসাফ ও আইনের শাসন:** ধনী-দরিদ্র, চোর-নবাব বা আপন-পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। রাসুল (সা.) ঘোষণা করেছিলেন, *"আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।"*

* **পরামর্শ ভিত্তিক শাসন (শূরা):** কোনো ওহী নাজিল না হলে, জাগতিক ও কৌশলগত বিষয়ে (যেমন যুদ্ধের কৌশল) রাসুল (সা.) তাঁর সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন। ওহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধ এর বড় উদাহরণ।

* **নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা:** মদিনা সনদ অনুযায়ী মুসলিম বহির্ভূত সম্প্রদায়গুলো (যেমন ইহুদিরা) তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

* **একটি কল্যাণমুখী সমাজ:** সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, জুয়া এবং শোষণ উচ্ছেদ করে জাকাত ও সাদাকার মাধ্যমে একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনা হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল গরিব ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো।

সাময়িক প্রতিনিধি বা 'খলিফা' নিয়োগের প্রচলন: যদিও স্থায়ী খেলাফত তখন ছিল না, তবে রাসুল (সা.) যখনই কোনো যুদ্ধ বা অভিযানের জন্য মদিনার বাইরে যেতেন, তখন মদিনার শাসনভার পরিচালনার জন্য সাময়িকভাবে একজনকে নিজের প্রতিনিধি বা 'খলিফা' হিসেবে নিযুক্ত করে যেতেন। যেমন—তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি আলী (রা.)-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর সেখানে গভর্নর বা 'ওয়ালি' এবং জাকাত সংগ্রাহক নিয়োগ করতেন।

রাসুল (সা.)-এর যুগ ছিল খেলাফত এর **"ভিত্তিপ্রস্তর ও আদর্শ রূপ"**। তিনি নিজে খলিফা ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহর **রাসুল ও চ্যান্সেলর (রাষ্ট্রপ্রধান)**। তিনি যেভাবে ওহী ও ইনসাফের আলো দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে একটি বাস্তব উদাহরণ তৈরি করে দিয়ে গেছেন, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই দেখানো সেই আদর্শ ও শাসনপদ্ধতিকে হুবহু ধরে রাখার যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, সেটিই হলো **'খেলাফত'**। আর এ কারণেই তাঁর পরবর্তী চার খলিফাকে বলা হয় 'খুলাফায়ে রাশেদীন' বা সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণ।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত ও তার পরবর্তী সময়

ওফাত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত বা ইহকাল ত্যাগ ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচাইতে বেদনাদায়ক অধ্যায়। মক্কার বিদায় হজ থেকে ফেরার কিছুকাল পর সফর মাসের শেষের দিকে রাসুল (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর তীব্র মাথাব্যথা এবং জ্বর অনুভূত হচ্ছিল। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় অবস্থান শুরু করেন।অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি উম্মাহর কল্যাণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে যান:

** নামাজের গুরুত্ব: তিনি বারবার বলছিলেন, "নামাজ, নামাজ! আর তোমাদের অধীনস্থদের (দাস-দাসী) প্রতি সদয় থেকো।"*

** উসামার বাহিনী: সিরিয়া অভিযানের জন্য হজরত উসামা বিন জায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে দ্রুত রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন।*

** ইমামতি: শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি নিজের পরিবর্তে হজরত আবু বকর (রা.)-কে জামাতে নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। এটি ছিল তাঁর পক্ষ থেকে খিলাফতের একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত।*

ইন্তেকালের দিন সকালে তাঁর জ্বরের তীব্রতা কিছুটা কমেছিল। তিনি হুজরার পর্দা সরিয়ে সাহাবীদের নামাজরত দেখে মুচকি হাসেন। সাহাবীরা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো সুস্থ হয়ে গেছেন। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হতে থাকে।

** হজরত আয়েশা (রা.)-এর কোলে মাথা রাখা অবস্থায় তিনি মেসওয়াক করেন।*

** তাঁর শেষ কথা ছিল: "আল্লাহুম্মা আর-রাফিকাল আলা" (হে আল্লাহ! আমি সর্বোচ্চ বন্ধুর সঙ্গ চাই)*

** এরপর তাঁর পবিত্র হাতটি নিচে নেমে আসে এবং তিনি মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।*

১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (মতান্তরে ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার) তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

<u>সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া:</u> রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সংবাদে অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে শোকের যে চিত্র ফুটে উঠেছিল, তা ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্ন ভিন্ন:

হজরত উমর (রা.) এর অবস্থা: উমর (রা.)-এর আবেগাপ্লুত হয়ে তলোয়ার উঁচিয়ে ঘোষণা করেন যে, কেউ যদি বলে নবীজী মারা গেছেন তবে তিনি তার শিরচ্ছেদ করবেন।তিনি এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তলোয়ার হাতে নিয়ে বলতে থাকেন, *"রাসুল (সা.) মারা যাননি, বরং তিনি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন যেমন মুসা (আ.) গিয়েছিলেন।"*

হজরত আবু বকর (রা.) এর অবস্থা: তিনি সাহাবীদের শান্ত করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর একজন রাসুল এবং তাঁর মৃত্যু অবধারিত, কিন্তু ইসলাম চিরস্থায়ী। তাঁর এই দৃঢ়তা পুরো উম্মাহকে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। এই সংকটময় মুহূর্তে আবু বকর (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তিনি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে সাহাবীদের শান্ত করেন: *"মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন; তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন..." (সূরা আল-ইমরান: ১৪৪)।*

হজরত আলী (রা.)-এর অবস্থা: হজরত আলী (রা.) রাসুল (সা.)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে তাঁর গোসল ও দাফন কার্যের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন ছিলেন। শোকের আধিক্যে তিনি অনেকটা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বলেছিলেন যে, রাসুল (সা.)-এর বিয়োগে তিনি এতটাই শোকাহত ছিলেন যে, চারপাশের দুনিয়া তাঁর কাছে অন্ধকার মনে হচ্ছিল। তবে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে রাসুল (সা.)-এর শেষ বিদায়ের কাজগুলো তদারকি করেন।

হজরত ওসমান (রা.)-এর অবস্থা: হজরত ওসমান (রা.) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। রাসুল (সা.)-এর ওফাতের খবর শুনে তিনি এতটাই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে,

নড়াচড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি টানা কয়েকদিন কারো সাথে কোনো কথা বলতে পারেননি; শুধু নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতেন ।

হজরত ফাতেমা (রা.)-এর শোক: রাসুল (সা.)-এর প্রিয় কন্যা হজরত ফাতেমা (রা.)-এর জন্য এই শোক ছিল সহ্য ক্ষমতার বাইরে। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন এবং আনসার-মুহাজিরদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *"হে সাহাবীগণ! তোমরা কীভাবে রাসুল (সা.)-এর পবিত্র দেহের ওপর মাটি চাপা দিলে? তোমাদের মন এটা কীভাবে সায় দিল?"* তাঁর এই বিলাপ উপস্থিত সকল সাহাবীকে নতুন করে কাঁদিয়েছিল।

হজরত বেলাল (রা.)-এর আজান বন্ধ করা: রাসুল (সা.)-এর মুয়াজ্জিন হজরত বেলাল (রা.) শোকে এতটাই ভেঙে পড়েন যে, মদিনায় থাকা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি যখন আজান দিতে দাঁড়ালেন, **"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ"** বলার সময় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে এবং তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি ঘোষণা করেন যে, রাসুল (সা.)-কে ছাড়া এই মদিনায় তাঁর পক্ষে আর আজান দেওয়া সম্ভব নয়। এরপর তিনি মদিনা ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান।

সাধারণ সাহাবীদের প্রতিক্রিয়া: মদিনার অলিগলিতে তখন কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। অনেক সাহাবী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন:

** অনেকে নামাজে দাঁড়িয়েও সিজদা থেকে উঠতে পারছিলেন না।*

** কেউ কেউ শোকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিলেন।*

** পুরো মদিনা শহর যেন এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল। সাহাবীদের বর্ণনায়, "যেদিন রাসুল (সা.) মদিনায় এসেছিলেন সেদিন সবকিছু আলোকিত হয়ে গিয়েছিল, আর যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।"*

এই কঠিন সময়ে হজরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ়তা এবং ধৈর্যই সাহাবীদের আবার ঐক্যবদ্ধ করতে এবং শোক কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সাহায্য করেছিল।

জানাজা ও দাফন

রাসুল (সা.)-এর জানাজা প্রচলিত কোনো ইমামের পেছনে বড় জামাতে হয়নি। কারণ শোকের ছায়ায় সবাই আচ্ছন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন।সাহাবীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে হজরত আয়েশা (রা.)-এর কামরায় প্রবেশ করতেন এবং জানাজা ও দরুদ পড়ে বেরিয়ে আসতেন। প্রথমে পুরুষরা, এরপর মহিলারা এবং সবশেষে শিশুরা জানাজা পড়ে।রাসুল (সা.)-এর দাফন কোথায় হবে, তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত তৈরি হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন জান্নাতুল বাকিতে, কেউ বলেছিলেন মসজিদের পাশে।হজরত আবু বকর (রা.) জানান, তিনি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছেন যে—*"নবীগণ যেখানে ইন্তেকাল করেন, সেখানেই দাফন হতে পছন্দ করেন।"* এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা শরীফে, যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেখানেই তাঁর কবর খনন করা হয়। বুধবারে মধ্যরাতে তাঁকে দাফন করা সম্পন্ন হয়রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের

মাধ্যমে ওহীর সিলসিলা সমাপ্ত হয়, যা ছিল সাহাবীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর শেষ উপদেশগুলো এবং নামাজের প্রতি তাঁর গুরুত্ব আজও আমাদের জন্য পাথেয়।

রাজনৈতিক সংকট

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তা মূলত নেতৃত্বের উত্তরাধিকার এবং রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা নিয়ে আবর্তিত ছিল। ইতিহাসের এই পর্যায়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ, যা পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামো নির্ধারণ করে দিয়েছিল।এই সংকটের প্রধান দিকগুলো হলো:

সাকিফায়ে বনী সায়েদা ও নেতৃত্বের নির্বাচন*:* রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পরপরই মদিনার আনসাররা বনী সায়েদা গোত্রের সভাকক্ষে (সাকিফা) মিলিত হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্য থেকে একজন নেতা বা খলিফা নির্বাচন করা। সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) সেখানে উপস্থিত হন। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

খিলাফত ও শিয়া-সুন্নি বিভাজনের সূত্রপাত*:* নেতৃত্বের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি সূক্ষ্ম মতভেদ তৈরি হয়। হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকরা মনে করতেন যে, রাসূল (সা.)-এর পরিবারের সদস্য হিসেবে আলী (রা.)-ই নেতৃত্বের প্রকৃত হকদার ছিলেন। যদিও আলী (রা.) পরবর্তীতে আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন, কিন্তু এই প্রাথমিক মতপার্থক্যই পরবর্তীতে স্থায়ী শিয়া-সুন্নি বিভাজনের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে।

রিদ্দা যুদ্ধ বা স্বধর্মত্যাগ আন্দোলন*:* রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের অনেক গোত্র মনে করেছিল যে, তাদের সাথে ইসলামের চুক্তি ছিল রাসুলের ব্যক্তিগত পর্যায়ে। তাই তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। এছাড়া মুসায়লামা কাযযাবসহ কয়েকজন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটে। এই সংকট মোকাবিলায় আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেন এবং 'রিদ্দা যুদ্ধ' পরিচালনার মাধ্যমে আরবে পুনরায় সংহতি ফিরিয়ে আনেন।

শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অভাব*:* রাসূল (সা.)-এর সময় রাষ্ট্র ছিল সরাসরি ওহী ও তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশনায় পরিচালিত। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার বা নেতা নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট লিখিত পদ্ধতি ছিল না। ফলে প্রতিটি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের সময় (যেমন উসমান রা.-এর নির্বাচন) নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ও আলোচনার সৃষ্টি হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ*:* প্রাথমিক সংকটগুলো আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর সময় দক্ষতার সাথে সামলানো গেলেও, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে আঞ্চলিক বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এটিই শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ (প্রথম ফিতনা) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পথে নিয়ে যায়।

রাসূল (সা.)-এর ওফাত-পরবর্তী সংকট ছিল মূলত একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। একদিকে নেতৃত্বের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন এবং অন্যদিকে আরবের যাযাবর গোত্রগুলোর বিদ্রোহ—এই দুই প্রান্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই ইসলামের রাজনৈতিক ধারাটি বিকশিত হয়েছিল।

প্রথম খলিফা নির্বাচন [হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)]

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর নির্বাচন এবং খিলাফত গ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম উম্মাহ যখন নেতৃত্ব সংকটে পড়েছিল, তখন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই সমস্যার সমাধান করা হয়।তার খিলাফত গ্রহণ, বায়াত এবং ঐতিহাসিক ভাষণের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

সকিফা বনী সায়েদাহর সমাবেশ: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুসলিম

উম্মাহর নেতৃত্ব নির্ধারণে সকিফা বনী সায়েদাহর সমাবেশ ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। 'সকিফা' শব্দের অর্থ ছাদবিশিষ্ট উন্মুক্ত চত্বর বা বৈঠকখানা। এটি ছিল মদিনার বনী সায়েদাহ গোত্রের একটি মিলনস্থল।

সমাবেশের প্রেক্ষাপট: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরপরই যখন মুহাজিরগণ এবং নবীজীর পরিবার তাঁর দাফন-কাফনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন মদিনার আনসাররা (আউস ও খাজরাজ গোত্র) সকিফা বনী সায়েদাহতে সমবেত হন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদিনার নেতৃত্ব যাতে শূন্য না থাকে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একজন নেতা নির্বাচন করা। আনসাররা তাদের গোত্রপতি সাদ বিন উবাদাহ (রা.)-কে খলিফা হিসেবে মনোনীত করার আলোচনা করছিলেন।

মুহাজিরদের উপস্থিতি: এই সমাবেশের খবর পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) দ্রুত সেখানে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে তারা দেখেন যে আনসাররা খিলাফতের দাবি উত্থাপন করছেন। মুহাজিরদের পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেন।

বিতর্ক ও যুক্তিতর্ক: সমাবেশে উভয় পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাব ও যুক্তি উত্থাপিত হয়:

* ***আনসারদের যুক্তি:*** *তারা ইসলামের দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নবীজীকে সাহায্য করেছেন, তাই নেতৃত্ব তাদের পাওয়া উচিত।*

* ***মুহাজিরদের উত্তর****: হযরত আবু বকর (রা.) আনসারদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন যে, নেতৃত্বের জন্য আরবরা কুরাইশদের বাইরে কাউকে মেনে নেবে না। কারণ কুরাইশরা বংশীয় ও ভৌগোলিক দিক থেকে আরবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।*

* ***দ্বৈত নেতৃত্বের প্রস্তাব:*** *বিতর্কের এক পর্যায়ে প্রস্তাব আসে, "একজন আমীর আমাদের (আনসার) থেকে এবং একজন আপনাদের (মুহাজির) থেকে হবে।" কিন্তু হযরত উমর (রা.) এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, "এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না।" অর্থাৎ, মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বে দ্বৈত শাসন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।*

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন: আলোচনার অচলাবস্থা কাটাতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) এবং আবু উবাইদাহ (রা.)-এর হাত টেনে ধরে বলেন, "*আপনারা এই দুইজনের যেকোনো একজনকে মনোনীত করুন।" কিন্তু তারা দুজনেই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন।*হযরত উমর (রা.) যুক্তি দেন যে, *রাসূলুল্লাহ (সা.) যাকে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন (আবু বকর), তিনিই উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে যোগ্য।* উমর (রা.) বলেন, *"যেখানে আবু বকর উপস্থিত আছেন, সেখানে অন্য কেউ নেতৃত্বের দাবিদার হতে পারে না।"* এই বলে হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম আবু বকর (রা.)-এর হাতে হাত রেখে বায়াত গ্রহণ করেন।এরপর হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়ে আবু বকর (রা.)-এর হাতে হাত রেখে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তাকে অনুসরণ করে বনী আউস গোত্রের নেতা বশীর বিন সাদ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ বায়াত গ্রহণ করেন।

সমাবেশের গুরুত্ব ও ফলাফল: সকিফা বনী সায়েদাহর এই সমাবেশের মাধ্যমেই ইসলামের প্রথম খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ঐক্য রক্ষা: *এই সিদ্ধান্তের ফলে মদিনায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ বা বিভক্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।*

শুরা বা পরামর্শ পদ্ধতি: *এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে নয় বরং পারস্পরিক পরামর্শ বা 'শুরা'র ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।*

উম্মাহর সংহতি: *যদিও এই নির্বাচন নিয়ে শুরুতে কিছু মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে পরবর্তীকালে সকল সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্বকে মনে-প্রাণে মেনে নেন।*

বায়াত বা আনুগত্যের শপথ

ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের ক্ষেত্রে 'বায়াত' বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ ছিল একটি সুশৃঙ্খল এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এই বায়াত মূলত দুই পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছিল।

বায়াত-এ-খাস (বিশেষ আনুগত্যের শপথ): সকিফা বনী সায়েদাহর সভায় উপস্থিত সীমিত সংখ্যক সাহাবীদের মধ্যে যে শপথ অনুষ্ঠিত হয়, তাকে 'বায়াত-এ-খাস' বলা হয়।হযরত আবু বকর (রা.) যখন খলিফা হিসেবে হযরত উমর (রা.) বা আবু উবাইদাহ (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন, তখন হযরত উমর (রা.) তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আবু বকর (রা.)-এর হাত ধরে বলেন, *"*ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে আমাদের দ্বীনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই আমরা আপনার হাতেই বায়াত হবো। "*হযরত উমর (রা.)-এর হাত রাখার পরপরই আনসার নেতা *বশীর বিন সাদ (রা.)* এবং *আবু উবাইদাহ (রা.)* এগিয়ে আসেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সেখানে উপস্থিত মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ তাঁর হাতে হাত রেখে খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়ার শপথ নেন। এটি ছিল তাৎক্ষণিক নেতৃত্বের সংকট নিরসনের একটি পদক্ষেপ।

বায়াত-এ-আম (সাধারণ আনুগত্যের শপথ): সকিফায় বায়াত সম্পন্ন হওয়ার পরদিন *মসজিদে নববীতে* সাধারণ মুসলমানদের জন্য এই শপথের আয়োজন করা হয়। এটিই ছিল খিলাফতের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি।খুতবার শুরুতে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে

হযরত আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার কথা মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন যে, *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আবু বকরই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।*এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে বসেন এবং উপস্থিত মদিনার সাধারণ মুসলমানরা দলে দলে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সর্বজনীন বৈধতা লাভ করেন।

বায়াতের মূল বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহ: ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী এই বায়াত কেবল ক্ষমতার দাপট ছিল না, বরং এটি ছিল একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি:

১. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য: জনগণের পক্ষ থেকে শর্ত ছিল যে, খলিফা যতক্ষণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ তারা তাঁর অনুগত থাকবেন।

২. পরামর্শের ভিত্তিতে শাসন: খলিফা একনায়কতন্ত্র চালাবেন না, বরং সাহাবীদের সাথে পরামর্শ (শুরা) করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

৩. অধিকারের নিশ্চয়তা: বায়াত গ্রহণের মাধ্যমে খলিফা জনগণের জান-মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন।

৪. সমালোচনা করার অধিকার: বায়াতের পর আবু বকর (রা.) তাঁর ভাষণে স্পষ্ট বলেছিলেন যে, তিনি ভুল করলে যেন জনগণ তাঁকে সংশোধন করে দেয়। এটি প্রমাণ করে যে, শাসক জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

এই বায়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে নেতৃত্ব জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, বরং এটি জনগণের সম্মতি ও সমর্থনের ভিত্তিতে হতে হয়।

খলিফা হিসেবে প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ

হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর *মসজিদে নববীতে* সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, তা ইসলামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে এক অনন্য দলিল। এই ভাষণটি কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্য ছিল না, বরং এটি ছিল একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা।সকিফা বনী সায়েদাহতে বায়াত সম্পন্ন হওয়ার পরদিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বায়াত (বায়াত-এ-আম) অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মিম্বরে আরোহণ করেন। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠের পর তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগর্ভ এই ভাষণটি প্রদান করেন।হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেছিলেন: *"হে লোকসকল! আমাকে আপনাদের উপর শাসক (ওয়ালি) নিযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই।"*এর মাধ্যমে তিনি ক্ষমতার দাপট বা অহংকারকে সমূলে উৎপাটন করেন। একজন শাসক হিসেবে নিজেকে জনগণের ঊর্ধ্বে না রেখে তাদেরই একজন হিসেবে উপস্থাপন করেন।তিনি বলেন: *"আমি যদি ভালো কাজ করি, তবে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন; আর যদি আমি ভুল পথে চলি, তবে আমাকে সোজা করে দেবেন।"*এটি ছিল 'গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা'র প্রথম সবক। তিনি শাসককে ভুলমুক্ত মনে না করে জনগণের ওপর দায়িত্ব দেন যাতে তারা তাকে সঠিক পথে থাকতে সাহায্য করে। এটি সমালোচনার অধিকারকেও

স্বীকৃতি দেয়।তিনি ঘোষণা করেন:*"সত্য হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা)।"* শাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে তিনি সততাকে স্থাপন করেন। প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সত্যবাদিতা বজায় রাখার নির্দেশ দেন তিনি। *"আপনাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছি (ইনশাআল্লাহ)। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে পাওনা (অন্যের অধিকার) আদায় করছি।"* এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি আইনের শাসন এবং সামাজিক সমতার গ্যারান্টি দেন। প্রভাবশালীরা যেন দুর্বলের ওপর জুলুম করতে না পারে, রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে—এটাই ছিল তাঁর মূল বার্তা।তিনি সতর্ক করে বলেন:"যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দেন। আর যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ ও মুসিবত নাজিল করেন।"রাষ্ট্র ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় সামরিক প্রস্তুতি এবং চারিত্রিক পবিত্রতা—উভয়টির গুরুত্ব তিনি তুলে ধরেন।ভাষণের শেষে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দেন: *"আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি আপনাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"*এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, খলিফার ক্ষমতা অসীম নয়। যদি শাসক খোদাদ্রোহী কোনো নির্দেশ দেন, তবে জনগণ তা মানতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ, আইনের উর্ধ্বে কেউ নন।

ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

** **সুশাসনের সনদ:** এই ভাষণটি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও একটি আদর্শ সুশাসনের (Good Governance) রূপরেখা।*

** **স্বৈরাচারবিরোধী:** এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে একনায়কতন্ত্রের কোনো স্থান নেই।*

** **আত্মবিশ্বাস:** রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর শোকাতুর ও বিভ্রান্ত মুসলিম উম্মাহকে এই ভাষণটি নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও দিকনির্দেশনা দিয়েছিল।*

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পরবর্তী মাত্র দুই বছরের শাসনামলে এই ভাষণের প্রতিটি শব্দের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর এই নির্বাচন এবং ভাষণ ইসলামী গণতন্ত্র ও সুশাসনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

হযরত আবু বকর (রা.) যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন মুসলিম উম্মাহ ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন এবং সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছিল। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আরবের চারদিকে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ এবং নানামুখী ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সংকটগুলোকে একত্রে *'ফিতনা-এ-ইরতিদাদ' বা স্বধর্মত্যাগীদের* ফিতনা বলা হয়।

ভণ্ড নবীদের উত্থান: মহানবী (সা.)-এর নবুয়তের শেষ দিকেই কয়েকজন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তারা চরম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা সরলপ্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত করে নবুয়ত দাবি করে এবং মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

* ***মুসায়লামা কাযযাব****: ইয়ামামা অঞ্চলের এই ভণ্ড নবী সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল। তার বিশাল সেনাবাহিনী ছিল।*

* ***আসওয়াদ আনসী****: ইয়েমেনের এই বিদ্রোহী নেতা নিজেকে নবী দাবি করে মদিনার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে।*

* ***তুলায়হা বিন খুয়াইলিদ****: বনী আসাদ গোত্রের এই নেতাও নবুয়ত দাবি করে বিদ্রোহ শুরু করে।*

* ***সাজাহ:*** *একজন নারী, যে নবুয়ত দাবি করে মুসায়লামার সাথে হাত মিলিয়েছিল।*

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ: অনেক আরব গোত্র মনে করেছিল যে, যাকাত কেবল মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর কাছেই দিতে হতো। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা ইসলাম ত্যাগ না করলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে, "আমরা নামাজ পড়ব, কিন্তু মদিনার কেন্দ্রীয় সরকারকে যাকাত দেব না।"এটি ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই মুহূর্তে তাদের ছাড় দিতে, কিন্তু আবু বকর (রা.) কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেন, *"আল্লাহর কসম! রাসূল (সা.)-এর যুগে উটের একটি রশিও যদি কেউ যাকাত হিসেবে দিত, আর এখন তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"*

মুরতাদ বা স্বধর্মত্যাগীদের ফিতনা: নবীজীর ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মদিনা ও মক্কা এবং তায়েফ বাদে আরবের অধিকাংশ নবদীক্ষিত গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে তাদের পুরনো পৌত্তলিকতায় ফিরে যেতে শুরু করে। একে বলা হয় *'রিদ্দা' (স্বধর্মত্যাগ)*। আরবের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতা একদম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল।

ওসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ সংক্রান্ত বিতর্ক: মহানবী (সা.) তাঁর ইন্তেকালের ঠিক আগে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু মদিনা যখন চারদিক থেকে শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত, তখন এই বিশাল বাহিনী মদিনার বাইরে পাঠানো ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।অনেক সাহাবী পরামর্শ দেন মদিনার নিরাপত্তার স্বার্থে এই বাহিনী যেন এখন না পাঠানো হয়।আবু বকর (রা.) বলেন, *"যে পতাকা রাসূল (সা.) নিজ হাতে তুলে দিয়েছেন, তা নামানোর অধিকার আবু বকরের নেই; এমনকি যদি মদিনায় আমি একা থেকে যাই এবং বনের পশুরা আমাকে ছিঁড়ে খায়, তবুও ওসামার বাহিনী রওয়ানা হবে।"*

বাহ্যিক শক্তি: রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য: মদিনার অভ্যন্তরীণ সংকটের পাশাপাশি সীমান্তে রোমান (বাইজেন্টাইন) এবং পারস্য (সাসানীয়) সাম্রাজ্যের হুমকি ছিল। তারা নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই বিনাশ করার সুযোগ খুঁজছিল। মদিনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং একই সাথে বাইরের আক্রমণ প্রতিহত করা ছিল এক বিশাল কঠিন কাজ।

অভ্যন্তরীণ শোক ও মানসিক অস্থিরতা: রাসূল (সা.)-এর আকস্মিক ইন্তেকালে সাহাবায়ে কেরাম মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর মতো সাহাবীও এই শোক সামলাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। এমন একটি শোকাতুর উম্মাহকে একত্রিত করা এবং তাদের মনোবল ফিরিয়ে এনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা ছিল আবু বকর (রা.)-এর জন্য অন্যতম বড় মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর অটল ঈমান, অসীম সাহসিকতা এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে এই সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করেছিলেন। ইতিহাসবিদরা একারণেই তাঁকে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' বা 'ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা'র হিসেবে অভিহিত করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামলে প্রধান কাজসমূহ

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামল ছিল মাত্র দুই বছর কয়েক মাস (৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ), কিন্তু এই অল্প সময়ে তিনি ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা এবং প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রধান কাজগুলো হলো:

রিদ্দা যুদ্ধ বা ধর্মত্যাগীদের দমন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে জাকাত দিতে অস্বীকার করে। আবূ বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি ১১টি সেনাদল গঠন করে আরবের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠান এবং সফলভাবে ইসলামি শাসন পুনর্প্রতিষ্ঠা করেন।

ভণ্ড নবীদের নির্মূল: নবীজির মৃত্যুর পর মুসায়লামা কাযযাব, আসওয়াদ আনাসী, তুলায়হা এবং সাজাহর মতো কয়েকজন নিজেকে নবী দাবি করে ফেতনা সৃষ্টি করেছিল। আবূ বকর (রা.) যুদ্ধের মাধ্যমে এই ভণ্ড নবীদের প্রভাব নির্মূল করেন। বিশেষ করে 'ইয়ামামার যুদ্ধে' মুসায়লামা কাযযাব নিহত হয়।

পবিত্র কুরআন সংকলন: ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কুরআন শহীদ হওয়ায় হযরত উমর (রা.) কুরআন সংরক্ষণের প্রস্তাব দেন। আবূ বকর (রা.) জায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন, যারা বিক্ষিপ্তভাবে থাকা কুরআনের আয়াতগুলো একত্রিত করে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি বা 'মুসহাফ' তৈরি করেন।

সাম্রাজ্য বিস্তার ও বহিঃশত্রুর মোকাবিলা: তৎকালীন দুই পরাশক্তি পারস্য (সাসানীয়) এবং রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের দিক থেকে আসা হুমকি মোকাবিলায় তিনি সেনাবাহিনী পাঠান। তাঁর আমলেই বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ইরাক এবং সিরিয়ার কিছু অংশ বিজিত হয়।

ওসামা বিন জায়েদ (রা.)-এর অভিযান: রাসূল (সা.) তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে ওসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। রাসূলের ওফাতের পর আরবে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও আবূ বকর (রা.) নবীজির সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে সেই বাহিনীকে অভিযানে পাঠান, যা মুসলিমদের শক্তি প্রদর্শনে বড় ভূমিকা রাখে।

বাইতুল মাল ও প্রশাসনিক সংস্কার: তিনি একটি সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। সরকারি কোষাগার বা 'বাইতুল মাল' প্রতিষ্ঠা করেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের গভর্নর ও বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। জনগণের জন্য ইনসাফ কায়েম করা ছিল তাঁর শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক সংকটজয়ী মহানায়ক। মাত্র আড়াই বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে তিনি অনেক কালজয়ী কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর আদর্শিক নেতৃত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তসমূহ কেবল ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তিকেই মজবুত

করেনি, বরং পরবর্তী খলিফাদের জন্য একটি ন্যায়ভিত্তিক ও আদর্শিক শাসনব্যবস্থার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছে।

বিস্তারিত কিছু ঘটনা

ভণ্ড নবীদের দমন ও অভিযানসমূহ

ইসলামের ইতিহাসে ভণ্ড নবীদের দমন বা 'ফিতনা-এ-ইরতিদাদ' নির্মূল করা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর আরবের বিভিন্ন প্রান্তে নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদারদের উত্থান ঘটে, যা ইসলামের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধান ভণ্ড নবীদের পরিচয়: সেই সময়ে চারজন প্রধান ব্যক্তি নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করেছিল:

* **মুসাইলামা কাজ্জাব:** সে ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ভণ্ড নবী। বনু হানিফা গোত্রের এই ব্যক্তি ইয়ামামায় বিশাল এক বাহিনী গড়ে তুলেছিল।
* **আসওয়াদ আনসি:** সে ইয়েমেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের ঠিক পূর্বেই সে নিহত হয়, তবে তার অনুসারীদের বিশৃঙ্খলা আবু বকর (রা.)-এর সময়েও ছিল।
* **তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ:** বনু আসাদ গোত্রের এই নেতা নিজেকে নবী দাবি করে বিদ্রোহ করে।
* **সাজাহ বিনতে হারিস:** সে ছিল একজন খ্রিষ্টান নারী, যে পরবর্তীতে মুসাইলামার সাথে রাজনৈতিক জোট গড়ার জন্য তাকে বিয়ে করে।

আবু বকর (রা.)-এর কঠোর অবস্থান: রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও ভণ্ড নবীদের আস্ফালন শুরু হয়, তখন অনেক সাহাবী পরামর্শ দিয়েছিলেন আপাতত তাদের সাথে আপস করতে। কিন্তু আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন: *"আল্লাহর কসম! রাসূল (সা.)-এর আমলে যারা একটি উটের রশি যাকাত হিসেবে দিত, এখন যদি তারা তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"*

সামরিক অভিযান ও সেনাপতিদের দায়িত্ব: আবু বকর (রা.) পুরো আরব ভূখণ্ডকে ১১টি সামরিক জোনে ভাগ করেন এবং ১১ জন সেনাপতির নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন **খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)**

* **তুলায়হার বিরুদ্ধে যুদ্ধ (বুজাকার যুদ্ধ):** খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) প্রথমে তুলায়হার মুখোমুখি হন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুলায়হা সিরিয়ায় পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।
* **সাজাহর পতন:** সাজাহ যখন তার বাহিনী নিয়ে মুসাইলামার দিকে আগায়, তখন মুসাইলামা চতুরতার সাথে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে শান্ত করে। পরে সাজাহর অনুসারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ইয়ামামার যুদ্ধ: এটি ছিল ভণ্ড নবীদের দমনের *সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও চূড়ান্ত যুদ্ধ*। *মুসাইলামার* বিশাল বাহিনীর (প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য) বিরুদ্ধে *খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)*-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইয়ামামায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়।মুসাইলামার বাহিনী একটি বিশাল প্রাচীরঘেরা বাগানে আশ্রয় নিলে মুসলমানরা সেখানে আক্রমণ চালায়। সাহাবী বারা বিন মালিক (রা.)-এর বীরত্বে প্রাচীরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। *ওয়াহশি ইবনে হারব (রা.)*—যিনি ইসলাম গ্রহণের আগে *হামজা (রা.)*-কে শহীদ করেছিলেন—তার বর্শার আঘাতে মুসাইলামা নিহত হয়।এই যুদ্ধে প্রায় ৭০০ থেকে ১২০০

মুসলিম শহীদ হন, যাদের মধ্যে ৩৬০ জন (মতান্তরে বেশি) হাফেজে কুরআন ছিলেন। এই অভাবনীয় ক্ষতির কারণেই পরবর্তীতে কুরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ফলাফলের গুরুত্ব: ভণ্ড নবীদের এই দমনের ফলে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে:
* **ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** আরবে ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব পুনরায় সুসংহত হয়।
* **ভবিষ্যৎ বিজয়ের পথ:** এই যুদ্ধগুলোতে মুসলিম বাহিনী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা পরবর্তীতে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল।
* **কুরআন সংরক্ষণ:** বিপুল সংখ্যক হাফেজের শাহাদাতের ফলে আবু বকর (রা.) কুরআনকে লিখিত কিতাব আকারে সংকলনের উদ্যোগ নেন।
আবু বকর (রা.)-এর এই আপসহীন সংগ্রামের কারণেই আরবের মাটি থেকে ভণ্ড নবীদের ফেতনা চিরতরে মুছে যায় এবং ইসলাম একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় কাঠামো লাভ করে।

পবিত্র কুরআন সংকলন

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে পবিত্র কুরআন সংকলনের উদ্যোগটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাইলফলক। হিজরি ১২ সনে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) ভণ্ড নবী মুসায়লিমা কাযযাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন, যাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০০ জন ছিলেন হাফেজে কুরআন। এতে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, এভাবেই যদি হাফেজরা শাহাদাতবরণ করতে থাকেন, তবে কুরআনের অনেক অংশ হারিয়ে যেতে পারে। তিনি তখন খলিফা আবূ বকর (রা.)-কে পবিত্র কুরআন একটি কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ বা সংকলন করার পরামর্শ দেন।শুরুতে হযরত আবূ বকর (রা.) এই প্রস্তাবে কিছুটা ইতস্ততবোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: *"রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কাজ করেননি, আমি তা কীভাবে করব?"*কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, এটি দ্বীনের নিরাপত্তার স্বার্থে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মহৎ কাজ। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আবূ বকর (রা.)-এর অন্তরকে এই কাজের জন্য প্রশস্ত করে দেন।সংকলন কাজ পরিচালনার জন্য আবূ বকর (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী এবং ওহী লেখক *যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)*-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। যায়েদ (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করেন। *প্রতিটি আয়াত সংকলনের জন্য তিনি কেবল নিজের মুখস্থ বা পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করেননি। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত লিখিত অংশগুলোকে অন্তত দুইজন সাক্ষীর মাধ্যমে যাচাই করতেন যে, তা রাসূল (সা.)-এর সামনেই লেখা হয়েছিল কি না। তিনি খেজুরের পাতা, চামড়ার টুকরো, মসৃণ পাথর এবং হাড়ের ওপর লিখে রাখা বিভিন্ন অংশ একত্র করেন।লিখিত পান্ডুলিপিটির সাথে জীবিত হাফেজদের মুখস্থ পাঠের পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করা হয়।*এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে পবিত্র কুরআনের সমস্ত আয়াত একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। এই সংকলনটিকে বলা হয় *'সুহুফ' (Suhuf)*। এটি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছেই সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এটি হযরত উমর (রা.) এবং পরবর্তীতে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।হযরত আবূ বকর (রা.)-এর এই মহৎ উদ্যোগের কারণেই আজ আমরা কুরআনের অবিকৃত রূপটি কিতাব আকারে পেয়েছি। এই অবদানের জন্য হযরত আলী (রা.) বলেছিলেন, *"কুরআনের সংকলনের ক্ষেত্রে আবূ বকরের সওয়াব সবচেয়ে বেশি।"*

বাইতুল মাল ও প্রশাসনিক সংস্কার

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময়ে বায়তুল মালের কোনো পৃথক স্থায়ী ভবন ছিল না। তবে এর ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ।তার আমলে বায়তুল মালে যা জমা হতো, তিনি তা অভাবী ও সাধারণ মানুষের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দিতেন। কোনো অর্থই অলস ফেলে রাখা হতো না।তিনি ধনী-দরিদ্র বা উঁচুজাত-নিচুজাত ভেদাভেদ না করে সবাইকে সমান হারে ভাতা প্রদান করতেন। এ ক্ষেত্রে তার যুক্তি ছিল, *"দুনিয়াতে সবার প্রয়োজন সমান, আর শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার আল্লাহ পরকালে দেবেন।"*শুরুতে তিনি তার নিজের ঘরেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোষাগারের অর্থ রাখতেন। পরবর্তী সময়ে মদীনার শহরতলীতে একটি ছোট ঘরকে এজন্য ব্যবহার করা হতো। *আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)*-কে বায়তুল মালের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, যাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) *'আমীনুল উম্মাহ'* (এই উম্মতের বিশ্বাসভাজন) উপাধি দিয়েছিলেন।এছাড়া, হযরত আবু বকর (রা.) মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামোকেই ধরে রেখেছিলেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু নতুনত্ব যোগ করেছিলেন।মজলিস-উশ-শূরা: তিনি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। হযরত উমর, আলী, উসমান ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ছিলেন তার প্রধান পরামর্শদাতা।তিনি ইসলামী রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। যেমন: মক্কা, মদীনা, তায়েফ, সানআ (ইয়ামেন), বাহরাইন এবং দুমাতুল জান্দাল।তিনি প্রতিটি প্রদেশে একজন করে ওয়ালী (গভর্নর) এবং কাজী (বিচারক) নিয়োগ দেন। *হযরত উমর (রা.) মদীনার* বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন।তিনি গভর্নরদের নির্দেশ দিতেন যেন তারা জনগণের জন্য সহজলভ্য হন এবং বিলাসিতা থেকে দূরে থাকেন তার শাসনামলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থার মূল নির্যাস বা শেষ কথা হলো 'ভিত্তি স্থাপন'। তিনি অত্যন্ত অল্প সময়ে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রে রূপান্তর করেছিলেন। তার আমল ছিল মূলত একটি 'সংরক্ষণশীল ও সংস্কারমূলক' পর্যায়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা (Judicial System)

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর শাসনকাল (৬৩২-৬৩৪ খ্রি.) ছিল মাত্র দুই বছর তিন মাসের মতো। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তাকে প্রধানত 'রিদ্দা আন্দোলন' (স্বদেশত্যাগ ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ) দমন এবং রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তাঁর যুগে বিচার বিভাগের জন্য আলাদা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বা বড় প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করার সুযোগ হয়নি। তবে ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের দিক থেকে তাঁর বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও আদর্শ।
ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর রাষ্ট্রে আইনের ঊর্ধ্বে কেউ থাকবে না। তিনি বলেছিলেন:
"আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল, সে আমার কাছে শক্তিশালী—যতক্ষণ না আমি তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিই (ইনশাআল্লাহ)। আর আপনাদের মধ্যে যে শক্তিশালী, সে আমার কাছে দুর্বল—যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে (অন্যের) অধিকার আদায় করে নিই।"
এটিই ছিল তাঁর পুরো শাসনকালের বিচার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। ধনী-দরিদ্র, চেনা-অচেনা সবার জন্য আইনের নীতি ছিল সমান।
শাসনকার্যের সুবিধার্থে আবু বকর (রা.) তাঁর প্রধান সাহাবিদের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ভাগ করে

দিয়েছিলেন। মদিনার বিচার ব্যবস্থার সার্বিক দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছিলেন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ওপর।মজার ব্যাপার হলো, হযরত ওমরের কঠোর বিচারিক মনোভাবের কারণে এবং সমাজে তখন অপরাধের হার এতটাই কম ছিল যে, দীর্ঘ ***এক বছর*** পর্যন্ত তাঁর আদালতে কোনো বড় মামলা বা বিরোধই আসেনি।

হযরত আবু বকর (রা.) কোনো বিরোধ বা মামলার রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা বা ক্রমানুসার (Hierarchy) মেনে চলতেন। প্রখ্যাত সাহাবি *মাইমুন ইবনে মাহরান* তাঁর বিচার পদ্ধতির একটি বিবরণ দিয়েছেন:

কোনো মামলা এলে তিনি প্রথমে আল্লাহর কিতাবে এর সমাধান খুঁজতেন। কুরআনে স্পষ্ট রায়থাকলে সেই অনুযায়ী ফয়সালা করতেন।কুরআনে সরাসরি না থাকলে তিনি দেখতেন রাসুলুল্লাহ (সা.) এ জাতীয় মামলায় কী ফয়সালা করেছিলেন। নিজের জানা না থাকলে তিনি অন্য সাহাবিদের ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "রাসুল (সা.)-কে এই বিষয়ে কোনো ফয়সালা করতে আপনারা দেখেছেন কি?"কুরআন ও হাদিসে সরাসরি স্পষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলে তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের একত্রিত করে পরামর্শ (শূরা) করতেন। সবার ঐক্যমত্যের (ইজমা) ভিত্তিতে তখন রায় দেওয়া হতো।হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় উত্তরাধিকার আইন বা ফারায়েজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মীমাংসা হয়।এক মৃত ব্যক্তির দাদী খলিফার কাছে এসে তাঁর মিরাসের (উত্তরাধিকার) অংশ দাবি করেন। আবু বকর (রা.) প্রথমে বলেন যে, কুরআন এবং তাঁর জানা হাদিসে দাদীর নির্দিষ্ট কোনো অংশের কথা উল্লেখ নেই।এরপর তিনি সাহাবিদের ডেকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে *মুগিরা ইবনে শুবা (রা.)* এবং *মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.)* সাক্ষ্য দেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) দাদীকে সম্পদের *ছয়ভাগের একভাগ (1/6)* অংশ দিয়েছিলেন। আবু বকর (রা.) এই সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং দাদীর পক্ষে রায় দেন।ইসলামী শরীয়ার একটি অন্যতম স্তম্ভ হলো যাকাত। আবু বকর (রা.)-এর সময়ে কিছু গোত্র নামায পড়তে রাজি হলেও যাকাত দিতে অস্বীকার করে। অনেকে একে সাধারণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মতো মনে করেছিল। কিন্তু আবু বকর (রা.) দূরদর্শিতার সাথে বিচার করে একে 'দ্বীনের অবমাননা' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' হিসেবে গণ্য করেন। তিনি ঘোষণা করেন: *"আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে উটের একটি রশি দিতেও যারা যাকাত হিসেবে বাধ্য ছিল, আজ যদি তারা তা দিতে অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"* তাঁর এই কঠোর ও আপসহীন সিদ্ধান্তের কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র একটি বড় ফিতনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

আবু বকর (রা.) এর কিছু ঘটনা

আবু বকর (রা.) ও অন্ধ বৃদ্ধার কাহিনী (সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত)

এই ঘটনাটি আবু বকর (রা.)-এর বিনয় এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজসেবার এক অনন্য উদাহরণ।আবু বকর (রা.) যখন খলিফা, তখন তিনি প্রতিদিন ভোরে মদিনার প্রান্তে একটি নির্দিষ্ট তাঁবুতে যেতেন। হযরত উমর (রা.) কৌতূহলী হয়ে একদিন তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তিনি চলে যাওয়ার পর ভেতরে গিয়ে দেখেন এক বৃদ্ধা সেখানে একা থাকেন।বৃদ্ধাটি ছিলেন অন্ধ এবং পঙ্গু। তিনি জানতেনই না যে কে তাঁর সেবা করছে। তিনি উমর (রা.)-কে বলেন, "এক ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে আসে, ঘর ঝাড়ু দেয়, আমার ছাগল দোহন করে দেয় এবং খাবার তৈরি করে দিয়ে যায়। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও নিজের হাতে সাধারণ মানুষের সেবা করা ছিল তাঁর চরিত্রের মহান দিক। এ তখন উমর (রা.) কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, *"হে আবু বকর! আপনি আপনার পরের খলিফাদের*

জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা রেখে গেলেন (আপনার মতো হওয়া কত কঠিন!)।" তিনি বুঝেছিলেন যে খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা.)-এর মানদণ্ড স্পর্শ করা পরবর্তী শাসকদের জন্য কতটা কঠিন হবে।

ইনসাফ ও সাধারণ জীবনযাপন (আর্থিক স্বচ্ছতা)

খলিফা আবু বকর (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ও সাবধানী ছিলেন।খলিফা হওয়ার আগে তিনি একজন ধনাঢ্য কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। খলিফা হওয়ার পর যখন জনগণের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন সাহাবীদের পরামর্শে তাঁর পরিবারের জন্য সামান্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়।মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-কে নির্দেশ দেন যেন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রি করে বায়তুল মাল থেকে নেওয়া প্রতিটি দিরহাম ফেরত দেওয়া হয়। এমনকি তিনি তাঁর একটি পুরনো কাপড় দিয়ে কাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে রাষ্ট্রের নতুন কোনো কাপড় নষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, *"নতুন কাপড় জীবিত মানুষের জন্য বেশি প্রয়োজন, মৃত ব্যক্তির জন্য নয়।"*তাঁর এই আদর্শ আজও সারা বিশ্বের শাসকদের জন্য অনুপ্রেরণা।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিজয় অভিযান (প্রতিরক্ষা ও দাওয়াত)

আবু বকর (রা.)-এর সময় থেকেই ইসলামের দাওয়াত আরবের বাইরে বৃহত্তর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এটি কেবল সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল না, বরং ইসলামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ ছিল।পারস্য সাম্রাজ্যের (সাসানীয়) পক্ষ থেকে আসা উস্কানি মোকাবিলায় তিনি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি *খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)*-কে ইরাকে প্রেরণ করেন। হিরাহ বিজয় এই অভিযানের অন্যতম সাফল্য। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সীমান্তে রোমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে তিনি চারটি বাহিনী পাঠান। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন *আবু উবাইদাহ (রা.), ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) এবং আমর ইবনুল আস (রা.)*-এর মতো বীর সাহাবীরা।তিনি যুদ্ধের ময়দানেও মানবিকতার চরম নিদর্শন রেখে গেছেন। তাঁর বিখ্যাত ১০টি নির্দেশ ছিল:

১. নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা: কোনো নারী, শিশু বা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।

২. অসুস্থ ও অক্ষমদের রক্ষা: যারা অসুস্থ বা শারীরিকভাব অক্ষম, তাদের ওপর আক্রমণ করবে না।

৩. গাছ কাটা নিষিদ্ধ: ফলবান কোনো গাছ কাটবে না বা পুড়িয়ে ফেলবে না।

৪. জনবসতি রক্ষা: কোনো লোকালয় বা জনবসতি ধ্বংস করবে না।

৫. গবাদিপশু রক্ষা: প্রয়োজন ছাড়া (খাদ্য ব্যতীত) কোনো ভেড়া, গরু বা উট জবাই করবে না।

৬. ধর্মীয় উপাসনালয়: গির্জা বা মঠের মতো উপাসনালয় ধ্বংস করবে না এবং সেখানে ইবাদতরত ব্যক্তিদের বিরক্ত করবে না।

৭. বিশ্বাসঘাতকতা না করা: যুদ্ধের ময়দানে বা চুক্তিতে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।

৮. লুটতরাজ নিষিদ্ধ: ব্যক্তিগত সম্পদ বা মালামাল অবৈধভাবে দখল বা লুট করবে না।

৯. লাশের অবমাননা: মৃতদেহের বিকৃতি বা অসম্মান করবে না।

১০. ভীত না হওয়া: ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে না এবং ধৈর্য ও বীরত্বের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করবে।

এই তিনটি ঘটনা প্রমাণ করে যে, আবু বকর (রা.) যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তেমনি প্রশাসনিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী এবং কঠোর।

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের পদক্ষেপসমূহ

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবন সায়াহ্নে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং দূরদর্শী, যা ইসলামের ইতিহাসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে। মৃত্যুর পূর্বে বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখতে আবু বকর (রা.) গণতান্ত্রিক ও পরামর্শমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-সহ বিশিষ্ট আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের সাথে কথা বলেন। তিনি জানতে চান—উমর (রা.) সম্পর্কে তাদের ধারণা কী? যদিও উমর (রা.) কিছুটা কঠোর স্বভাবের ছিলেন, তবুও সাহাবীগণ একমত পোষণ করেন যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে ইসলামের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। সবার মতামত নেওয়ার পর আবু বকর (রা.) হযরত ওসমান (রা.)-কে ডেকে একটি অসিয়তনামা লিখতে বলেন। এতে তিনি পরবর্তী খলিফা হিসেবে হযরত উমর (রা.)-এর নাম চূড়ান্ত করেন।অসিয়তনামা লেখা শেষ হলে তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও সাহাবীদের সহায়তায় বারান্দায় আসেন এবং উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি কি আপনাদের জন্য এমন একজনকে নেতা নির্বাচন করেছি যাকে আপনারা গ্রহণ করবেন? আল্লাহর কসম, আমি আমার কোনো আত্মীয়কে মনোনীত করিনি; বরং আমি উমর কে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি।" জনগণ একবাক্যে তা মেনে নেয়।

ওফাত বা ইন্তেকাল

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল ছিল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। হিজরি ১৩ সনের জমাদিউস সানি মাসের সাত তারিখ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ ১৫ দিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। ধারণা করা হয়, তীব্র শীতের মধ্যে গোসল করার ফলে তার জ্বর এসেছিল। মৃত্যুর আগে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি তার সন্তানদের নির্দেশ দেন যে, খলিফা থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তিনি যে সামান্য ভাতা গ্রহণ করেছিলেন, তার বিনিময়ে যেন তার ব্যক্তিগত জমি বিক্রি করে সেই টাকা বায়তুল মালে ফেরত দেওয়া হয়। তিনি অসিয়ত করেন যে, তাকে যেন তার ব্যবহৃত পুরোনো কাপড় দিয়েই কাফন দেওয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, "জীবিতদের জন্য নতুন কাপড়ের প্রয়োজনীয়তা মৃতদের চেয়ে বেশি।"১৩ হিজরির ২২ জমাদিউস সানি (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) সোমবার মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর—ঠিক যে বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছিলেন।

জানাজা ও দাফন

তার জানাজার নামাজে ইমামতি করেন তার মনোনীত উত্তরসূরি ***হযরত উমর (রা.) ।***তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, তাকে মদীনার মসজিদে নববীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র কবরের পাশেই

দাফন করা হয়। তার মাথা রাসূল (সা.)-এর কাঁধ বরাবর রাখা হয়, যা তাদের গভীর বন্ধুত্বের এক চিরস্থায়ী নিদর্শন।

এক নজরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতে ইসলামের প্রধান উন্নতিসমূহ

* **বিদ্রোহ দমন:** আরবের ধর্মত্যাগীদের (মুরতাদ) কঠোরভাবে দমন করে ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করেন।
* **ভণ্ড নবী নির্মূল:** নবুওয়তের মিথ্যা দাবিদার মুসাইলামা কাজ্জাবসহ অন্যান্য ভণ্ড নবীদের ফেতনা চিরতরে মিটিয়ে দেন।
* **কুরআন সংকলন:** ইয়ামামার যুদ্ধের পর বিক্ষিপ্ত থাকা কুরআনের আয়াতগুলোকে একত্রিত করে প্রথম পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।
* **যাকাত প্রতিষ্ঠা:** যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের হক আদায় নিশ্চিত করেন।
* **প্রশাসনিক বিভাগ:** শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে পুরো রাষ্ট্রকে মক্কা, মদীনা ও ইয়েমেনের মতো বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।
* **বায়তুল মাল গঠন:** রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মালকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব রাখা শুরু করেন।
* **সাম্রাজ্য বিস্তার:** পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় অভিযান চালিয়ে ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশ জয় করেন।
* **সামরিক শৃঙ্খলা:** মুসলিম বাহিনীকে ১১টি পৃথক ব্রিগেড বা বড় সেনাদলে ভাগ করে সামরিক শক্তি মজবুত করেন।
* **জনকল্যাণমূলক ভাতা:** বৃদ্ধ, বিধবা ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতার ব্যবস্থা চালু করেন।
* **গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব:** সবার সাথে পরামর্শের (শুরা) ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ইসলামি ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকাল থেকে শিক্ষণীয়

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত কিন্তু গৌরবোজ্জ্বল খিলাফতকাল থেকে আমাদের জন্য অনেকগুলো গভীর শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর যখন চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, তখন অনেকেই কিছুটা নমনীয় হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) এক চুলও ছাড় দেননি। এখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে কোনো আপস করা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন আদর্শের ভিত্তি হুমকির মুখে পড়ে।তিনি খলিফা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত একা নিতেন না। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি অভিজ্ঞ সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। কুরআন সংকলন থেকে শুরু করে যুদ্ধ অভিযান—সবক্ষেত্রেই তিনি 'শুরা' বা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছাতেন। এটি আধুনিক গণতান্ত্রিক ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার বড় শিক্ষা।রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। খলিফা হওয়ার পরও তিনি নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন এবং অন্যের উট চরিয়ে দিতেন। ক্ষমতা যে মানুষকে অহংকারী করে না বরং আরও বিনয়ী ও দায়িত্বশীল করে, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি।মৃত্যুর আগে তিনি অসিয়ত করেছিলেন যেন খলিফা হিসেবে নেওয়া সামান্য ভাতাটুকুও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রি করে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়া হয়। সরকারি আমানত বা পাবলিক ফান্ডের প্রতি এমন সততা ও স্বচ্ছতা প্রতিটি নেতা ও দায়িত্বশীলের

জন্য এক বিরাট শিক্ষা। তিনি সেনাপতি বা গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে বংশীয় পরিচয় নয়, বরং যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর মতো বীরদের সঠিক মূল্যায়ন এবং তরুণদের দায়িত্ব প্রদান তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের পরিচয় দেয়। যুদ্ধাবস্থায়ও তিনি মুসলিম বাহিনীকে কড়া নির্দেশ দিতেন যেন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং ধর্মযাজকদের আঘাত না করা হয়। এমনকি গাছপালা বা উপাসনালয় ধ্বংস করতেও নিষেধ করতেন। এটি যুদ্ধের ময়দানেও মানবিকতা ও মানবাধিকার রক্ষার অনন্য শিক্ষা প্রদান করে। তিনি নিজের মৃত্যুর আগে পরবর্তী নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মতামত নিয়ে যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, তা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। বিশৃঙ্খলা এড়াতে আগে থেকেই যোগ্য উত্তরসূরি চিন্তা করা যে কতটা জরুরি, তা তাঁর পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট হয়।

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব

আবু বকর (রা.)-এর এই সংক্ষিপ্ত খিলাফতকাল (২ বছর ৩ মাস ১০ দিন) ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে এক ঐশ্বরিক রহমত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর যখন আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম ত্যাগ করতে শুরু করে এবং ভণ্ড নবীদের উত্থানে মদীনার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় । তিনি না থাকলে ভণ্ড নবী ও বিদ্রোহী শক্তিগুলো ইসলামকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে পারত। তখন তাঁর আপসহীন ও পাহাড়সম দৃঢ় নেতৃত্বই ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করে। তাঁর উপাধি *'সিদ্দিক'* (সত্যবাদী) এবং *'আতীক'* (জাহান্নাম থেকে মুক্ত)—এই নামগুলোর সার্থকতা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পেয়েছে। খলিফা হিসেবে তিনি কেবল আরবের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহই দমন করেননি, বরং পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অবিনশ্বর আলোকবর্তিকা রেখে গেছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনামলে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিজয়ের যে সূচনা হয়েছিল, তা পরবর্তী বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। ইসলামের প্রথম খলিফা হয়েও তিনি জীর্ণ পোশাকে অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন কাটাতেন। ইন্তেকালের আগে তিনি তাঁর ব্যবহৃত সামান্য সম্পদও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেন। পরিশেষে, মহানবী (সা.)-এর কবরের পাশে তাঁর চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়া তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর আজন্ম বন্ধুত্বেরই চূড়ান্ত প্রতিফলন। আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের সেই 'ত্রাণকর্তা', যাঁর জীবন ও খিলাফত ছাড়া ইসলামের রাজনৈতিক ও কাঠামোগত ইতিহাস অপূর্ণ থেকে যেত।

দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচন (হযরত উমর ফারুক (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) একক সিদ্ধান্তে কাউকে খলিফা মনোনীত করেননি। তিনি শয্যাশায়ী অবস্থাতেই মদিনার বিশিষ্ট সাহাবি, আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃবৃন্দের সাথে দফায় দফায় গোপনে এবং প্রকাশ্যে পরামর্শ করেন। তিনি প্রথমে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)-কে ডেকে উমর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) বলেন, "উমর আপনার ধারণার চেয়েও উত্তম, তবে তাঁর স্বভাব কিছুটা কঠোর।" এরপর তিনি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)-এর মতামত নেন। উসমান (রা.) বলেন, "ওমরের ভেতরটা তাঁর বাহিরের চেয়েও সুন্দর। আমাদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" একইভাবে তিনি হযরত সাঈদ বিন জায়েদ, উসাইদ বিন হুদাইর (রা.) এবং অন্যান্য আনসার ও মুহাজির নেতাদের সাথে দীর্ঘ

আলোচনা করেন। সকলের একটাই পর্যবেক্ষণ ছিল—উমর (রা.) যোগ্যতম, তবে তাঁর শাসন হয়তো কিছুটা কঠোর হবে।
আবু বকর (রা.)-এর যুক্তি: সাহাবিদের এই মৃদু আশঙ্কার জবাবে আবু বকর (রা.) বলেন, ওমরের কঠোরতা মূলত আমার কোমলতার কারণে ছিল। যখন শাসনের মূল দায়িত্ব তাঁর ওপর আসবে, তখন উম্মাহর কল্যাণে তিনি নিজেই নরম হয়ে যাবেন। পরামর্শ সভায় উমর (রা.)-এর পক্ষে ঐকমত্য (Ijma) তৈরি হওয়ার পর, হযরত আবু বকর (রা.) একটি লিখিত অসিয়তনামা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে একটি দলিল লেখার নির্দেশ দেন: *"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। এটি আবু বকর বিন আবু কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি শেষ অঙ্গীকার... আমি তোমাদের জন্য উমর বিন খাত্তাবকে খলিফা মনোনীত করলাম। তোমরা তাঁর আদেশ শোনো এবং আনুগত্য করো..."* দলিলটি লেখা শেষ হলে আবু বকর (রা.) তাঁর চাদর ধরে বারান্দায় আসেন (অন্য বর্ণনায়, তাঁর দাস দলিলটি নিয়ে জনগণের সামনে যায়) এবং সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে বলেন: *"আমি যাকে খলিফা মনোনীত করেছি, তোমরা কি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, আমি আমার কোনো আত্মীয়কে মনোনীত করিনি, বরং দীর্ঘ চিন্তা ও পরামর্শের পর উমর কে নির্বাচন করেছি।"* উপস্থিত সমস্ত জনগণ সমস্বরে বলে উঠলেন, *"আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।"*

হযরত উমর ফারুক (রা. এর নিকট বায়াত

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত উমর (রা.)-এর বায়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ প্রক্রিয়াটি দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছিল, যা মদিনার শাসনব্যবস্থায় পূর্ণ গণতান্ত্রিক বৈধতা এনে দিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর অসুস্থতার সময় যে অসিয়তনামা লিখে গিয়েছিলেন, তা প্রথমে মদিনার শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) সামনে পড়ে শোনানো হয়। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) সহ মজলিসে শুরার প্রধান ব্যক্তিবর্গ এই মনোনয়নে সম্মতি দেন এবং উমর (রা.)-এর হাতে হাত রেখে প্রথম বায়াত গ্রহণ করেন। ১৩ হিজরির ২২ জমাদিউস সানি, প্রথম খলিফার দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর মদিনার মসজিদে নববীতে সাধারণ মুসলমানদের আহ্বান করা হয়। হযরত উমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়ান। উপস্থিত মদিনার সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে একে তাঁর হাতে হাত রেখে খলিফা হিসেবে তাঁর আনুগত্যের শপথ (বায়াত) নেন। মদিনার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও গভর্নরের মাধ্যমে এই বায়াত সম্পন্ন করা হয়। এর মাধ্যমে তাঁর নির্বাচন পূর্ণাঙ্গ বৈধতা ও সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে।

বায়াতের মূল বৈশিষ্ট্য ও শর্তসমূহঃ হযরত উমর (রা.)-এর বায়াতের শর্তগুলো হলো:

১.অনুসরণ কুরআন ও হাদিসের আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা এবং জনগণও সেই অনুযায়ী খলিফার অনুগত থাকার শর্ত।

২.হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সুদৃঢ় প্রশাসনিক ও ধর্মীয় ভিত্তি রেখে গেছেন, তা সততার সাথে বজায় রাখা।

৩.সমাজ থেকে সব ধরনের পক্ষপাতিত্ব দূর করে ধনী-দরিদ্র ও আপন-পর নির্বিশেষে সবার জন্য সমান বিচার নিশ্চিত করা।

৪.ইসলামের নিয়মের ভেতরে থেকে খলিফা রাষ্ট্রের কল্যাণে যে সিদ্ধান্তই নেবেন, জনগণ তা নিঃশর্তভাবে মেনে চলা।

৫. এক নায়কতন্ত্র পরিহার করে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা।

হযরত উমর ফারুক (রা). এর প্রথম ভাষণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) খলীফা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর যে প্রথম ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে **"খুতবাতুল ইস্তিখলাফ"** বা দায়িত্ব গ্রহণের ভাষণ নামে পরিচিত। এই ভাষণটি একটি আদর্শ, জবাবদিহিমূলক এবং ইনসাফপূর্ণ কল্যাণকামী রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি বা রূপরেখা (Manifesto)।হযরত উমর (রা.) তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কথা জানতেন এবং জনগণও তাঁকে কিছুটা ভয় পেত। তাই ভাষণের শুরুতেই তিনি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করেন, যা তাঁর গভীর তাকওয়া ও বিনয়ের পরিচয় দেয়। তিনি বলেন: *"হে আল্লাহ! আমি স্বভাবগতভাবে কঠোর, আপনি আমাকে নরম (কোমল) করে দিন। আমি দুর্বল, আপনি আমাকে শক্তি দান করুন। আমি কৃপণ, আপনি আমাকে দানশীল করুন।"* তিনি জনগণের ভয় দূর করতে স্পষ্ট করে দেন যে, তাঁর কঠোরতা কার জন্য এবং তাঁর কোমলতা কার জন্য। তিনি বলেন: *"আমার কঠোরতা বজায় থাকবে কেবল জালেম, অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে। যারা মানুষের ওপর জুলুম করবে, আমি তাদের গাল মাটিতে মিশিয়ে দেব, যতক্ষণ না তারা সত্যকে মেনে নেয়।" "পক্ষান্তরে, যারা সৎ, শান্তিকামী এবং মজলুম—তাদের জন্য আমি কাপড়ের চেয়েও নরম ও কোমল প্রমাণিত হব।"*রাষ্ট্রীয় সম্পদ (জনগণের অর্থ) ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি চরম সততার ঘোষণা দেন। তিনি জনগণের উদ্দেশে বলেন: *"আপনাদের সম্পদ থেকে আমি অন্যায়ভাবে একটি দিরহামও গ্রহণ করব না। বায়তুল মালে যে অর্থ আসবে, তা সম্পূর্ণ সৎ ও বৈধ উপায়ে সংগ্রহ করা হবে এবং তা সঠিক খাতে (জনকল্যাণে) ব্যয় করা হবে। আমি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থকে এতিমের মালের মতো মনে করব। যদি আমি স্বাবলম্বী থাকি, তবে তা থেকে কিছুই নেব না। আর যদি প্রয়োজন পড়ে, তবে কেবল জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন (ন্যূনতম), ততটুকুই নেব।"* তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর শাসনে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে না এবং দুর্বলরা অবহেলিত হবে না। *আমার কাছে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটিই সবচেয়ে শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দিচ্ছি। সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিটিও আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার কাছ থেকে অন্যের হরণ করা অধিকার আদায় করছি।"*ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা পাহারা দেওয়া এবং সৈন্যদের কল্যাণের বিষয়ে তিনি বলেন: *"আমি আপনাদেরকে দূরবর্তী সীমান্তে বা যুদ্ধে পাঠিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেব না।"আপনারা যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন, তখন আপনাদের পেছনে ফেলে যাওয়া পরিবার-পরিজনের দেখভালের দায়িত্ব আমার (খলীফার)। আমি নিজে তাদের অভিভাবক হব।"*তিনি জনগণকে অন্ধ অনুকরণ করতে নিষেধ করেন এবং শাসকের ভুল ধরার অধিকার দেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, খলীফা আল্লাহর আইন অমান্য করলে জনগণও খলীফাকে মানতে বাধ্য নয়। তিনি জনগণকে তাকে পরামর্শ দেওয়ার এবং সৎ কাজে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।হযরত উমর (রা.)-এর এই ভাষণটি কেবল মুখের কথা ছিল না। তিনি তাঁর সাড়ে দশ বছরের শাসনামলে এই ভাষণের প্রতিটি

শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এমন এক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, যেখানে খলীফাকে সাধারণ জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজের চাদরের হিসাব দিতে হয়েছিল।

হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের সময়কাল (১৩-২৩ হিজরি) ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত হলেও, বিশাল এই সাম্রাজ্য পরিচালনা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁকে বেশ কিছু বড় বড় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) যখন দায়িত্ব নেন, তখন মুসলিম উম্মাহ দুটি তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি—পূর্ব রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য এবং পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্যের মুখোমুখি ছিল। একই সাথে দুটি শক্তিশালী এবং সুপ্রশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং দূরবর্তী রণক্ষেত্রের সেনাপতিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল এক বিশাল সামরিক চ্যালেঞ্জ। যুদ্ধজয়ের পর বিজয়ী অঞ্চলগুলোর (যেমন: সিরিয়া, মিশর, ইরাক) আইন-শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আকস্মিক পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা এক বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল।
মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা অতি দ্রুত বিস্তৃতির কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং নিয়মের লাখ লাখ মানুষ ইসলামী খেলাফতের অধীনে আসে। নতুন বিজিত অঞ্চলের জন্য সম্পূর্ণ নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং রাজস্ব (ট্যাক্স) আদায়ের নিয়ম চালু করতে হয়েছিল, যা একটি বিশাল আমলাতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ ছিল। বিজিত অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের চেনা ঐতিহ্য ও আইনের সাথে ইসলামী শরীয়াহর নিয়মনীতির ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ ছিলনা।
হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে দুটি বড় ধরনের প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে, যা সমগ্র রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও স্থায়িত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। সিরিয়ায় এক ভয়াবহ প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এতে *আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ* এবং *মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)*-এর মতো ইসলামের প্রথম সারির বহু অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেনাপতি এবং প্রায় ২৫,০০০ মুসলিম মৃত্যুবরণ করেন। এই বিশাল মানবসম্পদ ও নেতৃত্ব শূন্যতা পূরণ করা ও মহামারী নিয়ন্ত্রণ করা ছিল এক বিরাট পরীক্ষা।মদিনা ও তার আশপাশের অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাটি পুড়তে পুড়তে ছাইয়ের (রমাদ) মতো রঙ ধারণ করেছিল বলে একে 'আমুর রামাদা' বলা হয়। ক্ষুধার্ত হাজার হাজার মানুষ মদিনায় আশ্রয় নিলে তাদের খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে উমর (রা.)-কে কঠোর পরিশ্রম ও হিমশিম খেতে হয়েছিল।আরব সমাজে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা জাহেলী যুগের গোত্রপ্রীতি বা আসাবিয়াত পুরোপুরি দূর করা কঠিন ছিল। মদিনার বাইরে কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবাধে জমি কেনা বা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করার ওপর উমর (রা.) কিছুটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, যাতে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বা নতুন কোনো রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র তৈরি না হয়। এটি সামলানো রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ছিল। হযরত উমর (রা.) ন্যায়ের প্রশ্নে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাঁর এই অতি-সচেতনতা ও কড়াকড়ি অনেক সময় কিছু উচ্চাভিলাষী মানুষের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল।বিশাল সাম্রাজ্যে বিপুল সংখ্যক ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক (মাজুসি) প্রজা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জিম্মি বা অমুসলিম প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের থেকে জিজিয়া কর আদায় এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া ছিল একটি নতুন ও জটিল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা, কঠোর প্রশাসনিক তদারকি, মজলিস-উশ-শূরার (পরামর্শ সভা) কার্যকারিতা এবং ব্যক্তিগত সততার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত সফলভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত পারস্য বিজয়ের প্রতিশোধ হিসেবে এক পারসিক দাস (*আবু লুলু ফিরোজ*)-এর গুপ্তঘাতকের হামলায় তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়, যা ছিল তাঁর খিলাফতের চূড়ান্ত ও ট্রাজিক অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতারই একটি অংশ।

হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে প্রধান কাজসমূহ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর অর্ধ-জাহান জুড়ে বিস্তৃত শাসনকাল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। খলীফা হিসেবে তাঁর প্রধান কাজ ও অবদানসমূহকে কয়েকটি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা যায়:

হযরত উমর (রা.) একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত ও আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন। তিনি পুরো খলীফাতকে কয়েকটি প্রদেশে (যেমন: মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি) বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি প্রদেশে একজন করে গভর্নর বা 'ওয়ালী' নিযুক্ত করেন। গভর্নর বা সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব রাখা হতো এবং প্রতি বছর হজের সময় তাঁদের বিরুদ্ধে জনগণের কোনো অভিযোগ আছে কিনা তা খলীফা নিজে শুনতেন। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করে বিভিন্ন প্রদেশে স্বাধীন 'কাজী' (বিচারক) নিয়োগ দেন।রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি দুটি পরামর্শ সভা গঠন করেন:

মজলিস-উশ-শূরা আল-খাস: যেখানে প্রধান ও প্রবীণ সাহাবিগণ থাকতেন।

মজলিস-উশ-শূরা আল-আম: যেখানে সাধারণ আনসার, মুহাজির এবং গোত্রপ্রধানদের মতামত নেওয়া হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে তিনি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন।রাষ্ট্রীয় তহবিল বা সেন্ট্রাল ব্যাংক হিসেবে 'বায়তুল মাল'কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। বিজিত অঞ্চলের জমি জরিপ করে উর্বরতা অনুযায়ী 'খরাজ' (ভূমি কর) ও 'জিজিয়া' কর নির্ধারণ করেন।'দেওয়ান' নামক খাতার মাধ্যমে সমাজকর্মী, যোদ্ধা, যুদ্ধাহত, বিধবা, এতিম এমনকি স্তন্যপায়ী শিশুদের জন্যও রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন।তাঁর সময়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটে। একটি স্থায়ী ও পেশাদার সেনাবাহিনী গঠন করেন। সৈন্যদের জন্য নিয়মিত বেতন ও ব্যারাকের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্য (ইরান, ইরাক) এবং রোমান সাম্রাজ্যের একটি বিশাল অংশ (সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর) ইসলামী খেলাফতের অধীনে আসে। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জেরুজালেম জয় করেন। জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা ও সুবিধার জন্য তিনি অনেক নতুন দপ্তর খোলেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নৈশপ্রহরী বা পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। রাতে তিনি নিজেই ছদ্মবেশে মদিনার রাস্তায় ঘুরে জনগণের অবস্থা দেখতেন। পথিক ও বণিকদের জন্য রাস্তাঘাট, সরাইখানা এবং পানির জন্য অসংখ্য খাল খনন করেন (যেমন: 'নহরে আমীরুল মুমিনীন')।রাষ্ট্রীয় নথিপত্র ও হিসাব-নিকাশের সুবিধার্থে *হযরত আলী (রা.)*-এর পরামর্শে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনা হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'হিজরী সন' গণনা শুরু করেন। সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে কুরআন শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন এবং তাঁদের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বেতন দিতেন। মাহে রমজানে **জামায়াতের সাথে ২০ রাকাত** তারাবীহ নামাজ পড়ার নিয়মকে সুসংগঠিত রূপ দেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, হযরত উমর (রা.) কেবল একজন বিজেতাই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক। তাঁর দূরদর্শী কাজের মাধ্যমেই একটি মদিনাকেন্দ্রীক রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ ও আন্তর্জাতিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

বিস্তারিত কিছু ঘটনা

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জ

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের অন্যতম প্রধান এবং সবচেয়ে জটিল বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

ছিল সমসাময়িক বিশ্বের দুটি পরাশক্তি—*পূর্ব রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য* এবং *পারস্যের সাসানীয় সাম্রাজ্য*-এর মুখোমুখি হওয়া। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলেই এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমদের সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর ১০ বছরের শাসনকালে তা পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই দ্বিমুখী ও বিশাল সামরিক চ্যালেঞ্জ তিনি মোকাবেলা করেছিলেন। একই সময়ে দুটি শক্তিশালী ও সুপ্রশিক্ষিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা যেকোনো সামরিক নেতৃত্বের জন্য আত্মঘাতী হতে পারত। হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে *"একমুখী মনোযোগ"* কৌশল গ্রহণ করেন। মদিনায় বসে তিনি দূরবর্তী দুই রণক্ষেত্রের সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তিনি নিজেই যুদ্ধের রণকৌশল, সৈন্য বিন্যাস এবং রসদ সরবরাহের দিকনির্দেশনা দিতেন। প্রথমে তিনি পারস্যের চেয়ে সিরিয়া (রোমান সীমান্ত) অঞ্চলের দিকে বেশি মনোযোগ দেন, যাতে একদিকের হুমকি সম্পূর্ণ দূর করে অন্যদিকের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা যায়।রোমানরা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং তাদের ছিল অপরাজেয় নৌ ও স্থলবাহিনী। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল থেকে তাদের হঠানো ছিল এক কঠিন পরীক্ষা।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ (১৫ হিজরি / ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ): এটি ছিল রোমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে সেনাপতি *খালিদ বিন ওয়ালিদ* এবং *আবু উবাইদাহ (রা.)*-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী রোমানদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের ফলে সিরিয়ায় রোমান শাসনের অবসান ঘটে।

জেরুজালেম বিজয় (১৬ হিজরি): ইয়ারমুকের পরাজয়ের পর রোমানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। জেরুজালেমের খ্রিস্টান ধর্মযাজক পোপ *সোফ্রোনিয়াস* রক্তপাতহীন আত্মসমর্পণের জন্য খলীফা ওমরের ব্যক্তিগত উপস্থিতির শর্ত দেন। হযরত উমর (রা.) মদিনা থেকে নিজে গিয়ে ঐতিহাসিক 'ওমরের চুক্তি' (Treaty of Omar)-র মাধ্যমে জেরুজালেম অধিকার করেন, যা খ্রিস্টান ও মুসলিমদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।পারস্যের শাসকরা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় এবং কট্টর শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ইরাক ও ইরান অঞ্চলে তাদের বিশাল হাতি-বাহিনী এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কাদিসিয়ার যুদ্ধ (১৫ হিজরি / ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ): পারস্যের সেনাপতি রুস্তমের বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত উমর (রা.) অভিজ্ঞ সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে প্রেরণ করেন।

চার দিনব্যাপী এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পারসিকরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের রাজধানী 'মাদায়েন' (Ctesiphon) মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

নেহাভন্দের যুদ্ধ (২১ হিজরি / ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দ): পারসিকরা তাদের মানসম্মান ও সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য শেষবারের মতো দেড় লাখের এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। হযরত উমর (রা.) একে *"বিজয়ের বিজয়"* হিসেবে অভিহিত করে চূড়ান্ত অভিযানের নির্দেশ দেন। এই যুদ্ধে পারসিকদের সম্পূর্ণ পতন ঘটে এবং শেষ সম্রাট ইয়াজদাগির্দ প্রাণভয়ে পালিয়ে যান। এর ফলে সমগ্র পারস্য (বর্তমান ইরান) ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কেবল যুদ্ধজয়ই শেষ কথা ছিল না, রোম ও পারস্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বিশাল ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখাই ছিল আসল চ্যালেঞ্জ। রোমান বা পারসিকরা যেন আবার সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ (Counter-attack) করতে না পারে, সেজন্য তিনি বিজিত অঞ্চলের কৌশলগত স্থানে স্থায়ী সামরিক ছাউনি বা সেনানিবাস শহর গড়ে তোলেন (যেমন: কুফা ও বসরা)। রোমান ও পারসিক শাসকদের করের বোঝা এবং ধর্মীয় নিপীড়নে স্থানীয় সাধারণ জনগণ (খ্রিস্টান ও সাধারণ পারসিক) অতিষ্ঠ ছিল। হযরত উমর (রা.) বিজিত অঞ্চলে শরিয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠা করে সবার জানমাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন। ফলে স্থানীয় জনগণ মুসলিমদের শোষক নয়, বরং 'মুক্তিদাতা' হিসেবে গ্রহণ করে, যা রোম ও পারস্যের পুনরুত্থানের পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়।

হযরত উমর (রা.) রোম ও পারস্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কেবল সামরিক শক্তি ব্যবহার করেননি, বরং তাঁর অনন্য প্রশাসনিক নীতি, দক্ষ সেনাপতি নির্বাচন (যেমন: খালিদ বিন ওয়ালিদ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আমর ইবনুল আস) এবং বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম প্রজাদের প্রতি মানবিক আচরণের মাধ্যমে এই দুই পরাশক্তিকে চিরতরে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আমওয়াসের মহামারি (Plague of Amwas)

আমওয়াসের মহামারি ছিল ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ও বেদনাদায়ক মানব বিপর্যয়। হিজরি ১৮ সনে (৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে *সিরিয়া ও ফিলিস্তিন* অঞ্চলে এই ভয়াবহ প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনের জেরুজালেম এবং রামাল্লার মধ্যবর্তী 'আমওয়াস' (Amwas) নামক একটি ছোট শহর থেকে এর সূত্রপাত হয়েছিল বলে ইতিহাসে একে "আমওয়াসের মহামারি" বলা হয়। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক, সামরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই মহামারির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারীরোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধ এবং জেরুজালেম বিজয়ের পর সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল তখন সদ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঠিক এই সময়েই আকস্মিকভাবে প্লেগ রোগটি দেখা দেয়। তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে এটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে সিরিয়ায় অবস্থানরত বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে এটি মহামারি আকার ধারণ করে। ঐতিহাসিকদের মতে, এই মহামারিতে প্রায় *২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ মানুষ* মৃত্যুবরণ করেন, যাদের একটি বড় অংশই ছিলেন মুসলিম সৈন্য ও তাঁদের পরিবার।এই মহামারির সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল ইসলামের প্রথম সারির এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ একঝাঁক সাহাবি ও সামরিক কমান্ডারের অকাল মৃত্যু। ইসলামের ইতিহাসে এটি এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল:

* **আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.):** তিনি ছিলেন সিরিয়া অঞ্চলের প্রধান গভর্নর ও প্রধান সেনাপতি, যাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) *"উম্মতের আমিন"* (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) উপাধি দিয়েছিলেন। উমর

(রা.) তাঁকে মদিনায় ফিরিয়ে এনে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের সৈন্যদের ছেড়ে আসতে অস্বীকৃতি জানান এবং প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

* **মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.):** আবু উবাইদাহ (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি সিরিয়ার দায়িত্ব নেন, কিন্তু তিনিও সপরিবারে এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

* **ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.):** তিনি ছিলেন সিরিয়ার অন্যতম প্রধান সামরিক কমান্ডার (আমীর মুয়াবিয়া রা.-এর বড় ভাই)। তিনিও এই রোগে মারা যান।

এছাড়া *সুহাইল ইবনে আমর (রা.) এবং আল-হারিস ইবনে হিশাম (রা.)*-এর মতো প্রখ্যাত সাহাবিগণও এই মহামারিতে প্রাণ হারান। মহামারির খবর পেয়ে হযরত উমর (রা.) মদিনা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু 'সারগ' (Sargh) নামক স্থানে পৌঁছালে সিরিয়ার সেনাপতিরা তাঁকে মহামারির ভয়াবহতার কথা জানান। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত ও *আধুনিক কোয়ারেন্টাইন* ব্যবস্থার ঐতিহাসিক উদাহরণ তৈরি হয়:

উমর (রা.) প্রবীণ সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন যে মহামারির ভেতর তাঁর যাওয়া উচিত কি না। এই সময় *হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)*-এর একটি বিখ্যাত হাদিস স্মরণ করিয়ে দেন: *"তোমরা যখন কোনো এলাকায় প্লেগের বিস্তারের কথা শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর যদি তোমরা যেখানে অবস্থান করছ সেখানে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে, তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ো না।" (সহীহ বুখারী)* এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে উমর (রা.) মদিনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে, *মুয়াজ (রা.)*-এর মৃত্যুর পর সিরিয়ার সাময়িক নেতৃত্ব পান দূরদর্শী সাহাবি *আমর ইবনুল আস (রা.)* তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় রোগ বেশি ছড়ায়। তিনি ঘোষণা করলেন—*"এই প্লেগ হচ্ছে আগুনের মতো, আর মানুষ হচ্ছে এর জ্বালানি।"* তিনি পুরো বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন শহরের সংকীর্ণ জায়গা ছেড়ে চারপাশের পাহাড় পর্বত এবং উন্মুক্ত উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়তে। তাঁর এই *'সামাজিক দূরত্ব' ও 'আইসোলেশন'* কৌশলের কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মহামারি নিয়ন্ত্রণে আসে।

রোমানদের হঠানোর পরপরই ২৫,০০০ অভিজ্ঞ ও বিজয়ী সৈন্যের মৃত্যু মুসলিম সেনাবাহিনীর শক্তি সাময়িকভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। তবে রোমানরাও এই মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তারা তাৎক্ষণিক কোনো পাল্টা আক্রমণ করতে পারেনি। সিরিয়ার শীর্ষ নেতৃত্বের অবর্তমানে *হযরত উমর (রা.)* তরুণ ও দক্ষ নেতা *হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.)*-কে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগটি পরবর্তী ইসলামী ইতিহাসের রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের একসাথে মৃত্যুর কারণে বিজিত অঞ্চলে বিশাল সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার (মিরাস) বণ্টনের জটিলতা দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) নিজেই পরবর্তীতে সিরিয়া সফর করে এই সমস্ত আইনি ও অর্থনৈতিক জটিলতার সমাধান করেন এবং মৃত সৈন্যদের পরিবারগুলোর জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।

আমওয়াসের মহামারি ছিল হযরত উমর (রা.)-এর শাসন আমলের অন্যতম কঠিন একটি পরীক্ষা। একদিকে যেমন এটি মুসলিম উম্মাহকে গভীরভাবে শোকাহত করেছিল, অন্যদিকে এর মাধ্যমে ইসলামী আইনশাস্ত্রে ছোঁয়াচে রোগ ও মহামারি ব্যবস্থাপনার (Epidemic Management) একটি শাশ্বত ও আধুনিক নীতিগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রমাদার বছর (Year of Ashes)

রমাদার বছর ছিল হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং কঠিন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট। হিজরি ১৮ সনে (৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনা এবং এর আশপাশের

সমগ্র হিজাজ অঞ্চলে এই নজিরবিহীন অনাবৃষ্টি ও তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আরবি 'রমাদ' (الرماد) শব্দের অর্থ হচ্ছে ছাই। দীর্ঘ ৯ মাস এক ফোঁটা বৃষ্টি না হওয়ায় মাঠ-ঘাট শুকিয়ে ধুলোবালিতে পরিণত হয়েছিল, বাতাস ধূলিধূসরিত হয়ে পড়েছিল এবং তীব্র খরায় মাটি পুড়ে ছাইয়ের মতো রঙ ধারণ করেছিল। এ কারণেই এই বছরটিকে ইসলামের ইতিহাসে " *আমুর রামাদা" বা "রমাদার বছর*" বলা হয়। এই দুর্ভিক্ষ আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলকে সম্পূর্ণ স্থবির করে দিয়েছিল। চারণভূমি শুকিয়ে যাওয়ায় গবাদিপশু দলে দলে মরতে শুরু করে। বন্য পশুপাখিরাও খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসত। তীব্র ক্ষুধার কারণে মানুষ মৃত পশুপাখির চামড়া ও হাড় সেদ্ধ করে খেতে বাধ্য হয়েছিল।মদিনার চারপাশের মরুভূমি ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ৬০,০০০-এর বেশি ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব মানুষ খাবারের আশায় মদিনা শহরে এসে আশ্রয় নেয়। মদিনা একটি বিশাল শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়।

প্রজাদের এই চরম দুর্দশায় খলীফা হযরত উমর (রা.) নিজের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল একজন শাসকের চরম সহমর্মিতার অনন্য উদাহরণ,তিনি কসম খেয়ে বলেন, *"যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ পেট ভরে খেতে পারছে, ততক্ষণ আমার জন্য ঘি এবং দুধ খাওয়া হারাম।"* দুর্ভিক্ষ চলাকালীন তিনি কেবল *রুক্ষ রুটি এবং জয়তুনের তেল* খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। পুষ্টিহীনতার কারণে তাঁর গায়ের উজ্জ্বল রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বাবুর্চি একবার বাজারে কিছু ঘি ও দুধ পেয়ে খলীফার জন্য কিনে আনলে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা সাধারণ অভাবী মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলতেন, *"আমি যদি প্রজাদের কষ্ট নিজে অনুভব না করি, তবে আমি তাদের শাসক হওয়ার যোগ্য নই।"* হযরত উমর (রা.) মদিনার রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল) সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেন। তবে পরিস্থিতি এতই জটিল ছিল যে কেবল মদিনার রসদ দিয়ে তা সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তিনি দূরদর্শী কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেন। তিনি মদিনায় আসা হাজার হাজার শরণার্থীর জন্য বিশাল লঙ্গরখানা খোলেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের জন্য খাবার রান্না করা হতো। উমর (রা.) নিজে রাতে মদিনার অলিগলিতে ঘুরে শরণার্থীদের খোঁজখবর নিতেন এবং তদারকি করতেন। মদিনার মজুত শেষ হয়ে গেলে তিনি সিরিয়া, মিশর ও ইরাকের মতো সমৃদ্ধ বিজিত অঞ্চলের গভর্নরদের কাছে জরুরি চিঠি পাঠান। তিনি লেখেন: *"হে উম্মতের সাহায্যকারী! মদিনার মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের বাঁচান।"খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) এবং ইরাকের গভর্নর আবু মুসা আশআরি (রা.) বিশাল ত্রাণবহর পাঠান। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আমর ইবনুল আস (রা.) এত বিশাল খাদ্যবাহী উটের বহর পাঠিয়েছিলেন যার প্রথম উটটি যখন মদিনায় পৌঁছায়, শেষ উটটি তখনও মিশরে ছিল। এছাড়া লোহিত সাগর দিয়ে মদিনার নিকটবর্তী জার বন্দরে জাহাজে করে হাজার হাজার মণ শস্য পাঠানো হয়। দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের জীবন বাঁচাতে হযরত উমর (রা.) ইসলামী শরিয়াহর কিছু আইনের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত বা শিথিল করেছিলেন। ইসলামী আইনে চুরির শাস্তি হাত কেটে ফেলা হলেও উমর (রা.) এই বছর সেই শাস্তি স্থগিত করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, মানুষ যখন ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে খাবার চুরি করে, তখন তা অপরাধের আওতায় পড়ে না; বরং এটি সমাজের ও রাষ্ট্রের ব্যর্থতা।এই সংকটময় বছরে তিনি প্রজাদের ওপর থেকে যাকাত ও কর আদায় সাময়িকভাবে মওকুফ করেন। পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি পূর্ববর্তী বছরের যাকাত সহজ কিস্তিতে আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।তদানীন্তন সব ধরনের মানবিক ও প্রশাসনিক প্রচেষ্টা চালানোর পাশাপাশি হযরত উমর (রা.) আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি ও ইস্তিসকার (বৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনা) নামাজ আদায় করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা *হযরত আব্বাস (রা.)*-কে সাথে নিয়ে ঐতিহাসিক ইস্তিসকার দোয়া করেন। এর কিছুদিন পরই

আরবে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। ধূসর মরুভূমি আবার সবুজ হয়ে ওঠে, ফসলের ক্ষেত সতেজ হয় এবং মদিনায় আসা শরণার্থীরা নিজ নিজ গোত্রে ফিরে যায়।
রমাদার বছর বা তীব্র দুর্ভিক্ষ ছিল একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংকটকালীন পরীক্ষা। হযরত উমর (রা.) তাঁর অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা, দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথে নিখুঁত সমন্বয় এবং সর্বোপরি প্রজাদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার মাধ্যমে এই মহাবিপদ থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' (Welfare State) এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ওমরের এই শাসনকালকে একটি শাশ্বত মডেল হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিজরি সনের প্রবর্তন

হিজরি সনের প্রবর্তন ইসলামি ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামি পঞ্জিকা বা হিজরি অব্দ গণনার সূচনা হয়েছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায় বা প্রথম খলিফা *হযরত আবু বকর (রা.)*-এর আমলে মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোনো বর্ষপঞ্জি বা সরকারি সন ছিল না। তখন আরবের মানুষ কোনো বিশেষ বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে বছরের হিসাব রাখত *(যেমন: 'আমুল ফিল' বা হস্তী বছর)*। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন ইসলামি সাম্রাজ্য ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের কাছে চিঠি পাঠানো এবং দাপ্তরিক নথিপত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারিখ ও বছর নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যেমন— একটি চিঠিতে শুধু "শাবান মাস" লেখা ছিল, কিন্তু সেটি চলতি বছরের নাকি গত বছরের, তা বোঝার কোনো উপায় ছিল না। এই প্রশাসনিক জটিলতা দূর করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হযরত উমর (রা.) এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাহাবিদের নিয়ে একটি জরুরি পরামর্শ সভার (মজলিসুশ শূরা) আয়োজন করেন। সভায় নতুন সন গণনার শুরু নিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব আসে:

** কেউ প্রস্তাব করেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর **জন্মের বছর** থেকে সন গণনা শুরু হোক।*
** কেউ বলেন তাঁর **নবুয়ত প্রাপ্তির বছর** থেকে শুরু করতে।*
** আবার কেউ তাঁর **ওফাত (মৃত্যু)-এর বছর** থেকে গণনার প্রস্তাব দেন।*

*কিন্তু **হযরত আলী (রা.)** প্রস্তাব করেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় **"হিজরত"**-এর ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ষপঞ্জি শুরু করা উচিত।* কারণ, হিজরতের মাধ্যমেই ইসলামে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরি হয়েছিল এবং মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্ব লাভ করেছিল। হযরত উমর (রা.) সহ সমস্ত সাহাবি এই প্রস্তাবে সর্বসম্মতভাবে একমত হন। হিজরতের ঘটনাটি ঘটেছিল রবিউল আউয়াল মাসে। কিন্তু সন গণনার ক্ষেত্রে বছরের প্রথম মাস কোনটি হবে, তা নিয়ে আলোচনা হলে **হযরত উসমান (রা.)** প্রস্তাব করেন **"মহররম"** মাস দিয়ে বছর শুরু করার। কারণ, প্রাক-ইসলামি আমল থেকেই আরবে মহররম মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরা হতো এবং হজের সফর শেষে আরবরা এই মাসেই নিজ নিজ এলাকায় ফিরে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করত। এই প্রস্তাবটিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সংক্ষেপে হিজরি সনের মূল তথ্য:

* **প্রবর্তক:** দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)
* **প্রবর্তনের বছর:** ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে (হিজরতের ১৭ বছর পর)
* **ভিত্তি:** মহানবী (সা.)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঐতিহাসিক ঘটনা (৬২২ খ্রিস্টাব্দ)
* **গণনা পদ্ধতি:** হিজরি সন পুরোপুরি **চন্দ্রবর্ষ** (Lunar Calendar)। চাঁদের আবর্তনের ওপর ভিত্তি

করে ২৯ বা ৩০ দিনে মাস গণনা করা হয়। ফলে সৌর বছরের (খ্রিস্টাব্দ) চেয়ে হিজরি বছর সাধারণত ১০ থেকে ১১ দিন ছোট হয়।

তারাবির জামাত এবং রাকাত

তারাবির নামাজ জামাতে এবং ২০ রাকাতে পড়ার নিয়মটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। এটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপ লাভ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজান মাসে রাতের এই বিশেষ নামাজ (যা পরবর্তীতে তারাবি নামে পরিচিত হয়) একা পড়তেন। তবে ৮ম হিজরির রমজান মাসে তিনি টানা *৩ দিন (মতান্তরে ৪ দিন)* মসজিদে জামাতের সাথে এই নামাজ আদায় করেন। ৪র্থ দিন রাতে মসজিদে প্রচুর মানুষের সমাগম হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.) হুজরা শরিফ থেকে বের হননি। পরদিন সকালে তিনি সাহাবিদের জানান, *"তোমাদের আগ্রহ আমি দেখেছি। কিন্তু আমি এই ভয়ে বের হইনি যে, পাছে এই নামাজ তোমাদের ওপর ফরজ করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে তোমরা তা আদায় করতে না পারো।" (সহিহ বুখারি)* এরপর থেকে *রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর* ওফাত পর্যন্ত এবং প্রথম খলিফা *হযরত আবু বকর (রা.)*-এর পুরো খিলাফতকালে সাহাবিরা যার যার মতো *একা বা ছোট ছোট দলে বিভক্ত* হয়ে মসজিদে তারাবির নামাজ পড়তেন। ১৪ হিজরিতে (খ্রিস্টাব্দ ৬৩৫) হযরত উমর (রা.) খলিফা হওয়ার পর এক রমজানের রাতে মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখেন, মানুষ scattered বা বিক্ষিপ্তভাবে নামাজ আদায় করছেন— কেউ একা পড়ছেন, আবার কেউ ছোট দল বেঁধে একজনের পেছনে পড়ছেন। এই বিশৃঙ্খলা দূর করতে এবং মসজিদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হযরত উমর (রা.) একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ভাবলেন, সবাইকে যদি একজন দক্ষ কারীর (ইমাম) পেছনে একত্র করে দেওয়া যায়, তবে বিষয়টি চমৎকার হয়। তিনি বিখ্যাত সাহাবি ও কারী *হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.)*-কে প্রধান ইমাম নিযুক্ত করেন এবং সবাইকে তাঁর পেছনে জামাতে তারাবি পড়ার নির্দেশ দেন।পরদিন রাতে যখন তিনি সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে এক জামাতে নামাজ পড়তে দেখলেন, তখন সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন: *"নে'মাল বেদআতু হাজিহি"* অর্থাৎ *"এটি কতই না চমৎকার নতুন ব্যবস্থা!"* (এখানে 'বেদআত' শব্দটি শাব্দিক অর্থে তথা একটি সুশৃঙ্খল নতুন প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ধর্মীয় আকিদাগত অর্থে নয়) ।হযরত উমর (রা.)-এর এই উদ্যোগের সময়ই সাহাবিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে (ইজমা) তারাবির নামাজ ২০ রাকাত হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর পক্ষে শক্তিশালী ঐতিহাসিক দলিলগুলো হলো-বিখ্যাত সাহাবি সায়েব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন,"আমরা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে রমজান মাসে ২০ রাকাত (তারাবি) এবং বিতর নামাজ পড়তাম।"(সুনানে বায়হাকি, হাদিসটি সহিহ) *ইয়াজিদ ইবনে রুমান (রা.)* বলেন "হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মানুষ রমজানে ২৩ রাকাত (২০ রাকাত তারাবি ও ৩ রাকাত বিতর) নামাজ আদায় করত।"(মুয়াত্তা ইমাম মালিক)। হযরত উমর (রা.)-এর এই ২০ রাকাতের সিদ্ধান্তকে তাঁর সমসাময়িক কোনো সাহাবি (*যেমন: হযরত আলী, হযরত উসমান, হযরত ইবনে মাসউদ রা.*) বিরোধিতা করেননি। ইসলামের ইতিহাসে সাহাবিদের এমন সর্বসম্মত ঐক্যকে *"ইজমায়ে সাহাবা"* বলা হয়, যা ইসলামি শরিয়তের অন্যতম প্রধান দলিল।

চার মাযহাব ও পরবর্তী যুগের ধারাবাহিকতাঃ হযরত উমর (রা.)-এর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদে (মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববী) শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ২০ রাকাত তারাবিই চালু রয়েছে। ইসলামের চার প্রধান ফিকহি মাযহাবের ইমামদের মতও এর পক্ষে:

ইমাম আবু হানিফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.): তাঁদের মতে তারাবির নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং তা ২০ রাকাত।
ইমাম মালিক (র.): তাঁর এক বর্ণনা মতে ২০ রাকাত, তবে মদিনার বাসিন্দাদের আমলের ওপর ভিত্তি করে তাঁর অন্য এক বর্ণনায় ৩৬ রাকাতের কথাও রয়েছে।
তবে চার মাযহাবের কেউই ৮ রাকাতের কথা বলেননি।
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে এবং উম্মতের ওপর ফরজ হয়ে যাওয়ার ভয় দূর হওয়ার পর, হযরত উমর (রা.)-এর প্রশাসনিক ও দ্বীনি প্রজ্ঞায় সাহাবিদের ঐকমত্যের মাধ্যমে ২০ রাকাত তারাবির নামাজ জামাতে পড়ার বিধানটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

বায়তুল মাল সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা **'বায়তুল মাল'**-এর ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর ঘটে। তিনিই প্রথম বায়তুল মালকে একটি সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী সরকারি বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। উমর (রা.)-এর পূর্বে (রাসূলুল্লাহ সা. ও হযরত আবু বকর রা.এর আমলে) রাষ্ট্রীয় আয় আসার সাথে সাথেই তা জনগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো, কোনো স্থায়ী তহবিল জমা রাখা হতো না। কিন্তু পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের পর যখন বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ আসতে শুরু করে, তখন হযরত উমর (রা.) মদিনায় একটি কেন্দ্রীয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে *আঞ্চলিক বায়তুল মাল* স্থাপন করেন। মদিনার কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের দেখাশোনার জন্য তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.)-কে খাজাঞ্চী বা কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তার সময়ে বায়তুল মালের আয় বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু উৎস নির্ধারণ এবং সেগুলোর যথাযথ সংস্কার করা হয়:
যাকাত ও ওশর: মুসলিমদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত এবং ফসলি জমি থেকে 'ওশর' (দশমাংশ কর) আদায় করা হতো।
জিজিয়া: বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা ও সামরিক খাত থেকে অব্যাহতির বিনিময়ে এই কর নেওয়া হতো।
খারাজ (ভূমি রাজস্ব): বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম কৃষকদের জমির ওপর কর বা খারাজ ধার্য করা হয়। উমর (রা.) ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের জমি সৈনিকদের মাঝে বণ্টন না করে রাষ্ট্রের মালিকানায় রেখে দেন, যা থেকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আসত।
উশুর (বাণিজ্যিক শুল্ক): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর ১০% আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা হয়, যা আগে ছিল না।
গনিমত (যুদ্ধের মাল): যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো।
হযরত উমর (রা.) বায়তুল মালের অর্থ সুশৃঙ্খলভাবে বণ্টনের জন্য 'দিওয়ান' বা একটি রাষ্ট্রীয় খাতা/রেজিস্টার তৈরি করেন। এই খাতায় প্রতিটি নাগরিকের নাম ও তাদের ভাতার পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকত।
** ইসলামের প্রতি অবদান, ত্যাগ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে এই ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত হতো।*
** আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) সহ উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য সর্বোচ্চ ভাতা নির্ধারণ করা হয়।*
** সাধারণ মুসলিম, নবজাতক শিশু, এমনকি বৃদ্ধ ও পঙ্গু অমুসলিম নাগরিকদের জন্যও বায়তুল মাল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।*

বায়তুল মালের অর্থকে উমর (রা.) জনগণের আমানত মনে করতেন এবং এর ব্যবহারে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি বলতেন, *" *বায়তুল মালের ধন-সম্পদের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক তেমন, যেমন কোনো এতিমের সম্পত্তির সাথে তার অভিভাবকের সম্পর্ক থাকে।*"* (অর্থাৎ, প্রয়োজন না হলে তিনি নিজের জন্য সেখান থেকে এক পয়সাও নিতেন না)। প্রাদেশিক গভর্নর বা কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়ার সময় তাদের সম্পদের হিসাব নেওয়া হতো এবং খেলাফতকালে তাদের সম্পদ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে তা বায়তুল মালে বাজেয়াপ্ত করা হতো। ব্যক্তিগত ভাতার পাশাপাশি বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে রাস্তাঘাট, সেতু, খাল খনন, মুসাফিরখানা এবং সামরিক ছাউনি নির্মাণ করা হতো। মদিনার বাইরে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সহায়তার জন্য বায়তুল মালের অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো।সংক্ষেপে বলতে গেলে, হযরত উমর (রা.)-এর হাত ধরেই বায়তুল মাল একটি আধুনিক, সুশৃঙ্খল এবং কল্যাণমুখী রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

খাল খনন

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে কৃষি বিপ্লব, বাণিজ্য সচল রাখা এবং দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একটি সুপরিকল্পিত খাল খনন ও নদী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল।

নহরে আমীরুল মুমিনীন (নিল-লোহিত সাগর সংযোগ খাল):১৮ হিজরিতে (৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) আরবে 'আমুল রামাদাহ' বা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মদিনার খাদ্য সংকট দূর করতে খলিফা মিসরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-কে একটি খাল খননের নির্দেশ দেন। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে মিশরের ফাসতাত (কায়রো) থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত প্রায় ৬৯ মাইল দীর্ঘ এই খালটি খনন করা হয়। এর ফলে নীল নদ ও লোহিত সাগর সংযুক্ত হয় এবং মিসর থেকে সরাসরি জাহাজে করে খাদ্যশস্য মদিনার বন্দর 'জার'-এ পৌঁছানো সম্ভব হয়।

নহরে মাকিল (বসরা, ইরাক): ইরাকের বসরা অঞ্চলে সুপেয় পানির তীব্র সংকট ছিল এবং চারপাশের জমি অনাবাদী পড়ে থাকত। খলিফার নির্দেশে বিখ্যাত সাহাবি মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে দজলা (টাইগ্রিস) নদী থেকে একটি বিশাল খাল খনন করা হয়। এটি বসরার বিস্তীর্ণ মরুভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করে এবং খলিফা এই খালের আশেপাশের অনাবাদী জমি সাধারণ মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন।

নহরে সাদ (কুফা, ইরাক): কুফা নগরীর মানুষের পানির চাহিদা মেটাতে এবং কৃষিকাজের সুবিধার্থে খলিফা ওমরের নির্দেশে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী থেকে এই খালটি খনন করান।

খাল খনন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ও প্রভাবঃ 'নহরে আমীরুল মুমিনীন' খননের ফলে আরবে খাদ্যের স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। দূরদেশ থেকে উটের পিঠে করে খাদ্য আনার ধীরগতির অবসান ঘটে এবং নৌপথে দ্রুত রসদ পৌঁছানো সম্ভব হয়।ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের হাজার হাজার একর অনাবাদী এবং মরুভূমি প্রায় জমি এই খালগুলোর কল্যাণে চাষাবাদের আওতায় আসে।খলিফা নিয়ম করেছিলেন যে, খালের পানিতে যে নতুন জমি উর্বর হবে, তার ওপর নামমাত্র 'খারাজ' বা ভূমিকর ধার্য করা হবে। এতে কৃষকরা উৎসাহিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আয় বৃদ্ধি পায়। এই খালগুলো কেবল সেচের জন্য নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিশেষত আরব ও মিসরের মধ্যে ব্যবসার খরচ ও সময় এতে বহুগুণ কমে যায়।খলিফা উমর (রা.)-এর এই দূরদর্শী পদক্ষেপকে আধুনিক যুগের "সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা"এর প্রাচীন এবং অন্যতম সফল রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আদমশুমারি

ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের অন্যতম প্রধান একটি বৈপ্লবিক সংস্কার ছিল **পদ্ধতিগত আদমশুমারি (Census) এবং জনমিতি ব্যবস্থাপনা**। তৎকালীন বিশ্বব্যবস্থায় যখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের হিসাব রাখার কোনো সুনির্দিষ্ট বা আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না, তখন হযরত উমর (রা.) একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর প্রয়োজনে এই দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে যখন একের পর এক নতুন ভূখণ্ড বিজিত হচ্ছিল এবং ইসলামি খেলাফতের সীমানা বিশাল আকার ধারণ করছিল, তখন কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মূলত দুটি প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এই শুমারির নির্দেশ দেন। রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা, বিশেষ করে যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের সঠিক সংখ্যা জানা, যাতে একটি সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যায়। ও রাষ্ট্রের নাগরিক বা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং সংখ্যা জেনে সেই অনুযায়ী জাতীয় সম্পদ, অনুদান এবং ভাতা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা।হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই শুমারি সম্পন্ন করার জন্য *হিজরি ১৫ সনে (৬৩৬ খ্রিস্টাব্দ)* একটি পৃথক বিভাগ বা দপ্তর খোলেন, যা ইতিহাসের পাতায় *'দেওয়ান'* নামে পরিচিত। এটি ছিল মূলত বর্তমান যুগের রেজিস্ট্রি বা ডাটাবেজ অফিস। *শুমারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিশিষ্ট সাহাবি আকিল ইবনে আবি তালিব, মাখরামা ইবনে নাওফাল এবং জুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)-কে, যাঁরা বংশানুক্রমিক লিপি ও মানুষের বংশমর্যাদা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।তাঁরা প্রতিটি পরিবার, গোত্র এবং গোত্রের প্রধানদের নাম লিপিবদ্ধ করেন। মানুষের নাম, তাদের পরিবার, সন্তানদের সংখ্যা, দাস-দাসী এবং তাদের আর্থিক অবস্থার বিবরণ নথিবদ্ধ করা হতো।*আদমশুমারির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হযরত উমর (রা.) প্রতিটি নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বার্ষিক বা মাসিক ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করেন। ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামের জন্য ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে এই স্তরায়ন করা হয়েছিল। *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ (উম্মাহাতুল মুমিনিন) এবং আহলে বাইতের সদস্যরা সর্বোচ্চ ভাতা পেতেন।এরপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা, তারপর উহুদ এবং পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের বীরেরা। সবশেষে সাধারণ মুসলিম নাগরিক এবং সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্যও ভাতার সুনির্দিষ্ট তালিকা রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হতো।*প্রথম দিকে কেবল মায়ের দুধ ছাড়ানো শিশুদের জন্য রাষ্ট্র থেকে ভাতা দেওয়া হতো। কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.) জানতে পারলেন যে ভাতার আশায় মায়েরা শিশুদের দ্রুত দুধ ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, তখন তিনি শুমারির নিয়ম পরিবর্তন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, *"ইসলামি রাষ্ট্রে প্রতিটি নবজাতক শিশু জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই তার নাম শুমারির খাতায় উঠে যাবে এবং রাষ্ট্র তার লালন-পালনের দায়িত্ব (ভাতা) গ্রহণ করবে।"*বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম নাগরিকদের (জিম্মি) জনসংখ্যা এবং আর্থিক অবস্থার সঠিক হিসাবও এই শুমারির মাধ্যমে রাখা হতো। তাদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে *'জিজিয়া'* কর নির্ধারণ করা হতো। অতি বৃদ্ধ, শিশু, নারী, ধর্মযাজক এবং পঙ্গু ব্যক্তিদের এই তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাদের কর মওকুফ করা হতো এবং উল্টো রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে তাদের সাহায্য করা হতো।শুমারির খাতা দেখে খলিফা খুব সহজেই বুঝতে পারতেন কোন গোত্র বা কোন অঞ্চল থেকে কতজন সৈন্য দ্রুত সমবেত করা সম্ভব। কার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা

কেমন এবং কার কী অস্ত্র রয়েছে, তা নথিতে থাকায় তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হতো।হযরত উমর (রা.)-এর এই আদমশুমারি ও রেজিস্ট্রি ব্যবস্থা কেবল শুষ্ক কিছু সংখ্যার হিসাব ছিল না; এটি ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম সুসংগঠিত *'সোশ্যাল সিকিউরিটি বা সামাজিক নিরাপত্তা'* ডাটাবেজ। আধুনিক উন্নত বিশ্বে আজ যে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণা দেখা যায়, যেখানে নাগরিকদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব তথ্য রেখে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়, তার প্রকৃত ভিত্তিপ্রস্তর আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে হযরত উমর (রা.) মদিনার বুকে স্থাপন করে গেছেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসনকাল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ। বিশেষ করে তার বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উন্নত, নিরপেক্ষ এবং যুগোপযোগী। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ তার বিচারিক দূরদর্শিতা দেখে আজও বিস্মিত হন। উমর (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থার কিছু উজ্জ্বল ও ঐতিহাসিক উদাহরণ হলো:

বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণঃ উমর (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল তিনি ইতিহাসের প্রথম শাসক, যিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ (Executive) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছিলেন।প্রাদেশিক গভর্নর বা প্রশাসকদের বিচারিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তিনি প্রতিটি প্রদেশে স্বাধীন 'কাজী' বা বিচারক নিয়োগ করেন। বিচারকরা যাতে কোনো লোভ বা দুর্নীতির শিকার না হন, সেজন্য তিনি বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তাদের জন্য উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

নিজের ছেলের ওপর শরীয়া আইন প্রয়োগঃ হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতকালের অন্যতম একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং ঐতিহাসিক ঘটনা হলো তাঁর নিজের *ছেলে আবু শাহমা (আব্দুর রহমান)*-এর ওপর শরীয়া আইন (হদ) প্রয়োগ। এই ঘটনাটি কেয়ামত পর্যন্ত বিচারকদের জন্য নিরপেক্ষতা ও ইনসাফের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা ও হাদিসের গ্রন্থ (যেমন: *মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, সুনানে বায়হাকী* ইত্যাদি) থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।ঘটনাটি ঘটেছিল তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ মিশরে। হযরত উমর (রা.)-এর ছেলে আবু শাহমা তখন মিশরে অবস্থান করছিলেন। সে সময় মিশরের গভর্নর বা আমীর ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি *হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)*। আবু শাহমা একবার মিশরে অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন বা কোনো কারণে তীব্র শারীরিক অস্বস্তি বোধ করেন। তখন তাঁকে মদ্যমিশ্রিত এক ধরনের পানীয় (নবীয বা তৎকালীন ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত তরল) পান করানো হয়, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত তাঁকে মাতাল করে ফেলে। নেশা কেটে যাওয়ার পর আবু শাহমা বুঝতে পারেন যে তাঁর দ্বারা মদ্যপানের মতো মস্ত বড় গুনাহ হয়ে গেছে। তীব্র অনুশোচনা ও আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তিনি নিজেই মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আস (রা.)-এর কাছে গিয়ে হাজির হন। তিনি বলেন: *"আমি অপরাধ করেছি, আমার ওপর আল্লাহর নির্ধারিত হদ (ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী চাবুকের আঘাত) প্রয়োগ করুন।"* সাধারণত যেকোনো সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য স্থানে এই শাস্তি কার্যকর করা হতো। কিন্তু খলিফার ছেলে হওয়ায় হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কিছুটা ইতস্তত বোধ করেন। খলিফার মর্যাদা এবং তাঁর পরিবারের সম্মানের কথা চিন্তা করে তিনি আবু শাহমাকে জনগণের সামনে শাস্তি

না দিয়ে *নিজের বাড়ির ভেতরের আঙিনায় (গোপনে)* চাবুক মারার ব্যবস্থা করেন। শাস্তি শেষে আবু শাহমার মাথা মুণ্ডন করে দেওয়া হয় (যা তৎকালীন সময়ে হদ প্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রে করা হতো)। এই ঘটনার খবর যখন মদিনায় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছায়, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। তিনি গভর্নরের প্রতি রাগ প্রকাশ করেন এই কারণে যে—কেন খলিফার ছেলেকে সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা সুবিধা দেওয়া হলো? কেন সবার সামনে শাস্তি না দিয়ে ঘরের ভেতর দেওয়া হলো? উমর (রা.) অবিলম্বে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠোর: *"তুমি আব্দুর রহমানকে (আবু শাহমা) ঘরের ভেতর শাস্তি দিয়েছ এবং তার মাথাও ঘরের ভেতর কামিয়েছ। অথচ তুমি ভালো করেই জানো যে, এটি আমার সুন্নাত ও আদেশের পরিপন্থী। আব্দুর রহমান তোমার সাধারণ প্রজাদেরই একজন। অন্য মুসলিমদের সাথে যেভাবে আচরণ করো, তার সাথেও ঠিক তেমন আচরণ করা উচিত ছিল। চিঠি পাওয়ামাত্র তাকে একটি উটের পিঠে চড়িয়ে মদিনায় পাঠিয়ে দাও।"*

পিতার নির্দেশ অনুযায়ী আবু শাহমাকে অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থায় মদিনায় পাঠানো হয়। তিনি যখন মদিনায় পৌঁছান, তখন তিনি উটের সফরের কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অসুস্থ ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাকে দেখা মাত্রই আল্লাহর আইন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করার প্রস্তুতি নেন। উপস্থিত সাহাবিদের অনেকেই আবু শাহমার অসুস্থতা এবং মিশরে অলরেডি শাস্তি পাওয়ার কথা বিবেচনা করে কিছুটা নরম হওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু উমর (রা.) ছিলেন আল্লাহর আইনের ব্যাপারে আপসহীন। তিনি বলেন:"*মিশরে তাকে যেভাবে খাতির করে ঘরের ভেতর শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহর হদ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি ছিল না। আইনের দৃষ্টিতে খলিফার ছেলে আর সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।*"উমর (রা.) নিজেই চাবুক হাতে নেন এবং আবু শাহমার ওপর পুনরায় প্রকাশ্যে হদ কার্যকর করা শুরু করেন (কিছু বর্ণনা মতে, তিনি জল্লাদকে দিয়ে চাবুক মারান এবং নিজে দাঁড়িয়ে তা তদারকি করেন)। আবু শাহমা যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলছিলেন, *"বাবা, আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন না!"* উমর (রা.) উত্তর দিয়েছিলেন, *"যদি তুমি আল্লাহর শাস্তি সহ্য করতে পারো, তবেই তুমি বাঁচবে। তোমার পিতা তোমাকে পরকালের আগুন থেকে বাঁচাতে চায়।"* মিশর থেকে দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি এবং মদিনায় পুনরায় কঠোর চাবুকের আঘাত—সব মিলিয়ে আবু শাহমা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। শাস্তি শেষ হওয়ার কিছুদিন পর (কারো কারো মতে এক মাস পর) তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর শয্যায় বা মৃত্যুর ঠিক পূর্বে উমর (রা.) তাঁর ছেলের মাথায় হাত রেখে কেঁদেছিলেন এবং বলেছিলেন, *"আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি দুনিয়াতেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলে।"* ঘটনাটির ভয়াবহতা এবং হযরত ওমরের (রা.) কঠোর ইনসাফ বোঝাতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে কিছু মানুষ গল্প বানিয়ে প্রচার করেছে যে, *"শাস্তি শেষ হওয়ার আগেই ছেলে মারা গিয়েছিল, তাই বাকি চাবুক উমর (রা.) কবরের ওপর গিয়ে মেরেছেন।"* ইসলামের শরীয়া আইন অনুযায়ী কোনো মৃত ব্যক্তি বা লাশের ওপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করার কোনো নিয়ম নেই।প্রকৃত সত্য হলো শাস্তি দেওয়ার সময় আবু শাহমা জীবিত ছিলেন এবং শাস্তি পুরোপুরি শেষ হয়েছিল। শাস্তি ভোগ করার পর অসুস্থজনিত কারণে পরে তিনি মারা যান। হযরত উমর (রা.) একজন অত্যন্ত বড় ফকীহ (আইনজ্ঞ) ছিলেন, তাই শরীয়তের নিয়ম লঙ্ঘন করে মৃতদেহের ওপর বা কবরে চাবুক মারার প্রশ্নই ওঠে না।

জাবালা ইবনুল আইহামের ঐতিহাসিক মামলাঃ সিরিয়ার খ্রিষ্টান রাজা জাবালা ইবনুল আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় কাওবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। তওয়াফের সময় ভুলবশত এক দরিদ্র বেদুইন তার চাদরের ওপর পা দিয়ে ফেলে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা জাবালা সেই বেদুইনের মুখে চড় মারেন।বেদুইন ব্যক্তিটি উমর (রা.)-এর দরবারে বিচারপ্রার্থী হন। উমর (রা.) জাবালাকে ডেকে বলেন, "হয় তোমাকে এই বেদুইনের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, না হলে সেও তোমাকে প্রকাশ্যে চড় মারবে।"জাবালা অবাক হয়ে বলেন, "আমি একজন রাজা আর সে সাধারণ বেদুইন!" উমর (রা.) উত্তর দিয়েছিলেন, "ইসলাম আপনাদের দুজনকে সমান করে দিয়েছে। ইসলামের বিচারে রাজার কোনো বাড়তি সুবিধা নেই।"

খলিফা বনাম সাধারণ ইহুদির মামলাঃ একবার উমর (রা.) এবং একজন সাধারণ ইহুদির মধ্যে একটি ঘোড়া কেনা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। উমর (রা.) ঘোড়াটি পরীক্ষা করার জন্য সওয়ার হওয়ার পর ঘোড়াটি জখম হয়। ইহুদি ব্যক্তিটি ক্ষতিপূরণ দাবি করে।উমর (রা.) বিষয়টি মীমাংসার জন্য বিখ্যাত বিচারক শুরাইহ্ (র.)-এর কাছে যান।বিচারক শুরাইহ্ খলিফার বিপক্ষে এবং ইহুদির পক্ষে রায় দিয়ে বলেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি ঘোড়াটি যেভাবে সুস্থ অবস্থায় নিয়েছিলেন, সেভাবেই ফেরত দিন অথবা মূল্য পরিশোধ করুন।"
উমর (রা.) এই রায়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং বিচারকের সততা দেখে তাকে কুফার প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।

যুগের প্রয়োজনে আইনের নমনীয়তা (ইজতিহাদ)ঃ উমর (রা.) অন্ধভাবে আইন প্রয়োগ করতেন না, বরং অপরাধের পেছনের পরিস্থিতি বিবেচনা করতেন। *দুর্ভিক্ষের বছর চুরির শাস্তি স্থগিত*: হিজরি ১৮ সালে মদিনায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন পেটের দায়ে বা ক্ষুধার্ত হয়ে কেউ চুরি করলে উমর (রা.) চোরের হাত কাটার শাস্তি (হদ) স্থগিত করেছিলেন। কারণ রাষ্ট্র তখন নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা দিতে পারছিল না।

উমর (রা.) এর কিছু ঘটনা

জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) বিজয়, চুক্তি ও মানবিক দৃষ্টান্ত

হযরত উমর (রা.)-এর জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) বিজয় এবং সেখানকার খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিটি বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম এক গৌরবময় অধ্যায়। এটি কেবল একটি সামরিক বা রাজনৈতিক বিজয় ছিল না, বরং ইসলামের মানবিকতা, সহনশীলতা এবং খলিফার ব্যক্তিগত সততার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমল থেকেই *সিরিয়া ও ফিলিস্তিন* অঞ্চলে *রোমান (বাইজেন্টাইন)* সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। *হযরত উমর (রা.)*-এর শাসনামলে সেনাপতি *আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)* এবং *আমর ইবনুল আস (রা.)-এর* নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী একে একে বেশ কিছু অঞ্চল জয় করে জেরুজালেম অভিমুখে অগ্রসর হন।মুসলিম বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে জেরুজালেম অবরোধ করে রাখে। অবরুদ্ধ থাকার পর সেখানকার খ্রিস্টান শাসক ও প্রধান ধর্মীয় যাজক (প্যাট্রিয়ার্ক) *সোফ্রোনিয়াস* বুঝতে পারেন যে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়। তবে তারা আত্মসমর্পণ করার জন্য একটি অদ্ভুত ও ঐতিহাসিক শর্ত দেন। তারা জানান, তারা কোনো সেনাপতির কাছে নগরীর চাবি হস্তান্তর করবেন না; স্বয়ং মুসলিম জাহানের খলিফা উমর কে মদিনা থেকে আসতে হবে এবং তারা কেবল তাঁর হাতেই জেরুজালেমের চাবি তুলে দেবেন। সেনাপতি আবু উবাইদাহ (রা.) খলিফাকে মদিনায় চিঠি পাঠিয়ে এই শর্তের কথা জানান। তৎকালীন সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য পারস্য এবং রোমান শক্তির বড় বড় অঞ্চল জয় করে এক

বিশাল পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। অথচ, সেই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হযরত উমর (রা.) কোনো বিশাল রাজকীয় বহর বা সৈন্যসামন্ত ছাড়াই জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা হন।তাঁর সাথে ছিল মাত্র: *একটি উট, একজন ব্যক্তিগত দাস (ভৃত্য), যাত্রাপথের জন্য সামান্য কিছু খাবার (খেজুর ও ছাতু)।*দীর্ঘ মরুভূমির পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য তাঁরা একটি মানবিক নিয়ম তৈরি করেছিলেন—*উটটিতে তাঁরা পালাক্রমে চড়বেন।* অর্থাৎ, এক মাইল খলিফা উটের পিঠে চড়বেন তো পরের মাইল দাস চড়বেন, আর খলিফা নিজে উটের রশি ধরে হেঁটে চলবেন। যখন তাঁরা জেরুজালেমের প্রবেশদ্বারে পৌঁছান, তখন কাকতালীয়ভাবে উটের পিঠে বসার পালা ছিল দাসের। দাসটি অত্যন্ত লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে খলিফাকে উটে বসার অনুরোধ করেন। কিন্তু উমর (রা.) ন্যায়ের দাবিতে অটল ছিলেন। তিনি বললেন, *" *না, এটি তোমার পালা। আমি ন্যায়ের খেলাপ করতে পারি না।"** ফলে, খলিফা নিজে সাধারণ ছেঁড়া ও তালি দেওয়া পোশাকে উটের রশি ধরে কাদা-মাটি মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, আর উটের পিঠে বসেছিলেন তাঁর দাস। জেরুজালেমের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টান যাজক ও রোমান কর্মকর্তারা এই দৃশ্য দেখছিলেন। তারা আশা করেছিলেন, পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শাসক হয়তো কোনো জমকালো রাজকীয় পোশাকে, ঘোড়ার গাড়িতে করে, শত শত বডিগার্ড নিয়ে আসবেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন যে দাস উটের পিঠে আর খলিফা নিজে পায়ে হেঁটে আসছেন, তখন তারা স্তব্ধ হয়ে যান। *প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রোনিয়াস* খলিফার এই সততা, বিনম্রতা ও সাম্য দেখে অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। তিনি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যৎবাণীর কথা স্মরণ করে বলেন, *"ঠিক এই গুণাবলীর কথাই আমাদের কিতাবে লেখা আছে। এই পবিত্র নগরী তাঁর হাতেই নিরাপদ।"* এরপর তারা কোনো রক্তপাত ছাড়াই অত্যন্ত সম্মানের সাথে জেরুজালেমের চাবি হযরত উমর (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। নগরীর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর হযরত উমর (রা.) জেরুজালেমের অমুসলিম (খ্রিস্টান ও ইহুদি) নাগরিকদের ধর্মীয় ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি ঐতিহাসিক দলিল সই করেন। ইতিহাসে এটি *"আহদ আল-ওমরিয়া" বা "ওমরের চুক্তি"* নামে পরিচিত। এই চুক্তির মূল ধারাগুলো ছিল অত্যন্ত আধুনিক ও মানবাধিকার রক্ষাকারী:

***জানমালের নিরাপত্তা:** জেরুজালেমের সমস্ত নাগরিকের জীবন, সম্পদ এবং তাদের পরিবারের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

* **ধর্মীয় স্বাধীনতা:** কারও ওপর ধর্ম নিয়ে কোনো জবরদস্তি করা হবে না। খ্রিস্টানদের উপাসনালয় (গির্জা) ভাঙা হবে না, দখল করা হবে না এবং সেগুলোর কোনো ক্ষতি করা হবে না।

* **ক্রুশ ও ধর্মীয় প্রতীকের নিরাপত্তা:** তাদের ধর্মীয় প্রতীক ও ক্রুশের কোনো অপমান করা হবে না।

* **নাগরিক অধিকার:** যারা কর (জিজিয়া) প্রদান করবে, তারা রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের মতোই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা পাবে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রোনিয়াস খলিফাকে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান *'চার্চ অব দ্য হোলি সেপালকার'* ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। পরিদর্শনের সময় সালাতের (নামাজের) ওয়াক্ত হয়ে যায়। *সোফ্রোনিয়াস* খলিফাকে অত্যন্ত উদারতার সাথে গির্জার ভেতরেই সালাত আদায় করার অনুরোধ জানান। কিন্তু *হযরত উমর (রা.)* অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি গির্জার বাইরে এসে খোলা জায়গায় সালাত আদায় করেন। *সোফ্রোনিয়াস* এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উমর (রা.) জবাব দেন: *"আজ যদি আমি এই গির্জার ভেতরে সালাত আদায় করি, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুসলমানরা ভাববে খলিফা উমর এখানে সালাত আদায় করেছিলেন। এই অজুহাতে তারা হয়তো একদিন তোমাদের এই পবিত্র গির্জাটিকে মসজিদে রূপান্তর করে ফেলবে, যা তোমাদের সাথে করা আমার চুক্তির পরিপন্থী হবে।"* হযরত ওমরের এই অসাধারণ দূরদর্শিতা ও

অমুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের কারণে আজও সেই গির্জাটি খ্রিস্টানদের অন্যতম প্রধান পবিত্র স্থান হিসেবে সুরক্ষিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে খলিফা যেখানে সালাত আদায় করেছিলেন, ঠিক সেই স্থানেই একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যা আজ *"মসজিদে উমর"* নামে পরিচিত।
এই পুরো ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে বিজিত অঞ্চলের মানুষের অধিকার ও ধর্মীয় অনুভূতির কতটা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

রোম সম্রাটের দূতের সাথে ঘটা এই ঐতিহাসিক ঘটনা

হযরত উমর (রা.)-এর জীবন ছিল একদিকে যেমন পরাক্রমশালী শাসকের, অন্যদিকে তেমনই একজন অতি সাধারণ ও বৈরাগ্যপূর্ণ মানুষের। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি—পারস্য (ইরান) এবং রোমান (বাইজেন্টাইন) সাম্রাজ্যের বিশাল অংশজুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। রোমান সম্রাট (*কোয়াসার বা সিজার*) মদিনার খলিফার এই অভূতপূর্ব বিজয়ের খবর শুনে এবং তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সম্রাট তাঁর একজন বিশেষ দূতকে মদিনায় পাঠান খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় ঠাটবাট ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। তৎকালীন রোম বা পারস্যের রাজারা বিশাল সব প্রাসাদে থাকতেন, যেখানে শত শত সশস্ত্র প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। দূতের ধারণা ছিল, যিনি এত বড় সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন, তাঁর প্রাসাদ নিশ্চয়ই আরও বেশি জমকালো হবে। রোমান দূত যখন মদিনায় পৌঁছালেন, তখন তিনি চারদিকে তাকিয়ে কোনো রাজপ্রাসাদ বা দুর্গের মতো স্থাপনা দেখতে পেলেন না। তিনি মদিনার সাধারণ মানুষদের জিজ্ঞেস করলেন, *"তোমাদের রাজার প্রাসাদটি কোথায়? আর তাঁর বডিগার্ডরাই বা কোথায় থাকেন?"* মদিনার মানুষরা অবাক হয়ে উত্তর দিল, *"আমাদের কোনো রাজা নেই, আমাদের আছেন একজন খলিফা (নেতা)। আর তাঁর কোনো রাজপ্রাসাদ বা দেহরক্ষীও নেই।"*দূত আরও বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *"তাহলে আমি এখন তাঁর দেখা কোথায় পাবো?"*একজন মদিনাবাসী তখন মদিনার উপকণ্ঠের একটি মাঠের দিকে ইশারা করে বললেন, *"তিনি ওই দিকে গেছেন, আপনি ওখানে গিয়ে দেখতে পারেন।"* দূত যখন নির্দেশিত স্থানে পৌঁছালেন, তখন তিনি যা দেখলেন তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। তিনি দেখলেন, ধুলোবালির ওপর একটি সাধারণ খেজুর গাছের ছায়ায় একজন মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। *তাঁর শরীরে ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও তালি দেওয়া একটি জামা।তাঁর মাথায় বা পিঠের নিচে কোনো নরম বালিশ ছিল না; বরং তাঁর চাবুক বা হাতের দুররাটি (শাসন করার চামড়ার লাঠি) ভাঁজ করে মাথার নিচে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।তাঁর আশেপাশে কোনো অস্ত্রধারী প্রহরী তো দূরের কথা, কোনো সাধারণ মানুষও পাহারা দিচ্ছিল না।* উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসককে এভাবে একা, অরক্ষিত এবং শান্তিতে ঘুমাতে দেখে রোমান দূত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।এই দৃশ্য দেখে রোম সম্রাটের সেই প্রখর বুদ্ধিমান দূত এক গভীর সত্য উপলব্ধি করলেন। তিনি নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে উঠলেন, যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে: *"হে উমর ! আপনি (আপনার প্রজাদের প্রতি) পূর্ণ ন্যায়বিচার করেছেন, তাই আপনি আজ এত নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে ঘুমাতে পারছেন। আর আমাদের রাজারা জনগণের ওপর জুলুম করে, তাই তারা বিশাল রাজপ্রাসাদে এবং হাজারো সশস্ত্র প্রহরীর বেষ্টনীতে থেকেও ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারে না।"* এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি থেকে তৎকালীন ইসলামী খেলাফতের দুটি প্রধান দিক ফুটে ওঠে:

* **ন্যায়বিচারই প্রকৃত নিরাপত্তা:** হযরত উমর (রা.) বিশ্বাস করতেন, একজন শাসকের আসল নিরাপত্তা কোনো অস্ত্র বা সৈন্যে নয়, বরং তার সুশাসনে। তিনি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের (মুসলিম

ও অমুসলিম) অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। যেহেতু তিনি কারও ওপর অন্যায় বা জুলুম করেননি, তাই তাঁর মনে কোনো শত্রুতার ভয় ছিল না।

* **ক্ষমতার নির্মোহতা:** বিশাল সাম্রাজ্যের কোষাগার (বায়তুল মাল) তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের জন্য এক আনা পয়সাও বাড়তি খরচ করেননি। রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও তিনি একজন সাধারণ দিনমজুরের মতো জীবনযাপন করতেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

ক্ষুধার্ত শিশু ও খলিফার পিঠে আটার বস্তা নেয়া

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর দায়বদ্ধতা। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি পশুপাখিও যদি না খেয়ে মারা যায়, তবে আল্লাহর কাছে শাসক হিসেবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। হযরত উমর (রা.) প্রায়ই রাতের বেলা মদিনার অলিতে-গলিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা নিজ চোখে দেখার জন্য ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সাথে সাধারণত তাঁর মুক্তদাস '*আসলাম*' থাকতেন। এক রাতে মদিনা থেকে ৩ মাইল দূরে *'সারার'* নামক এক প্রত্যন্ত এলাকায় টহল দেওয়ার সময় তিনি দূরে একটি আগুন জ্বলতে দেখেন। তিনি ভাবলেন, হয়তো কোনো কাফেলা বা মুসাফির রাতে আশ্রয় নিয়েছে। উৎসুক হয়ে তিনি আগুনের দিকে এগিয়ে যান। কাছে গিয়ে তিনি যা দেখলেন তা ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। একজন নারী চুলার ওপর একটি পাতিল বসিয়ে রেখেছেন এবং তার চারপাশে কয়েকটি ছোট ছোট শিশু ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করে কাঁদছে। উমর (রা.) নারীটিকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভেতরে আসার অনুমতি আছে?" অনুমতি পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এই শিশুদের কী হয়েছে? এরা এভাবে কাঁদছে কেন?" নারীটি জবাব দিলেন, "এরা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে।" উমর (রা.) অবাক হয়ে চুলার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে পাতিলে কী রান্না হচ্ছে?" নারীটি এক বুক কষ্ট নিয়ে বললেন, "পাতিলে কেবল পানি আর কিছু পাথর ফুটছে। আমি ওদের বোঝাচ্ছি যে খাবার তৈরি হচ্ছে, যাতে ওরা অপেক্ষায় থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের আর ওমরের মাঝে আল্লাহই বিচার করবেন!" নারীটি খলিফাকে চিনতে পারেননি। উমর (রা.) চমকে উঠে বললেন, "আল্লাহ আপনার ওপর রহমত করুন! উমর কীভাবে জানবে যে আপনারা এখানে এই কষ্টে আছেন?" নারীটি ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিলেন, "তিনি আমাদের খলিফা হয়েছেন অথচ আমাদের খবর রাখবেন না, তা কী করে হয়? তবে কেন তিনি আমাদের দায়িত্ব নিলেন?"এই কথা শুনে উমর (রা.)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে দ্রুত মদিনার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বায়তুল মাল) ছুটে গেলেন। বায়তুল মালে গিয়ে তিনি একটি বস্তায় আটা, চর্বি, খেজুর এবং কিছু ঘি ভর্তি করলেন। এরপর তিনি তাঁর দাস আসলামকে বললেন, "বস্তাটি আমার পিঠে তুলে দাও।" আসলাম লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার দাস, আমি এটি বহন করব।" তখন উমর (রা.) একটি ঐতিহাসিক কথা বলেছিলেন: *"তুমি কি কিয়ামতের দিনও আমার পাপের বোঝা তোমার পিঠে বহন করবে? আজ যদি আমি এই নারীর দায়িত্ব পালনে অবহেলা করি, তবে হাশরের ময়দানে আল্লাহ আমাকে ধরবেন, তোমাকে নয়।"* খলিফা নিজেই সেই ভারী বস্তা পিঠে নিয়ে ৩ মাইল হেঁটে সেই নারীর তাঁবুতে পৌঁছালেন। তিনি শুধু খাবার দিয়েই খালাস পাননি, নিজে উবু হয়ে বসে ফুঁ দিয়ে চুলা জ্বালালেন এবং নিজ হাতে আটা ও চর্বি দিয়ে 'হারীরা' (এক ধরণের সুজি বা স্যুপ) রান্না করলেন। আসলাম বর্ণনা করেন, "আমি দেখছিলাম খলিফার ঘন দাড়ি ভেদ করে চুলার ধোঁয়া বের হচ্ছিল।"রান্না শেষে তিনি শিশুদের নিজ হাতে খাওয়ালেন। শিশুরা যখন পেট ভরে খেয়ে হাসতে হাসতে ঘুমিয়ে পড়ল, তখন খলিফার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল। যাওয়ার সময় তিনি নারীটিকে পরদিন মদিনায় খলিফার কার্যালয়ে আসতে বললেন। পরদিন যখন নারীটি খলিফার

দরবারে এসে দেখলেন যে রাতের সেই ব্যক্তিটিই স্বয়ং খলিফা, তখন তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। উমর (রা.) তাকে অভয় দিয়ে বায়তুল মাল থেকে তাঁর ও তাঁর সন্তানদের জন্য স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করে দেন।

সত্যতাঃএই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং সম্পূর্ণ সত্য।
ইমাম ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'তারীখ উমর ইবনুল খাত্তাব'* এবং ইমাম তাবারী তাঁর *'তারীখুত তাবারী'* (ইতিহাস গ্রন্থ)-এ এটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হুবহু বর্ণনা করেছেন হযরত উমর (রা.)-এর মুক্তদাস *আসলাম (রা.)*। তিনি নিজেই সেই রাতে খলিফার সাথে ছিলেন এবং পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত এই রেওয়ায়েতটি (বর্ণনা) মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। খলিফার দায়িত্ববোধ বোঝাতে মুসলিম বিশ্বে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ঘটনাটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দুধে পানি মেশানোর প্রতিবাদ ও সততার পুরস্কার

অন্য এক রাতে হযরত উমর (রা.) যখন মদিনার এক মহল্লা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন একটি ঘরের ভেতর থেকে মা ও মেয়ের কথোপকথন তাঁর কানে আসে। রাত তখন অনেক গভীর। মা তাঁর মেয়েকে বলছিলেন, *"মা, সকাল হয়ে আসছে। জলদি করো, দুধে কিছুটা পানি মিশিয়ে নাও।* তাহলে সকালে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।" (তৎকালীন সময়ে দুধে পানি মেশানো আইনি ও ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল)। মেয়েটি অত্যন্ত সততা ও বিনম্রতার সাথে জবাব দিল, " *মা, আপনি কি জানেন না যে আমিরুল মুমিনীন উমর দুধে পানি মেশাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং বাজারে এই মর্মে ঘোষণাও জারি করেছেন?"*মা উত্তর দিলেন, " *আরে রাখো তোমার ওমরের কথা! এই গভীর রাতে উমর কি তোমাকে দেখছেন? তিনি তো এখন নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছেন।"* মেয়েটি তখন এমন এক ঈমানদীপ্ত জবাব দিল, যা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা খলিফা ওমরের অন্তর ছুঁয়ে গেল। মেয়েটি বলল: *"উমর না হয় আমাদের দেখছেন না, কিন্তু ওমরের আল্লাহ তো আমাদের দেখছেন! মানুষের চোখের আড়ালে অন্যায় করা গেলেও আল্লাহর চোখের আড়ালে তো কিছু করা যায় না।"* মেয়ের এই উত্তর শুনে উমর (রা.) অত্যন্ত অভিভূত হলেন। তিনি সেই বাড়িটি চিহ্নিত করে রাখলেন এবং সকালে দরবারে ফিরে তাঁর পুত্র *আসেমকে* ডেকে পাঠালেন। উমর (রা.) *আসেমকে* বললেন, *"আমি মদিনার এক প্রান্তে এক পরম রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের সন্ধান পেয়েছি, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় অতুলনীয়। আমি চাই তুমি তাকে বিয়ে করো।"*পিতার ইচ্ছে অনুযায়ী আসেম (র.) সেই দরিদ্র কিন্তু সৎ মেয়েটিকে বিয়ে করেন।

সত্যতাঃ এই ঘটনাটিও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং এর সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। *ইমাম বায়হাকী* তাঁর *'শূআবুল ঈমান'* গ্রন্থে এবং *ইবনে আসাকির* তাঁর *'তারীখু দিমাস্ক'* গ্রন্থে এটি সংকলন করেছেন। এছাড়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক *ইবনুল জাওযী* তাঁর *'সিফাতুস সাফওয়াহ'* গ্রন্থেও এটি উল্লেখ করেছেন।এই ঘটনাটির সত্যতার সবচেয়ে বড় বাস্তব প্রমাণ হলো এই দম্পতির বংশধারা। এই বিয়ের পর তাঁদের ঘরে একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়, যাঁর নাম ছিল উম্মু আসেম। এই উম্মু আসেমের সাথে পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফা আব্দুল আজিজের বিয়ে হয়। আর তাঁদের ঘরেই পরবর্তীতে জন্ম নিয়েছিলেন ইসলামের ইতিহাসের আরেক বিখ্যাত এবং ন্যায়পরায়ণ খলিফা **হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)***(যাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলিফাও বলা হয়ে থাকে)*। সেই মেয়েটির সততা কেবল তার ভাগ্যই বদল করায়নি, বরং ইসলামের ইতিহাসে এক মহান শাসকের জন্ম দিয়েছিল।

মসজিদের মিম্বারে জবাবদিহিতা

একবার ইয়েমেন থেকে মদিনায় কিছু যুদ্ধলব্ধ কাপড় (গনিমত) আসে। সেই কাপড়গুলো মদিনার

মুসলিমদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রত্যেকে একটি করে কাপড়ের টুকরো পেয়েছিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোগুলো আকারে এমন ছিল যে, তা দিয়ে একজন সাধারণ উচ্চতার মানুষের একটি পুরো জামা তৈরি করা সম্ভব হলেও, হযরত উমর (রা.)-এর মতো দীর্ঘকায় (লম্বা) মানুষের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। এর কিছুদিন পর খলিফা হযরত উমর (রা.) জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর গায়ে সেই ইয়েমেনি কাপড়ের তৈরি একটি নতুন লম্বা জামা শোভা পাচ্ছিল। তিনি খুতবা শুরু করে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, *"হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা শোনো এবং আমার আনুগত্য করো।"*খলিফার এই কথা শেষ হতে না হতেই মজলিসে উপস্থিত একজন সাধারণ সাহাবী (বর্ণনামতে *সালমান ফারসি রা.* অথবা অন্য একজন সাহাবী) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, *"হে উমর ! আমরা আপনার কথা শুনব না এবং আপনার আনুগত্যও করব না!"*হযরত উমর (রা.) মোটেও রাগান্বিত হলেন না। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, *"কেন হে আল্লাহর বান্দা?"*সেই ব্যক্তি বললেন, "*কারণ আপনি আমাদের সবাইকে একটি করে চাদর দিয়েছেন। আপনার মতো লম্বা মানুষের জন্য একটি চাদরে এত বড় জামা হওয়া অসম্ভব। তার মানে আপনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে নিজের জন্য বেশি কাপড় নিয়েছেন! যতক্ষণ না আপনি এই কাপড়ের হিসাব দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা আপনার কথা শুনব না।"মিম্বারে দাঁড়িয়ে খলিফা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের পক্ষে কোনো সাফাই গাইলেন না। তিনি*জনসভার মাঝে ডেকে উঠলেন, *"আব্দুল্লাহ! ইবনে উমর ! তুমি দাঁড়িয়ে এর জবাব দাও।"*তখন হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে বললেন, *"আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার বাবা যে জামাটি পরে আছেন, তা তৈরি করতে দুটি চাদর লেগেছে। তিনি যখন একটি চাদর দিয়ে নিজের জামা বানাতে পারছিলেন না, তখন আমি আমার অংশের চাদরটি আমার বাবাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিই। আর সেই দুটি চাদর মিলিয়েই এই জামাটি তৈরি করা হয়েছে।"*পুত্রের এই সততা ও স্পষ্ট জবাব শোনার পর সেই প্রশ্নকারী সাহাবী সন্তুষ্ট হলেন এবং আবেগপ্লুত হয়ে বললেন, *"হ্যাঁ, এখন আপনি বলুন। আমরা এখন আপনার কথা শুনব এবং আপনার আনুগত্য করব।"*

এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষণীয়:

**নেতার জবাবদিহিতা:* একজন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবেননি। একজন সাধারণ নাগরিকের প্রশ্নের উত্তর তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়েই দিয়েছেন। ** প্রশ্ন করার অধিকার:* ইসলামের সুবর্ণ যুগে সাধারণ মানুষের এতটাই বাকস্বাধীনতা ছিল যে, তারা খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর পোশাক নিয়ে জবাবদিহিতা চাইতে পারতেন। **অহংকারহীনতা:* ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও উমর (রা.) সেই প্রশ্নকারীকে কোনো শাস্তি দেননি বা তাঁর ওপর রাগ করেননি, যা একজন আদর্শ নেতার সবচেয়ে বড় গুণ।

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের পদক্ষেপসমূহ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য যে দূরদর্শী ও নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা ইসলামের ইতিহাসে *"উচ্চপর্যায়ের শুরা পদ্ধতি"* নামে পরিচিত। ২৩ হিজরীতে (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) পারসিক *দাস আবু লুলু ফেরোজের* মাধ্যমে মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হওয়ার পর, তিনি বিছানায় শায়িত অবস্থায় খিলাফতের উত্তরাধিকার নির্ধারণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করেন। তিনি এককভাবে কাউকে মনোনীত না করে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ উন্মুক্তও না রেখে একটি অনন্য ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে নিয়ে একটি নির্বাচনী বোর্ড বা শুরা কমিটি

গঠন করেন, যাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) আজীবন সন্তুষ্ট ছিলেন। এই কমিটির সদস্যরা হলেন- *হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.)* (তিনি নির্বাচনের সময় মদিনার বাইরে ছিলেন) হযরত উমর (রা.) খেলাফতের পদকে পারিবারিক রাজতন্ত্রে রূপ দেওয়া থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখেন। তিনি তাঁর যোগ্য পুত্র *হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)*-কে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তবে একটি কঠোর শর্ত জুড়ে দেন: আবদুল্লাহ কেবল পরামর্শদাতা এবং টাই-ব্রেকার (যদি ভোট সমান হয়) হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবে, কিন্তু *সে নিজে খলীফা পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে না এবং খিলাফতের কোনো দাবিদার হতে পারবে না।* রাষ্ট্রীয় স্তরে যাতে কোনো শূন্যতা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেজন্য হযরত উমর (রা.) কঠোর সময়সীমা বেঁধে দেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ *৩ দিনের মধ্যে* এই কমিটিকে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে খলীফা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। চতুর্থ দিন যেন মদিনার মুসলমানরা একজন নতুন খলীফার অধীনে ফজরের সালাত আদায় করতে পারে। নির্বাচন প্রক্রিয়া যেন কোনো প্রকার প্রভাব বা চাপমুক্তভাবে সম্পন্ন হতে পারে, সেজন্য তিনি সামরিক ও প্রশাসনিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। *মিশওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.)*-কে শুরা সদস্যদের একত্রিত করার ও আলোচনার পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আনসারদের অন্যতম নেতা *হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.)*-কে ৫০ জন সশস্ত্র সৈন্যসহ শুরা কমিটির সভাকক্ষের বাইরে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়, যাতে বহিরাগত কেউ হস্তক্ষেপে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। জানাজার নামাজ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মদিনার ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয় *হযরত সুহাইব রূমী (রা.)*-কে। উমর (রা.) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য ভোট ও মতামতের বিন্যাস কেমন হবে তা নির্ধারণ করে দেন:

** যদি ছয়জনের মধ্যে ৪ জন একদিকে এবং ২ জন অন্যদিকে মত দেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের (৪ জনের) সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।*

** যদি ৩-৩ জন করে মতামত সমান ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় (টাই হয়), তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সালিশি করবেন।*

** শুরা কমিটি যদি আবদুল্লাহর মধ্যস্থতা মেনে না নেয়, তবে যে পক্ষে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) থাকবেন, সেই পক্ষের সিদ্ধান্ত বা প্রার্থীকে খলীফা হিসেবে মেনে নিতে হবে (কারণ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ শুরুতেই নিজেকে খলীফা হওয়ার দৌড় থেকে প্রত্যাহার করে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।*

হযরত উমর (রা.)-এর ওফাতের পর তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটি বৈঠকে বসে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে মদিনার আমজনতা, নারী, হজের সফর থেকে ফেরা কাফেলা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত (জনমত জরিপ) গ্রহণ করেন। অবশেষে, ৩ দিনব্যাপী নিবিড় আলোচনা ও সাধারণ মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে **হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)** ইসলামের তৃতীয় খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন এবং হযরত আলী (রা.)-সহ

সকল সাহাবী তাঁর হাতে বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর এই সুশৃঙ্খল পদক্ষেপ উম্মাহকে একটি সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করেছিল।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন একটি অধ্যায়। ২৩ হিজরীর জিলহজ মাসে (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে পারস্য (ইরান) মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে পরাজিত পারসিকদের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। মদিনায় *মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.)*-এর *আবু লুলু ফেরোজ* নামক এক পারসিক দাস ছিল। সে ছিল মূলত একজন কামার, ছুতার ও নকশাকার। আবু লুলু খলীফা ওমরের কাছে এসে তাঁর মালিকের নির্ধারিত কর বা ভাতার পরিমাণ বেশি—এই মর্মে অভিযোগ করে। উমর (রা.) তার কাজের দক্ষতা বিবেচনা করে হিসাব করে দেখলেন যে, করের পরিমাণ একেবারেই ন্যায্য। তিনি অভিযোগটি নাকচ করে দিলে আবু লুলু মনে চরম ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা পুষে রাখে। একদিন উমর (রা.) তাকে রসিকতা করে বলেছিলেন, *"শুনলাম তুমি নাকি এমন যাঁতা বানাতে পারো যা বাতাসের সাহায্যে চলে?"* আবু লুলু তখন রাগতস্বরে উত্তর দিয়েছিল, *"আমিরুল মুমিনীন! আমি আপনার জন্য এমন এক যাঁতা তৈরি করব, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ স্মরণ রাখবে।"* হযরত উমর (রা.) তখনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। ২৩ হিজরীর ২৬ শে জিলহজ, ফজরের সালাতের সময় এই নির্মম ঘটনাটি ঘটে। হযরত উমর (রা.) যথারীতি সালাতের ইমামতি করার জন্য দাঁড়ান এবং কাতার সোজা করার নির্দেশ দেন। সালাত শুরু করার পরপরই, প্রথম কাতারের পেছনে লুকিয়ে থাকা আবু লুলু ফেরোজ একটি বিষাক্ত ও দু'ধারী খঞ্জর (ছুরি) নিয়ে খলীফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে হযরত উমর (রা.)-এর কাঁধে, বুকে এবং নাভির নিচে পেটে পর পর *ছয়টি আঘাত* করে। মারাত্মক আঘাত পেয়ে হযরত উমর (রা.) লুটিয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ নামাজের মুসল্লিদের মধ্য থেকে *হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)*-কে টেনে ইমামের জায়গায় এগিয়ে দেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) সংক্ষিপ্তভাবে *সূরা আসর* দিয়ে ফজরের সালাত শেষ করেন। আঘাত করার পর আবু লুলু মসজিদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পালানোর সময় সে খঞ্জর ঘোরাতে ঘোরাতে মসজিদের ভেতরে থাকা অন্যান্য সাহাবীদের ওপরও চড়াও হয়। তার এই উন্মত্ত হামলায় *প্রায় ১৩ জন সাহাবী আহত হন, যাঁদের মধ্যে ৭ জন পরবর্তীতে মারা যান।* অবশেষে এক আনসার সাহাবী তাঁর ওপর একটি চাদর বা কম্বল ছুড়ে দিয়ে তাকে জাপটে ধরেন। নিজেকে অবরুদ্ধ এবং ধরা পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখে পাপী *আবু লুলু* সেই বিষাক্ত খঞ্জর দিয়েই নিজের গলায় আঘাত করে *আত্মহত্যা করে।* আঘাতের পর মূর্ছিত হযরত উমর (রা.)-কে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর জ্ঞান ফেরে, তখন তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল: *"মানুষ কি সালাত আদায় করেছে?"* (অর্থাৎ, তাঁর নিজের এত বড় বিপদের চেয়েও উম্মতের সালাত ঠিকমতো সম্পন্ন হলো কি না, তা নিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত ছিলেন)। যখন তাঁকে জানানো হলো যে, মানুষ সালাত শেষ করেছে, তখন তিনি বললেন, *"যে সালাত ত্যাগ করে, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।"* এরপর তিনি জানতে চান তাঁর হত্যাকারী কে ছিল। যখন শুনলেন হত্যাকারী কোনো মুসলমান নয়, বরং এক পারসিক অগ্নিউপাসক (মাজুসি) দাস, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলেন: *"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মৃত্যুকে এমন কোনো ব্যক্তির হাতে নির্ধারণ করেননি, যে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে অন্তত একটি*

সিজদাও করেছে।" আঘাত পাওয়ার পর চিকিৎসক ডেকে যখন হযরত উমর (রা.)-কে খেজুরের রস ও দুধ খাওয়ানো হলো, তখন তা পেটের ক্ষত দিয়ে বের হয়ে আসছিল। চিকিৎসকরা যখন বুঝতে পারলেন হযরত উমর (রা.)-এর বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন মদিনার সাহাবীগণ তাঁর চারপাশে সমবেত হন। এই অন্তিম মুহূর্তে তিনি কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত উমর (রা.)-এর সবচেয়ে বড় আকুলতা ছিল তিনি যেন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং পরম বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশে দাফন হতে পারেন। তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন, *"*উম্মুল মুমিনীন আয়েশার কাছে যাও। বলবে না যে 'আমিরুল মুমিনীন' পাঠিয়েছেন, কারণ আজ আমি আর মুমিনদের আমির নই। বলবে, উমর আপনার কাছে অনুমতি চায় যেন তাকে তাঁর দুই বন্ধুর পাশে দাফন করা হয়।"* হযরত আয়েশা (রা.) তখন কেঁদে বলেন, *"*জায়গাটি আমি আমার নিজের জন্য রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আমি ওমরের ইচ্ছাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিলাম।"* এই সংবাদ শুনে উমর (রা.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এছাড়া তিনি তাঁর পরিবারকে নির্দেশ দেন যেন তাঁর ব্যক্তিগত সমস্ত ঋণ বায়তুল মাল বা নিজের পারিবারিক সম্পত্তি বিক্রি করে দ্রুত পরিশোধ করে দেওয়া হয়। ২৬ শে জিলহজ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর, *১লা মহররম, ২৪ হিজরীতে (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)* ইসলামের এই মহান খলীফা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জানাজার সালাত ও দাফন প্রক্রিয়া

হযরত উমর (রা.)-এর ওফাতের পর মদিনায় এক শোকার্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তাঁর গোসল ও কাফনের প্রক্রিয়া সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। হযরত উমর (রা.) মৃত্যুর পূর্বেই নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জানাজার সালাতে কে ইমামতি করবেন। শুরা কমিটির সদস্যরা যাতে খিলাফতের নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকার মাঝেও কোনো দ্বন্দ্বে না জড়ান, সেজন্য তিনি একদম নিরপেক্ষ একজন সাহাবী *হযরত সুহাইব রূমী (রা.)*-কে জানাজার ইমামতির দায়িত্ব দিয়ে যান। মদিনার মসজিদে নববীতে তাঁর জানাজার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শুরা কমিটির সদস্যবৃন্দ *(হযরত আলী, উসমান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ প্রমুখ),* আনসার, মুহাজির এবং মদিনার সাধারণ মুসলমানরা অত্যন্ত ভারী হৃদয়ে অংশ নেন।জানাজা শেষ হওয়ার পর হযরত উমর (রা.)-এর মরদেহ দাফনের জন্য নবীজি (সা.)-এর রওজা মোবারকের (যা তৎকালীন হযরত আয়েশা রা. এর হুজরা বা ঘর ছিল) দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।হযরত উমর (রা.)-এর তাকওয়া ও বিনয় এত বেশি ছিল যে, তিনি মৃত্যুর আগেও পুত্র আবদুল্লাহকে অসিয়ত করেছিলেন, *"আমার মরদেহ যখন আয়েশার ঘরের দরজায় নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তোমরা সেখানে দাফনের জন্য পুনরায় অনুমতি চাইবে। যদি তিনি সানন্দে অনুমতি দেন, তবেই আমাকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আর যদি তিনি কোনো কারণে ইতস্তত করেন, তবে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থান (জান্নাতুল বাকি)-তে দাফন করবে।"* ঘরের দরজায় পৌঁছে আবার অনুমতি চাওয়া হলে হযরত আয়েশা (রা.) কাঁদলেন এবং ভেতরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। এরপর অত্যন্ত সম্মানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঠিক পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। কবরের বিন্যাস অনুযায়ী, প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.), তাঁর সামান্য পেছনে হযরত আবু বকর (রা.) এবং তাঁর ঠিক পেছনে (হযরত আবু বকরের কাঁধ বরাবর) হযরত উমর (রা.)-এর কবর শায়িত রয়েছে।হযরত

উমর (রা.)-এর দাফনের মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের একটি স্বর্ণালী এবং ইনসাফপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

এক নজরে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে ইসলামের প্রধান উন্নতিসমূহ

* **সাম্রাজ্য বিস্তার:** রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সিরিয়া, মিসর, পারস্য ও জেরুজালেম বিজয় করা হয়।
* **প্রশাসনিক সংস্কার:** বিশাল সাম্রাজ্যকে প্রদেশে বিভক্ত করে স্বাধীন বিচার বিভাগ ও উপদেষ্টা পরিষদ (শূরা) গঠন করা হয়।
* **বায়তুল মালের আধুনিকায়ন:** রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে আয়-ব্যয়ের হিসাবের জন্য 'দীওয়ান' ব্যবস্থা চালু করা হয়।
* **জনকল্যাণমূলক ভাতা:** শিশু, বৃদ্ধ, বিধবা ও দুস্থ নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।
* **হিজরি সন প্রবর্তন:** ইসলামের নিজস্ব ঐতিহাসিক ক্যালেন্ডার হিসেবে 'হিজরি সন' গণনা শুরু করা হয়।
* **পেশাদার সেনাবাহিনী:** মুসলিম বাহিনীকে সুসংগঠিত করে কুফা ও বসরার মতো স্থানে স্থায়ী সেনানিবাস গড়ে তোলা হয়।
* **পুলিশ ও টহল ব্যবস্থা:** অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় পুলিশ বাহিনী গঠন এবং রাতে খলিফার নিজস্ব টহল ব্যবস্থা চালু হয়।
* **তারাবিহের জামাত:** রমজান মাসে তারাবিহ নামাজ সুশৃঙ্খলভাবে এক ইমামের পেছনে জামাতে পড়ার নিয়ম করা হয়।
* **অবকাঠামো ও কৃষি উন্নয়ন:** সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন নতুন খাল খনন এবং যোগাযোগের জন্য ডাক ব্যবস্থা চালু করা হয়।

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল থেকে শিক্ষণীয়

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাসন আমল (১৩-২৩ হিজরি / ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ এবং সুশাসিত সময়কাল হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর ১০ বছরের শাসন ব্যবস্থা থেকে সমকালীন বিশ্বের যেকোনো নেতা, প্রশাসক বা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় নিচে আলোচনা করা হলো:
১. আইনের শাসন এবং সবার জন্য সমান বিচারঃ হযরত উমর (রা.) এমন একটি বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যেখানে খলিফা থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক, এমনকি অমুসলিম প্রজারাও আইনের চোখে সমান ছিলেন। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। নিজের ছেলে অপরাধ করলেও তিনি সাধারণ মানুষের মতোই শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। গভর্নরদের ভুলত্রুটির জন্যও তিনি কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেন।
২. কঠোর জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাঃ তিনি সব প্রাদেশিক গভর্নর ও সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব রাখতেন। দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাদের সম্পদের তালিকা করা হতো এবং দায়িত্ব ছাড়ার সময় অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া গেলে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে (বাইতুল মাল) বাজেয়াপ্ত করা হতো।দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৩. জনকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তাঃ বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সুসংগঠিত 'কল্যাণ রাষ্ট্র' বা Welfare State-এর ধারণা হযরত উমর (রা.)-এর হাত ধরেই পূর্ণতা পায়। তিনি প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে নেন। বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসহায় এবং স্তন্যপায়ী শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল: "*ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুরও না খেয়ে মারা যায়, তবে তার জন্যও উমর কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।*"

৪. সুদূরপ্রসারী প্রশাসনিক সংস্কারঃরাষ্ট্রের আয়তন বিশাল বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শাসন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন, যা আধুনিক উন্নত শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করেন, আলাদা বিচার বিভাগ (Judiciary) গঠন করেন, পুলিশ বিভাগ, সেনাবাহিনী, এবং রাজস্ব বোর্ড (দিওয়ান) প্রতিষ্ঠা করেন। হিজরি সন গণনাও তাঁর দূরদর্শিতার অন্যতম ফসল।

৫. অসাধারণ আত্মত্যাগ ও সাদাসিধে জীবনযাপনঃবিশাল এক সাম্রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাঁর পোশাকে তালি লাগানো থাকত, মাটির ঘরে ঘুমাতেন এবং বাইতুল মাল থেকে কেবল বেঁচে থাকার ন্যূনতম ভাতা নিতেন। ভোগবিলাস পরিহার করে জনগণের কাতারে এসে দাঁড়ানোই একজন প্রকৃত নেতার আদর্শ। ভোগ নয়, ত্যাগেই নেতার আসল মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

৬. বাকস্বাধীনতা ও গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানানোঃ হযরত উমর (রা.)-এর দরবারে সাধারণ মানুষও তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরাসরি প্রশ্ন তুলতে পারত। একবার এক সাধারণ নারী মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়ে খলিফার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করলে, উমর (রা.) নিজের ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন, "*উমর ভুল করেছে, আর নারীটি সঠিক বলেছে।*"
একজন সফল শাসকের অহংকারমুক্ত হওয়া উচিত এবং জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা ও বাকস্বাধীনতাকে সম্মান জানানো উচিত।

৭. মেধা ও যোগ্যতার মূল্যায়নঃ তিনি বংশমর্যাদা বা স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে কেবল মেধা, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ দিতেন। অযোগ্য বা দুর্নীতিবাজ হলে নিজের আত্মীয়দেরও তিনি ছাড় দিতেন না। স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব রুখে দিয়ে নীতি অনুসরণ করাই প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় সাফল্যের চাবিকাঠি।

হযরত উমর (রা.)-এর শাসন আমল আমাদের শেখায় যে, শাসন ক্ষমতা কোনো ভোগের বস্তু নয়, বরং এটি একটি বিশাল আমানত ও দায়িত্ব। তাঁর এই নীতিগুলো বর্তমান যুগের শাসন ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের সংকটে একটি আদর্শ গাইডলাইন হিসেবে কাজ করতে পারে।

উমর (রা.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব কেবল সাম্রাজ্যের বিস্তারে নয়, বরং একটি আদর্শ, কল্যাণকামী ও সুশাসিত রাষ্ট্রের বাস্তব রূপরেখা প্রণয়নে নিহিত। তাঁর দশ বছরের শাসনামল ছিল ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ, যা মানবজাতির ইতিহাসে ন্যায়বিচার, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং যুগান্তকারী প্রশাসনিক সংস্কারের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। উমর (রা.)-এর খিলাফতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর কঠোর ও আপসহীন ন্যায়বিচার, যেখানে খলিফা নিজে এবং সাধারণ নাগরিক আইনের চোখে সম্পূর্ণ সমান ছিলেন। তাঁর প্রাজ্ঞ ও বীরত্বপূর্ণ খিলাফতেই মদিনার একটি ছোট আঞ্চলিক রাষ্ট্র অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রোমান ও পারস্যের মতো তৎকালীন বিশ্বের দুটি বিশাল পরাশক্তিকে পরাস্ত করে এক বিশাল বিশ্বসাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তবে তিনি কেবল ভূখণ্ডই জয় করেননি, বরং বিজিত অঞ্চলের মানুষের

মন জয় করেছিলেন তাঁর উদার ও সহনশীল নীতি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে, যার প্রমাণ মেলে জেরুজালেম বিজয়ের পর সেখানকার অমুসলিমদের দেওয়া ঐতিহাসিক নিরাপত্তা চুক্তিতে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি যে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেছিলেন, তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আজও বিস্মিত করে; তিনি একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমগ্র খিলাফতকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন, বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করেন এবং 'বাইতুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল কালজয়ী, কারণ তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিশু, বৃদ্ধ ও দুস্থদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা চালু করেছিলেন এবং রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ নিতেন। হিজরি সনের প্রবর্তন, নিয়মিত আদমশুমারি, যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং কৃষিকাজের প্রসারে খাল খননসহ অসংখ্য জনকল্যাণমূলক কাজের সূচনা তাঁর খিলাফতকালেই হয়েছিল। মজলিশ-উশ-শূরা বা পরামর্শ সভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করে তিনি ইসলামি গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিকে মজবুত করেছিলেন। সংক্ষেপে, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত ছিল আধ্যাত্মিকতা, কঠোর নৈতিকতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতার এক অপূর্ব সমন্বয়, যা পরবর্তী যুগের সমস্ত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের জন্য সুশাসনের এক শাশ্বত ও কালজয়ী আদর্শ মডেল হিসেবে আজও পথ দেখাচ্ছে।

তৃতীয় খলিফা নির্বাচন [হযরত উসমান (রা.)]

ইসলামের ইতিহাসে তৃতীয় খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত, নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ২৪ হিজরিতে (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) পারস্যের এক গোলাম আবু লুলু ফিরোজের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তিনি সরাসরি কাউকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে যাননি।তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি চমৎকার গণতান্ত্রিক ও পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন, যা **"মজলিস-উশ-শূরা"** বা খলিফা নির্বাচন কমিটি নামে পরিচিত।যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.)-এর দাফন সম্পন্ন হওয়ার পরপরই কমিটির সদস্যরা হযরত আয়েশা (রা.) বা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.)-এর ঘরে আলোচনায় বসেন। শুরুতে প্রত্যেকেই যোগ্য হওয়ায় কিছুটা অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল।

তখন *হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)* একটি ঐতিহাসিক ত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। তিনি বলেন- *"আমি নিজেকে এই খিলাফতের দৌড় থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। তবে শর্ত হলো, আমি আপনাদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করার দায়িত্ব নেব এবং এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আপনাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে।"* সবাই এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হলেন। ফলে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) প্রধান মধ্যস্থতাকারী এবং নির্বাচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বাকি পাঁচজন প্রার্থীর সাথে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন।

* হযরত যুবায়ের (রা.) তাঁর ভোট হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে ছেড়ে দেন।
* হযরত সা'দ (রা.) তাঁর সমর্থন হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষে দেন।
* (হযরত তালহা রা. মদিনায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর ভোটও হিসাবে রাখা হচ্ছিল)

এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত দুইজনের মধ্যে চলে আসে: *হযরত আলী (রা.)* এবং *হযরত উসমান (রা.)* এরপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কেবল কমিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি।

ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল সম্ভবত প্রথম **বিস্তৃত জনমত জরিপ**। তিনি টানা দুদিন ও দুরাত মদিনার সাধারণ মানুষ, মদিনায় আসা কাফেলার সর্দার, নারী, তরুণ, এবং হজের সফর থেকে ফিরে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কথা বলেন। তিনি জানতে চান যে উসমান ও আলীর মধ্যে কাকে তারা বেশি পছন্দ করেন।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও বায়াত বা আনুগত্যের শপথ

তিন দিনের সময়সীমা যখন শেষ পর্যায়ে, তখন ২৪ হিজরির মুহাররম মাসের শেষ রাতে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তিনি দেখতে পান যে, মদিনার সিংহভাগ মানুষের ঝোঁক হযরত উসমান (রা.)-এর দিকে।পরদিন সকালে ফজরের নামাজের পর মদিনার মসজিদে নববীতে সমস্ত মুসলিম সমবেত হন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রথমে হযরত আলী (রা.)-কে ডাকেন। তিনি আলীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেন- *"আপনি কি আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাত এবং প্রথম দুই খলিফার (আবু বকর ও উমর) নীতি অনুসরণ করে শাসন পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?"* হযরত আলী (রা.) উত্তর দেন- *"আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাত পুরোপুরি মেনে চলব, তবে বাকি বিষয়ে আমি আমার সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সাধ্যানুযায়ী ইজতিহাদ (বিবেচনা) করব।"*এরপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে একই প্রশ্ন করেন। হযরত উসমান (রা.) কোনো দ্বিধা ছাড়াই দৃঢ়ভাবে বলেন-*"হ্যাঁ, আমি আল্লাহর কিতাব, রাসুলের সুন্নাত এবং প্রথম দুই খলিফার আদর্শ সম্পূর্ণ অনুসরণ করে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"*এই উত্তর শোনার পর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, *"হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন, আমি আমার কাঁধের দায়িত্ব উসমানের কাঁধে অর্পণ করলাম।"* এরপর তিনি সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে খলিফা হিসেবে অনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) নেন।

বায়াত-ই-খাস :তীব্র আলোচনা, পরামর্শ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) কর্তৃক মদীনার সাধারণ মানুষ, নারী ও হজযাত্রীদের মতামত জরিপ করার পর, তিনি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছান। হিজরি ২৩ সনের জিলহজ মাসের শেষ দিকে (অথবা ২৪ হিজরির মহররমের শুরুতে) মদীনার মসজিদে নববীতে একটি বিশেষ সভা বসে।সেখানে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) প্রথমে হযরত উসমান (রা.)-এর হাত ধরে আল্লাহর কিতাব, রাসুল (সা.)-এর সুন্নাত এবং প্রথম দুই খলিফার নীতি অনুসরণের শর্তে প্রথম বায়াত গ্রহণ করেন। এরপর মজলিসে শূরার বাকি সদস্যরা (যেমন হযরত আলী রা. সহ অন্যান্যরা) এবং মদীনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবিগণ উসমান (রা.)-এর হাতে বায়াত হন।এই সীমিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বায়াতকেই বায়াত-ই-খাস বলা হয়। এটি ছিল খেলাফতের আনুষ্ঠানিক ও আইনি অনুমোদন।

বায়াত-ই-আম (সাধারণ বা গণবায়াত): মসজিদে নববীতে বিশিষ্ট সাহাবিদের (বায়াত-ই-খাস) আনুগত্যের পরপরই সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত বায়াত শুরু হয়। মদীনার সর্বস্তরের মানুষ, আনসার ও মুহাজিরগণ দলে দলে এসে হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ নেন।মদীনার বাইরে দূর-দূরান্তের প্রদেশ ও বিজিত অঞ্চলের মানুষের জন্য এই বায়াত নিশ্চিত করতে খলিফার দূত ও প্রাদেশিক গভর্নরদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়। কুফা, বসরা, সিরিয়া, মিশরসহ তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ গভর্নরের মাধ্যমে বা সরাসরি উসমান (রা.)-এর খেলাফতকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে বায়াত সম্পন্ন করে। হযরত উসমান (রা.)-এর এই দুই স্তরের বায়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামে নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। প্রথমে যোগ্যতম ব্যক্তিরা পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন

করেন (বায়াত-ই-খাস) এবং পরবর্তীতে জনগণের পূর্ণ সম্মতি ও সমর্থনের (বায়াত-ই-আম) মাধ্যমেই সেই শাসনব্যবস্থা বৈধতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

খলিফা হিসেবে প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ

২৪ হিজরীর মহররম মাসের শেষ দিকে (অথবা সফর মাসের শুরুতে), অর্থাৎ খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর উসমান (রাঃ) যখন আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ সম্পন্ন করেন। হযরত উসমান (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মদীনার *মসজিদে নববীতে* (মিম্বরের ওপর) ঐতিহাসিক এক ভাষণ দিয়েছিলেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম নীতি-নির্ধারণী ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির মূল বক্তব্য হলো: হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর ভাষণের শুরুতেই মানুষকে এই নশ্বর পৃথিবীর মোহ থেকে দূরে থাকার এবং আখিরাতের জন্য সম্বল জমানোর তাগিদ দেন। তিনি বলেন- *"হে লোকসকল! তোমরা একটি ক্ষণস্থায়ী নিবাসে আছো এবং তোমাদের জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকুর মধ্যেই অবস্থান করছ। সুতরাং তোমরা মৃত্যুর আগমন-মুহূর্তের আগে যতটুকু সম্ভব ভালো কাজের মাধ্যমে কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাও। জেনে রেখো, এই দুনিয়া ধোঁকা ও প্রতারণা দিয়ে ঘেরা।"* তিনি উপস্থিত সবাইকে পূর্ববর্তী উম্মত এবং ক্ষমতাশালীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান- *"কোথায় তারা, যারা এই দুনিয়াকে আবাদ করেছিল? যারা দীর্ঘকাল এখানে ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল? দুনিয়া কি তাদের চিরকাল বাঁচিয়ে রেখেছে? আল্লাহ এই দুনিয়াকে যেভাবে ছুড়ে ফেলেছেন, তোমরাও একে সেভাবে বর্জন করো এবং আখিরাতের সন্ধান করো।"* শাসনভার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তিনি নিজের কোনো নতুন নিয়ম চাপিয়ে দেবেন না। বরং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং প্রথম দুই খলীফা (হযরত আবু বকর রাঃ ও হযরত উমর রাঃ)-এর দেখানো পথ হুবহু অনুসরণ করবেন। তিনি ঘোষণা করেন- *"জেনে রেখো, আমি একজন অনুসরণকারী (মুত্তাবি), নতুন কোনো পথের আবিষ্কারক (মুবতাদি) নই। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহর পর তোমাদের ওপর আমার তিনটি প্রতিজ্ঞা রইল:*

** আমার পূর্ববর্তী দুই খলীফা (আবু বকর ও উমর) তোমাদের জন্য যে আদর্শ ও নিয়ম রেখে গেছেন, আমি তা কঠোরভাবে মেনে চলব*

** সৎ ও কল্যাণকর কাজে সমাজে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করব।*

** তোমাদের ওপর কোনো জুলুম বা অন্যায় হতে দেব না।"*

তিনি প্রজাদের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো অপরাধ বা শরীয়তবিরোধী কাজে লিপ্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

ভাষণের তাৎপর্য: হযরত উসমান (রাঃ)-এর এই প্রথম ভাষণটি ছিল অত্যন্ত বিনম্র, আধ্যাত্মিক এবং দূরদর্শী। হযরত উমর (রাঃ)-এর কঠোর ও সুশৃঙ্খল শাসনের পর, হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদে নববীতে সমবেত জনগণকে আশ্বস্ত করেন যে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার ও ইসলামী শরীয়তের শাসন অপরিবর্তিত থাকবে, তবে তা পরিচালিত হবে অত্যন্ত উদারতা ও কোমলতার সাথে।

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

হযরত ওসমান (রা.)-এর দীর্ঘ ১২ বছরের খিলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর খিলাফতের প্রথম ছয় বছর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং বিজয়ে ভরপুর থাকলেও, শেষ ছয় বছরে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন উমাইয়া

বংশের সন্তান। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে যখন তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তাঁর আত্মীয় বা উমাইয়া বংশের যোগ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (যেমন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া, মিশরের আবদুল্লাহ ইবনে সাদ, মদিনার উপদেষ্টা মারওয়ান) নিয়োগ দেন, তখন প্রাচীন হাশেমী-উমাইয়া দ্বন্দ্বে নতুন করে ঘি পড়ে। সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য গোত্রের (বিশেষ করে হাশেমীদের সমর্থক এবং মদিনার আনসারদের একাংশ) মনে হতে থাকে যে, আরবের নেতৃত্ব আবার উমাইয়াদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। এই ধারণাকে পুঁজি করে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার মতো ষড়যন্ত্রকারীরা উমাইয়া বনাম হাশেমী বা কুরাইশদের ভেতরের চাপা ক্ষোভকে উস্কে দিতে সক্ষম। হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।এই দ্রুত বিস্তারের ফলে বহু নতুন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসে, যারা মদিনার শাসন ব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি অভ্যস্ত ছিল না। নতুন বিজিত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ইসলাম ও আরবের রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে গভীরতা কম থাকায় তারা সহজেই উস্কানিমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত হতো। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বড় ধরনের অভ্যন্তরীণ ফিতনা বা উপদলীয় কোন্দল তৈরির পেছনে *আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা* নামক এক ইয়াহুদি (যিনি পরবর্তীতে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) অন্যতম মূল ভূমিকা পালন করেছিল।সে মিসর, বসরা ও কুফায় ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে খলিফার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালায়।সে দাবি করতে শুরু করে যে, হযরত আলী (রা.)-ই খিলাফতের প্রকৃত হকদার এবং ওসমান (রা.) তা জোরপূর্বক দখল করেছেন। এই অপপ্রচার খেলাফতের স্থিতিশীলতা পুরোপুরি নষ্ট করে দেয়। বিজিত অঞ্চলের রাজস্ব এবং গনিমত (যুদ্ধের মাল) বণ্টন নিয়ে কিছু প্রদেশের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।বিশেষ করে *কুফা, বসরা এবং মিসরের* সৈনিক ও সাধারণ জনগণ মনে করত মদিনার কেন্দ্রীয় প্রশাসন তাদের ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে। এছাড়াও হযরত ওসমান (রা.) প্রামাণ্য আল-কুরআন সংকলন করে তার অনুলিপি বিভিন্ন প্রদেশে পাঠান এবং আঞ্চলিক বিকৃত অনুলিপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। এটি দ্বীনের স্বার্থে অত্যন্ত মহান একটি কাজ হলেও, কুফা ও বসরার কিছু বিদ্রোহী এটিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে খলিফার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। খিলাফতের শেষ দিকে নতুন অঞ্চল বিজয়ের গতি কিছুটা কমে আসে। ফলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গণিমতের মালের প্রবাহ কমে যায়। সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ, যারা মূলত এই আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তারা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। ইরাক ও মিশরের নতুন বিজিত অঞ্চলের যাযাবর বা বেদুঈন যোদ্ধারা (যারা 'কুররা' বা ক্বারী নামেও পরিচিত ছিল) মদিনার কেন্দ্রীয় কুরাইশ নেতৃত্বের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্থানীয়ভাবে নিজেদের অধিকার দাবি করতে শুরু করে।হযরত উসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোর (যেমন: কুফা, বসরা, মিশর) গভর্নর পদে তাঁর নিজস্ব বংশের (বনু উমাইয়া) লোকদের নিয়োগ দিচ্ছিলেন। বাস্তবতা হচ্ছে তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতেই অনেককে নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং আগের খলিফাদের যুগের অনেক গভর্নরকে বহালও রেখেছিলেন। কিন্তু মদিনার প্রবীণ সাহাবীদের বাদ দিয়ে উমাইয়া বংশের তরুণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোয় সাধারণ জনগণ ও অন্যান্য কুরাইশ বংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে তাঁর উপদেষ্টা *মারওয়ান ইবনুল হাকামের* ভূমিকা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।মূলত দ্রুত ভৌগোলিক বিস্তার, নতুন মুসলিমদের মাঝে গোত্রীয় মানসিকতার পুনরুত্থান, আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং খলিফার সরলতা ও কোমলতার সুযোগ নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই প্রতিবন্ধকতাগুলো সৃষ্টি করেছিল। এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ৩৫

হিজরিতে এক নির্মম ও দুঃখজনক ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে শহীদ করা হয়, যা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে প্রথম বড় ফিতনার (আল-ফিতনাতুল কুবরা) জন্ম দেয়।

হযরত উসমান (রা.) এর শাসনামলে প্রধান কাজসমূহ

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর ১২ বছরের (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) শাসনকাল ছিল মুসলিম ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর খেলাফতকালে ইসলামের প্রসার যেমন ঘটেছিল, তেমনই কিছু যুগান্তকারী প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত উসমান (রাঃ)-এর সবচেয়ে মহান ও চিরস্মরণীয় কীর্তি হলো পবিত্র কুরআনের সংকলন ও একক উপভাষায় (কুরাইশ রীতিতে) এর অনুলিপি তৈরি করা।ইসলামী সাম্রাজ্য আজারবাইজান ও আরমেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলের নতুন মুসলিমদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণ বা উপভাষা (Dialect) নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়।তাই বিশৃঙ্খলা এড়াতে তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সময়ে সংকলিত মূল কপিটি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। এরপর জায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে কুরাইশ উপভাষার ভিত্তিতে হুবহু কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করান। এই প্রমিত কপিগুলো সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বাকি আঞ্চলিক কপিগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোনো বিভেদ না থাকে। এই মহান কাজের জন্য তাঁকে *'জামেউল কুরআন'* (কুরআন একত্রকারী) বলা হয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলেই মুসলিম ইতিহাসে প্রথম নৌবাহিনী (Navy) গঠিত হয়। সিরিয়ার তৎকালীন গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এবং মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবনে সাদ-এর অনুরোধ ও পরিকল্পনায় এই নৌবাহিনী তৈরি করা হয়। এই নৌবাহিনীর সহায়তায় ভূমধ্যসাগরে মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইন (রোমান) নৌবাহিনীকে *'জাতুস সাওয়ারি'* (Battle of the Masts) নামক ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধে মুসলিমরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।তাঁর সময়ে খিলাফতের সীমানা পূর্ব ও পশ্চিমে অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

* **পূর্ব দিকে:** পারস্যের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ বিজিত হয়। মুসলিম বাহিনী খোরাসান, সিজিস্তান, মার্ভ এবং কাবুলের কিছু অংশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমনকি বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত এলাকা (মাকরান) পর্যন্ত অভিযান চালানো হয়।
* **পশ্চিম ও উত্তর দিকে:** উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, তিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়ার কিছু অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নৌবাহিনীর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ *সাইপ্রাস ও রোডস* জয় করা হয়। এছাড়া আরমেনিয়া ও আজারবাইজান অঞ্চলে খিলাফতের নিয়ন্ত্রণ মজবুত হয়।

মুসলিম উম্মাহর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মদিনার 'মসজেদে নববী'তে স্থানসংকুলান হচ্ছিল না। হযরত উসমান (রাঃ) ব্যক্তিগত তহবিল ও সরকারি খরচে মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। তিনি কাঁচা ইটের বদলে নকশাকৃত পাথর এবং চুন-সুরকি দিয়ে মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং এর স্তম্ভগুলোকে লোহার রড ও সিসা দিয়ে মজবুত করেন। এছাড়া মক্কার মসজিদে হারামেরও (কাবা শরীফ) উন্নয়ন করেন। তিনি জনগণের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে কূপ খনন করেন এবং কৃষিকাজের সুবিধার্থে বেশ কিছু খাল ও বাঁধ নির্মাণ করেন। মদিনাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি একটি বিশেষ বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে উর্বর ভূমিগুলো থেকে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায় এবং বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় তহবিল) অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়। তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি করেন এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময়ে মদিনার জনসংখ্যা এবং পরিধি অনেক

বেড়ে যায়। ফলে দূর-দূরান্তের মানুষের পক্ষে একটিমাত্র আজান শুনে সময়মতো জুমার নামাজে শামিল হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল।এই সমস্যার সমাধানে তিনি জুমার মূল আজানের কিছু সময় আগে মদিনার বাজার এলাকায় (*'জাউরা'* নামক স্থানে) আরও একটি আজানের ব্যবস্থা করেন, যাতে মানুষ ব্যবসার কাজ গুটিয়ে মসজিদের দিকে রওনা হতে পারে।তাঁর চালু করা এই নিয়মটি আজও মক্কা-মদীনা সহ সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজে সুন্নাহ হিসেবে অনুসৃত হয়ে আসছে। যদিও ইসলামী খেলাফতের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ কয়েন ব্যবস্থা হযরত আবদুল মালিকের আমলে চূড়ান্ত রূপ পায়, তবে হযরত উসমান (রাঃ)-এর সময়েই প্রথম পারস্যের (সাসানীয়) মুদ্রার নকশা আংশিক পরিবর্তন করে তাতে ইসলামী পরিচয় যুক্ত করা হয়। তিনি প্রচলিত পারস্য মুদ্রার ওপর আরবি হরফে *"বিসমিল্লাহ"* (আল্লাহর নামে) খোদাই করে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলন করেন। এটি ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থার দিকে প্রথম বড় পদক্ষেপ। ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সামরিক ও জিহাদের কাজে ব্যবহৃত ঘোড়া এবং উটের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।হযরত উসমান (রাঃ) মদিনার অদূরে **'***রাবাদা'* নামক স্থানে রাষ্ট্রীয় চারণভূমি (Al-Hima) ব্যাপক প্রসারিত করেন।এখানে হাজার হাজার সরকারি উট ও ঘোড়ার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজননের জন্য বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যা রাষ্ট্রীয় সামরিক শক্তিকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে সাহায্য করত। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর সময় পর্যন্ত বিচারিক কাজ বা আদালতের জন্য আলাদা কোনো ভবন ছিল না। সাধারণত মসজিদে নববীতেই বিচার কাজ সম্পন্ন হতো।হযরত উসমান (রাঃ) প্রথম বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি *স্বতন্ত্র আদালত ভবন বা বিচারালয়* প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে বিচারক (কাজী) এবং বিচারপ্রার্থীরা সুনির্দিষ্ট স্থানে বসে কাজ পরিচালনা করতে পারেন।শুধু বাইজান্টাইনদের পরাজিত করাই নয়, তাঁর সময়েই মুসলিমরা প্রথম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার করে। ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁর নির্দেশেই চীনের তৎকালীন রাজদরবারে (ট্যাং রাজবংশ) প্রথম আনুষ্ঠানিক মুসলিম কূটনৈতিক দল পাঠানো হয়েছিল, যা দূরপ্রাচ্যে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর ভিত্তি স্থাপন করে।হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম ৬ বছর ছিল একচ্ছত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিজয়ের কাল। শেষের বছরগুলোতে কিছু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট তৈরি হলেও তাঁর গৃহীত এই প্রশাসনিক ও ধর্মীয় সংস্কারগুলো পরবর্তী ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর জন্য স্থায়ী কাঠামো হিসেবে কাজ করেছে।

বিস্তারিত কিছু ঘটনা

পবিত্র কুরআনের একক প্রমিত কপি তৈরি ও বিতরণ (ঐতিহাসিক কাজ)

ইসলামের ইতিহাসে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং যুগান্তকারী অবদান হলো পবিত্র কুরআনের প্রাতিষ্ঠানিক সংকলন এবং এর একটি আদর্শ বা প্রমিত সংস্করণ (Standardized Version) তৈরি করা। তাঁর এই মহান কাজের জন্য তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বা 'কুরআন একত্রকারী' বলা হয়।_রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কুরআন বিভিন্ন সাহাবীর স্মৃতিতে এবং আংশিকভাবে চামড়া, হাড় বা পাতায় লিখিত ছিল। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজ সাহাবী শহীদ হলে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কুরআনকে একটি পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ আকারে একত্রিত করা হয়। তবে হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে (২৫ হিজরি বা তার কাছাকাছি সময়ে) ইসলামী সাম্রাজ্য যখন আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। আরবের বিভিন্ন গোত্রের উপভাষা বা উচ্চারণভঙ্গির (ক্বিরাআত) পার্থক্যের কারণে অনারব ও নতুন মুসলিমদের মধ্যে

কুরআন পাঠ নিয়ে তীব্র মতবিরোধ ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। একেক অঞ্চলের মানুষ একেক ক্বিরাআতে পড়ে দাবি করতে লাগল যে তাদের পাঠই শ্রেষ্ঠ।বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) আজারবাইজান যুদ্ধ থেকে ফিরে খলিফা উসমান (রা.)-কে এই আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির কথা জানান এবং বলেন- *"হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যেভাবে নিজেদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছে, এই উম্মত সেই পর্যায়ে যাওয়ার আগেই আপনি এদের রক্ষা করুন।"* পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে হযরত উসমান (রা.) সিনিয়র সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন এবং সবাইকে একটি আদর্শ পাঠের ওপর একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই মহৎ কাজের জন্য তিনি ৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ বোর্ড বা কমিটি গঠন করেন:

- *হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) (কমিটির প্রধান এবং প্রধান ওহী লেখক)*
- *হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)*
- *হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.)*
- *হযরত আবদুর রহমান ইবনুল হারিস (রা.)*

হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে সংকলিত মূল ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিটি তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উসমান (রা.) সেটি সাময়িকভাবে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেন। খলিফা কমিটিকে নির্দেশ দেন যে, যদি কোনো শব্দের উচ্চারণ বা লিখনশৈলী নিয়ে মদীনার সাহাবী (যায়েদ রা.) এবং মক্কার কুরাইশ সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়, তবে তা যেন লেখা হয়। কারণ কুরআন মূলত কুরাইশদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এই বোর্ড অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মূল পাণ্ডুলিপি দেখে আরও কয়েকটি হুবহু প্রতিলিপি (মতান্তরে ৫ থেকে ৭টি কপি) তৈরি করেন। এই সংস্করণটিকেই বলা হয় *'মুসহাফে উসমানী'*।অনুলিপিগুলো তৈরি হওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) মূল পাণ্ডুলিপিটি সসম্মানে হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠান। এরপর তিনি তৈরি করা নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কপিগুলো খিলাফতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলোতে (যেমন: মক্কা, কুফা, বসরা, সিরিয়া ও ইয়েমেন) পাঠিয়ে দেন এবং মদীনাতেও একটি কপি রাখেন। ভবিষ্যতে যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তি বা বিকৃতি না ঘটে, সেজন্য তিনি নির্দেশ দেন যে, এই আদর্শ কপির বাইরে মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা কুরআনের অন্যান্য অসম্পূর্ণ বা ভিন্ন উচ্চারণে লেখা আংশিক কপিগুলো যেন ধ্বংস (পুড়িয়ে বা ধুয়ে) ফেলা হয়। সব সাহাবী সর্বসম্মতভাবে খলিফার এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।হযরত উসমান (রা.)-এর এই দূরদর্শী পদক্ষেপের ফলেই আজ চৌদ্দশত বছর ধরে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে পবিত্র কুরআনের হুবহু এক এবং অভিন্ন রূপ অক্ষুণ্ন রয়েছে। অক্ষরের বিন্যাস, সূরার ক্রম এবং উচ্চারণের এই প্রমিত রূপটি মুসলিম উম্মাহকে চিরদিনের জন্য বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

জুমার নামাজের দ্বিতীয় আজানের প্রচলন

জুমার নামাজে দুটি আজান দেওয়ার প্রথা ইসলামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুন্নতি সিদ্ধান্ত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং প্রথম দুই খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ও

হযরত উমর (রা.)-এর আমলে জুমার নামাজে একটি মাত্র আজান দেওয়া হতো—যা ইমাম মিম্বরে বসার পর খতিবের সামনে দেওয়া হতো।পরবর্তীতে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে জুমার নামাজের জন্য আরেকটি (প্রথম) আজান প্রবর্তন করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলে (ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতির কারণে) মদীনা মুনাওয়ারার জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শহরের পরিধি বেড়ে যায় এবং তৎকালীন মদীনার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র 'জাওরা' নামক বাজার এলাকা পর্যন্ত জনবসতি ছড়িয়ে পড়ে।মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দুনিয়াবী কাজে এত বেশি ব্যস্ত থাকত যে, ইমাম মিম্বরে বসার পর দেওয়া একমাত্র আজানটি শুনে দূর-দূরান্ত থেকে জুমার নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে পৌঁছানো অনেকের জন্যই কঠিন হয়ে পড়ত। ফলে অনেকেরই জুমার প্রথম রাকাত বা খুতবা ছুটে যেত।জনগণের এই অসুবিধা দূর করতে এবং তারা যাতে সময়মতো জুমার প্রস্তুতি নিয়ে মসজিদে আসতে পারেন, সেজন্য হযরত উসমান (রা.) জুমার মূল আজানের আগে আরেকটি আজানের সিদ্ধান্ত নেন। এই নতুন আজানটি মদীনার বাজারের 'জাওরা' নামক একটি উঁচু বাড়িতে বা স্থানে দাঁড়িয়ে দেওয়া হতো, যাতে পুরো মদীনা শহরের মানুষ তা শুনতে পায়। এই প্রথম আজানটি ছিল মূলত একটি *সতর্কতামূলক সংকেত*, যা শুনে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে গোসল, মেসওয়াক ও উত্তম পোশাক পরিধান করে জুমার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে। হযরত উসমান (রা.) যখন এই নতুন আজান চালু করেন, তখন মদীনাতে হযরত আলী (রা.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-সহ বহু প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউই হযরত উসমান (রা.)-এর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। বরং দ্বীনের কল্যাণ এবং সময়ের প্রয়োজনে সবাই এটিকে সর্বসম্মতভাবে মেনে নেন (যাকে ইসলামের পরিভাষায় 'ইজমা' বলা হয়) । হযরত উসমান (রা.)-এর সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মক্কা-মদীনার হারামাইন শরীফাইনসহ বিশ্বের প্রায় সব মসজিদে জুমার দিনে দুটি আজান দেওয়ার এই নিয়ম চলে আসছে। প্রথম আজান ওয়াক্ত হওয়ার পর দেওয়া হয়, যা শুনে মানুষ জুমার প্রস্তুতি নেয় এবং মসজিদে আসে।দ্বিতীয় আজান ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসার পর তাঁর ঠিক সামনে দেওয়া হয়।

ইসলামী বিধিবিধানের ভিত্তি: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার পথপ্রাপ্ত ও সঠিক পথপ্রদর্শনকারী খলিফাদের (খুলাফায়ে রাশেদীন) সুন্নতকে আঁকড়ে ধরবে।"* (আবু দাউদ) । যেহেতু হযরত উসমান (রা.) খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তে সব সাহাবীর ঐকমত্য ছিল, তাই জুমার দুই আজান দেওয়া সুন্নতেরই অংশ হিসেবে গণ্য হয়।

মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও সংস্কার

মসজিদে নববী (সা.)-এর ইতিহাস, সম্প্রসারণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে **হযরত উসমান (রা.)**-এর অবদান অত্যন্ত অনন্য এবং ঐতিহাসিক। ইসলামের প্রথম দুই খলিফার যুগের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মসজিদে নববীর প্রথম বড় আকারের কাঠামোগত পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ তাঁর আমলেই সম্পন্ন হয়। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর আমলে ইসলামের যে বিজয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে তা আরও বেগবান হয়। দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে মানুষ মদীনায় আসতে শুরু করে। ফলে জুমার

নামাজ এবং সাধারণ ওয়াক্তের নামাজে মসজিদে নববীতে মুসল্লিদের জায়গা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। হযরত উমর (রা.) তাঁর শাসনামলে কিছুটা সম্প্রসারণ করেছিলেন, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তা যথেষ্ট ছিল না। তাই হিজরি ২৯ সনে (কারো মতে ৩০ হিজরি) হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে মসজিদটি বড় করার এবং কাঁচা কাঠামোর পরিবর্তে একটি স্থায়ী মজবুত ভবন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। মসজিদের চারপাশের জায়গা সংকুলান করার জন্য হযরত উসমান (রা.) মসজিদের আশেপাশের জমি ও ঘরবাড়ি *নিজস্ব অর্থায়নে এবং সরকারি তহবিল থেকে* ক্রয় করেন।তিনি মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম—তিন দিকেই সীমানা বৃদ্ধি করেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীদের হুজরা বা ঘরগুলো (যা পূর্ব দিকে ছিল) তিনি অক্ষত রাখেন এবং সেদিকে কোনো পরিবর্তন করেননি।এই সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ১৬০ হাত এবং প্রস্থ ১৩০ হাত। হযরত উসমান (রা.)-এর এই সংস্কার ছিল মসজিদে নববীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কাঠামোগত পরিবর্তন। এর আগে মসজিদটি মূলত খেজুর গাছ, কাঁচা ইট এবং খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি ছিল। তিনি প্রথমবার এতে স্থায়ী ও বিলাসবহুল নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করেন। কাঁচা ইটের পরিবর্তে তিনি খোদাই করা নকশাদার পাথর এবং চুন-সুরকি (জিপসাম) দিয়ে মজবুত দেয়াল নির্মাণ করেন। খেজুর গাছের গুঁড়ির পরিবর্তে পাথর খোদাই করে মজবুত পিলার তৈরি করা হয়। এই পিলারগুলোর ভেতরের অংশকে আরও শক্তিশালী করতে লোহার রড এবং গলানো সিসা ব্যবহার করা হয়েছিল। খেজুর পাতার পরিবর্তে সাগুন কাঠ (Teakwood) দিয়ে মসজিদের ছাদ পাকা ও সুদৃশ্য করা হয়।

হযরত উসমান (রা.)-এর এই সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদে নববীতে দুটি নতুন স্থাপত্যশৈলী যুক্ত হয়। মসজিদটি দক্ষিণ দিকে (কিবলার দিকে) কিছুটা বর্ধিত করায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁড়ানোর মূল জায়গা থেকে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান কিছুটা সামনে এগিয়ে যায়। বর্তমান মসজিদে নববীতে যে স্থানে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব নামাজ পড়ান, সেটিই মূলত হযরত উসমান (রা.)-এর নির্ধারিত স্থান, যা *'মেহরাবে উসমানী'* নামে পরিচিত। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে শহীদ হয়েছিলেন। এই ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকির কথা চিন্তা করে হযরত উসমান (রা.) ইমামের দাঁড়ানোর জায়গার চারপাশে পাথর ও জালের মতো নকশাদার কাঠের একটি বেষ্টনী তৈরি করেন, যা 'মাকসুরা' নামে পরিচিত। এর ফলে ইমাম নিরাপদে নামাজ পড়াতে পারতেন এবং বাইরে থেকে মুসল্লিরাও তাঁকে দেখতে পেতেন। হিজরি ২৯ সনের রবিউল আউয়াল মাসে এই পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৩০ হিজরির মহররম মাসে (প্রায় ১০ মাস পর) তা সমাপ্ত হয়। হযরত উসমান (রা.) নিজেই প্রতিদিন স্বশরীরে নির্মাণস্থলে উপস্থিত থেকে কাজের তদারকি করতেন। শুরুতে কিছু সাহাবী মসজিদের আদি ও সাধারণ রূপ পরিবর্তনের ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করলেও, কাজ শেষ হওয়ার পর এর সৌন্দর্য ও মজবুত কাঠামো দেখে সবাই হযরত উসমান (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আজ মদীনার মসজিদে নববীর যে বিশাল আধুনিক রূপ আমরা দেখি, তার সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল হযরত উসমান (রা.)-এর হাত ধরেই।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা (Judicial System)

ইসলামি শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে তৃতীয় খলিফা **হযরত উসমান (রা.)**-এর খিলাফতকাল (৬৪৪-৬৫৬ খ্রি.) ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পূর্বসূরি হযরত উমর (রা.)-এর প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী বিচারিক ভিত্তিকে বজায় রেখেছিলেন এবং যুগের চাহিদানুযায়ী তাতে বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার

এনেছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর আমলে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার যে নীতি শুরু হয়েছিল, হযরত উসমান (রা.) তা পূর্ণরূপে বজায় রাখেন। তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে যাচাই-বাছাই করে কেবল বিশ্বস্ত, সৎ এবং ইসলামি শরিয়াহ আইনে পারদর্শী ব্যক্তিদের 'কাজি' (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ দিতেন। বিচারকরা যাতে কোনো ধরনের আর্থিক প্রলোভন বা দুর্নীতির শিকার না হন, সেজন্য তিনি বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে তাদের জন্য উচ্চ সম্মানী ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন।হযরত উসমান (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহাসিক অবদান হলো *পৃথক আদালত ভবন প্রতিষ্ঠা।* রাসুলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর আমল পর্যন্ত মদিনায় বিচারকাজের জন্য আলাদা কোনো ভবন ছিল না। সাধারণত মসজিদে নববী, বিচারকদের নিজস্ব ঘর কিংবা জনাকীর্ণ কোনো সাধারণ স্থানেই মামলার ফায়সালা করা হতো।সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হযরত উসমান (রা.) মদিনায় প্রথম *'দারুল কাজা'* (আদালত ভবন) নির্মাণ করেন। এর ফলে মসজিদের পবিত্রতা ও নীরবতা বজায় থাকে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ নিশ্চিত হয়। হযরত উসমান (রা.) আইনের চোখে সবাইকে সমান দেখতেন। খলিফা বা শাসকের আত্মীয় হওয়ার কারণে কেউ কোনো বাড়তি সুবিধা পেত না। কুফার গভর্নর এবং খলিফার আত্মীয় ওয়ালিদ বিন উকবার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে, খলিফা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তাকে বরখাস্ত করেন এবং জনসম্মুখে দোররা মারার (হদ) নির্দেশ কার্যকর করেন। অমুসলিম নাগরিকদের (যিম্মি) অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও তাঁর বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠোর ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি অপরাধের উদ্দেশ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে রায় দিতেন। যেমন— কেউ যদি তীব্র উত্তেজিত বা রাগান্বিত অবস্থায় (হঠাৎ করে) কোনো অপরাধ করে বসত, তবে হযরত উসমান (রা.) সেটিকে *'ভুলে সংঘটিত অপরাধ'* (জিনাইয়াতুল খাতা) হিসেবে গণ্য করতেন। এ ক্ষেত্রে কড়া শাস্তির (কিসাস) পরিবর্তে জরিমানা বা রক্তপণ (দিয়াত) দেওয়ার বিধান দিতেন। হযরত উসমান (রা.) বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মূলত ৪টি প্রধান উৎসের ওপর নির্ভর করতেন:

১. আল-কুরআন

২. সুন্নাহ (রাসুলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ)

৩. পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের (আবু বকর ও উমর রা.) গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নজির

৪. সাহাবিদের সাথে পরামর্শ (শূরা ব্যবস্থা): কোনো জটিল ও নতুন সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সাথে পরামর্শ বা ইজতিহাদের মাধ্যমে আইনি ফায়সালা করতেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনকালের শেষভাগে কিছু রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হলেও তাঁর সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংহত, মানবিক এবং প্রগতিশীল। বিশেষ করে বিচার কার্যের জন্য পৃথক আদালত ভবন বা 'দারুল কাজা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি আধুনিক বিচার ব্যবস্থার এক অনন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন।

উসমান (রা.) এর কিছু ঘটনা

আদালতে সাধারণ নাগরিকের মুখোমুখি খলিফা

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত, যা প্রমাণ করে যে আইনের চোখে খলিফা এবং একজন সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। হযরত উসমান (রা.) খলিফা হওয়ার অনেক আগে থেকেই মদিনার অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বেশ কিছু জমি ও বাগান ছিল। খলিফা থাকার সময় এক সাধারণ নাগরিকের সাথে তাঁর একটি বাগান বা জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়। সেই

সাধারণ ব্যক্তিটি দাবি করেন যে, জমিটির একটি নির্দিষ্ট অংশ তাঁর, পক্ষান্তরে হযরত উসমান (রা.) জানতেন জমিটি তাঁর নিজের। সাধারণ নাগরিকটি খলিফার শাসন বা ক্ষমতার ভয় না করে সরাসরি মদিনার তৎকালীন প্রধান কাজি (বিচারক)-এর আদালতে মামলা ঠুকে দেন। মামলার দিন খলিফা হযরত উসমান (রা.) কোনো দেহরক্ষী বা রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ছাড়াই অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে আদালতে গিয়ে হাজির হন। তিনি পারতেন খলিফার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে মামলাটি খারিজ করতে বা নিজের প্রভাব খাটাতে। কিন্তু তিনি তা করেননি।আদালতে প্রবেশের পর কাজি (বিচারক) খলিফাকে দেখে সম্মান প্রদর্শন করতে চাইলেন এবং বসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বললেন- *"হে কাজি! আজ আমি এখানে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে আসিনি, এসেছি একজন সাধারণ বিবাদী (আসামি) হিসেবে। বিবাদী এবং বাদী (অভিযোগকারী) যেখানে দাঁড়ায়, আমাকেও ঠিক সেখানেই দাঁড়াতে দিন। বিচারের আসনে বসে কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করা ইসলামের নীতি নয়।"* এরপর তিনি সাধারণ সেই নাগরিকটির পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়ান। কাজি অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে দুই পক্ষের বক্তব্য এবং প্রমাণাদি শোনেন। তৎকালীন ইসলামি শরিয়তের নিয়মানুযায়ী, বাদীর কাছে পর্যাপ্ত লিখিত প্রমাণ বা সাক্ষী না থাকায় এবং খলিফার কাছেও জমিটি যে তাঁর নিজের সেটির অকাট্য দলিল তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিত না থাকায়—কাজি পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে সেই সাধারণ নাগরিকের পক্ষেই রায় দিয়ে দেন। অর্থাৎ, খলিফাকে নির্দেশ দেওয়া হয় জমিটি ওই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আদালত নিজের বিপক্ষে রায় দেওয়ায় হযরত উসমান (রা.) বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হননি। বরং তিনি হাসিমুখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং আদালতের রায় মেনে নিয়ে জমিটি তৎক্ষণাৎ সেই নাগরিককে দিয়ে দেন।আদালত থেকে বের হওয়ার সময় খলিফা সেই কাজির (বিচারক) ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে একদম নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

নিজের অর্থে রাষ্ট্রীয় মেহমানদারী ও বায়তুল মাল থেকে ভাতা না নেওয়া

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্যের বিশাল অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ফলে প্রতিদিন বিভিন্ন বিজিত অঞ্চল এবং দূর-দূরান্তের দেশ থেকে বড় বড় কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল, রাষ্ট্রীয় মেহমান এবং অভাবী মানুষ মদিনায় খলিফার কাছে আসতেন।খলিফা থাকা অবস্থায় তিনি নিজের অর্থে রাষ্ট্রীয় মেহমানদারী করান। হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মদিনায় আসা কোনো মেহমান বা অভাবী মানুষ যেন কখনো ক্ষুধার্ত না থাকে। তিনি প্রতিদিন তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল বা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে মদিনার মেহমান, মুসাফির এবং দরিদ্রদের জন্য অত্যন্ত উন্নত ও সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করতেন। সেই দস্তরখানে গোশত, রুটি, ঘি এবং বিভিন্ন উপাদেয় খাবার থাকত। মেহমানদের এত চমৎকার খাবার খাওয়ালেও, খলিফা নিজে যখন খেতে বসতেন, তখন তাঁর খাবার ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তিনি মেহমানদের দস্তরখান থেকে আলাদা হয়ে নিজের ঘরে চলে যেতেন এবং সেখানে অত্যন্ত সাধারণ *সিরকা (ভিনেগার) এবং জয়তুনের তেল দিয়ে শুকনো রুটি* চিবিয়ে খেতেন। একদিন খলিফার এই কাণ্ড দেখে একজন সাহাবি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি দেখলেন, খলিফা নিজের টাকায় পুরো মদিনার মেহমান ও অভাবীদের জন্য রাজকীয় ভোজের আয়োজন করছেন, অথচ রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও নিজে খাচ্ছেন রুক্ষ-শুকনো খাবার। তিনি কৌতুহল ধরে রাখতে না পেরে খলিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, *"হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি মদিনার মানুষকে এত চমৎকার ও দামি খাবার খাওয়ান, অথচ নিজের জন্য এই সাধারণ সিরকা আর তেল-রুটি কেন?"* হযরত উসমান (রা.) মুচকি হেসে অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: *"আমি*

মুসলমানদের খলিফা। বায়তুল মালের সম্পদ হচ্ছে জনগণের আমানত, আর আমার ব্যক্তিগত সম্পদ হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত। আমি মানুষের কল্যাণে এবং রাষ্ট্রের মেহমানদের সম্মানে আমার নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে খরচ করি—যাতে আল্লাহ আমার ওপর সন্তুষ্ট হন। আর নিজের শরীরের জন্য এই সাধারণ খাবারটুকুই যথেষ্ট মনে করি, যাতে আখেরাতে আমাকে বিলাসিতার হিসাব দিতে না হয়।" ইসলামি শরিয়তের নিয়মানুযায়ী, খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রের সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন বলে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রার যাবতীয় খরচ 'বায়তুল মাল' (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে নির্বাহ করার বৈধ অধিকার থাকে। পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) বায়তুল মাল থেকে অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে ভাতা নিতেন (যা কেবল সাধারণ একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন) । কিন্তু হযরত উসমান (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে একটি দিরহামও ভাতা বা বেতন নিতে অস্বীকৃতি জানান। খলিফা হওয়ার আগে থেকেই তিনি মদিনার অন্যতম শীর্ষ ধনী ও সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। খলিফা থাকা অবস্থাতেও তাঁর সেই ব্যক্তিগত ব্যবসার লভ্যাংশ আসত। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রকে তিনি সেবা দেবেন বিনামূল্যে, আর নিজের খরচ চালাবেন নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে।

ক্রীতদাসদের সাথেও মানবিক ও দয়াশীল আচরণ

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের এই ঘটনাটি তাঁর অগাধ খোদাভীতি, বিনয় এবং আখেরাতের জবাবদিহিতার এক চরম নিদর্শন। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও তিনি একজন সাধারণ দাসের কাছে যেভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন, তা মানব ইতিহাসে বিরল। হযরত উসমান (রা.) তখন কোটি কোটি মানুষের খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান। একদিন কোনো একটি পারিবারিক বা গৃহস্থালির কাজে তাঁর একজন ব্যক্তিগত ক্রীতদাস (গোলাম) ভুল করে বসে। খলিফা উসমান (রা.) সেই মুহূর্তে কিছুটা রাগান্বিত হয়ে যান এবং রাগের মাথায় দাসটির কান টেনে ধরেন। ইসলামে ক্রীতদাসদের সাথেও মানবিক ও দয়াশীল আচরণ করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। কান টানার ঘটনাটি হয়তো খুব বড় কোনো শারীরিক নির্যাতন ছিল না, কিন্তু একজন আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে হযরত উসমান (রা.)-এর মন খটকা লেগে ওঠে। তিনি তীব্র অনুশোচনায় ভুগতে থাকেন যে, খলিফা হওয়ার অহংকারে তিনি একজন দুর্বল মানুষের প্রতি অবিচার করে ফেলেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই ক্রীতদাসকে ডেকে নিজের সামনে দাঁড় করান। দাসটি ভাবছিল খলিফা হয়তো তাকে আবার বকাঝকা করবেন। কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে খলিফা উসমান (রা.) নিজের মাথাটি নিচু করলেন এবং দাসটির হাত ধরে নিজের কানের ওপর রেখে বললেন: *"হে যুবক! আমি অন্যায়ভাবে তোমার কান টেনেছিলাম। আল্লাহর দোহাই, তুমি এখন ঠিক একইভাবে আমার কান টেনে তোমার প্রতিশোধ (কিসাস) নাও।"* দাসটি ভয়ে ও সংকোচে পিছিয়ে গেল। সে বলল, *"হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি আমার মনিব এবং মুসলমানদের খলিফা। আমি আপনার ওপর বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট নই, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"* কিন্তু হযরত উসমান (রা.) কিছুতেই তা মানতে রাজি হলেন না। তিনি জানতেন, দুনিয়ার বুকে কারো পাওনা বা জুলুমের বিচার না চুকিয়ে আখেরাতে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ালে রেহাই পাওয়া যাবে না। তিনি দাসটিকে জোরাজুরি করে বললেন: *"না, তোমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। দুনিয়ার বুকে এই সামান্য বদলা নেওয়া আখেরাতের কঠিন ও অপমানজনক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে কোটি গুণ উত্তম। দয়া করে আমার কান টানো।"* খলিফার অনড় অবস্থা দেখে দাসটি বাধ্য হয়ে অত্যন্ত আলতো করে খলিফার কান স্পর্শ করল। এতে খলিফা সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি দাসটিকে কেঁদে কেঁদে বললেন- *"আরেকটু জোরে টানো! যেন আখেরাতের হিসাব এখানেই চুকে*

যায়। আল্লাহর কসম, তুমি যেভাবে ব্যথা পেয়েছিলে, আমাকেও ঠিক সেভাবেই ব্যথা দাও।" দাসটি খলিফার কান্নায় আপ্লুত হয়ে মৃদু একটু চাপ দিল মাত্র। এরপর হযরত উসমান (রা.) আল্লাহর দরবারে হাত তুলে শুকরিয়া আদায় করলেন যে, দুনিয়াতেই তিনি নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ পেয়েছেন। এই ঘটনার পরপরই তিনি সেই দাসটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ *মুক্ত (আজাদ) করে দেন* এবং তাকে নিজের সম্পদ থেকে কিছু উপহারও প্রদান করেন।

নিজের জীবনের বিনিময়ে মদিনাবাসীকে রক্ষা

তাঁর খিলাফতের শেষের দিকে যখন মিসর ও কুফা থেকে আসা বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছিল, তখন মদিনার আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা খলিফাকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিতে চেয়েছিলেন। এমনকি হযরত আলী (রা.) তাঁর দুই সন্তান হাসান ও হুসাইনকে খলিফার বাড়ির দরজায় পাহারায় বসিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তখন ঘরের ভেতর থেকে সাহাবিদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বলেন, *"আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, যার ওপর আমার বিন্দুমাত্র আনুগত্যের অধিকার আছে, সে যেন তার তরবারি কোষবদ্ধ করে এবং নিজের ঘরে ফিরে যায়।"* তিনি জানতেন, তিনি যদি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তবে মদিনার রাস্তায় মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে রক্তগঙ্গা বইবে। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শহরকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচাতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা শ্রেয় মনে করেছিলেন, কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হতে দেননি। বিদ্রোহীরা যখন তাঁর বাড়ি অবরুদ্ধ করে রেখেছে এবং তাঁর পানি পান করা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে, ঠিক সেই দিনগুলোতেও তাঁর দয়া কমেনি। একদিন এক বিদ্রোহী পাহারাদার খলিফার বাড়ির প্রাচীর বেয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করার সময় পা পিছলে নিচে পড়ে মারাত্মক আঘাত পায় এবং ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। খলিফা উসমান (রা.) ঘরের ভেতর থেকে তা দেখতে পেয়ে নিজের কষ্টের কথা ভুলে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর খাদেমকে দিয়ে সেই আহত শত্রুর জন্য ওষুধ এবং ব্যান্ডেজের ব্যবস্থা করেন। যে মানুষগুলো তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল, তাদের প্রতিও তাঁর এই আচরণ ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত।

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের পদক্ষেপসমূহ

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিনগুলোতে মিসর, কুফা ও বসরা থেকে আসা বিদ্রোহীরা মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল। পরিস্থিতি এত দ্রুত অবনতি হয়েছিল যে, তিনি স্বাধীনভাবে কোনো রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল এবং বাইরের দুনিয়ার সাথে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল।তাই হযরত উসমান (রা.) তাঁর পরবর্তী খলিফা কে হবেন, তা নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেননি বা কাউকে মনোনীত করে যাননি। হযরত উসমান (রা.) কোনো গৃহযুদ্ধ বা অবরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে তাড়াহুড়ো করে কাউকে মনোনীত করতে চাননি। তিনি বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর শীর্ষস্থানীয় সাহাবি এবং 'শূরা' (পরামর্শ সভা)-এর ওপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করেছিলেন।বিদ্রোহীরা যখন মদিনা ঘেরাও করে, তখন তারা চাচ্ছিল হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের পদ থেকে পদত্যাগ করুন। হযরত উসমান (রা.) জানতেন, তিনি যদি এই চাপের মুখে পদত্যাগ করেন বা নতুন কারো নাম ঘোষণা করেন, তবে ইসলামি খেলাফতের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে এবং বিদ্রোহীরা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তিনি বিদ্রোহীদের কোনো দাবি বা শর্তের সামনে মাথা নত করেননি। এছাড়া হযরত উসমান (রা.) শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে, সাহাবিদের বোঝানো এবং আলোচনার মাধ্যমে এই সংকটের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান আসবে। তিনি ভাবেননি যে বিদ্রোহীরা মদিনার মাটিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খলিফাকে হত্যা করার মতো জঘন্য সাহস দেখাবে। ফলে

তিনি পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের চেয়ে তৎকালীন ফিতনা বা সংকট দূর করতেই বেশি মনোযোগী ছিলেন।মোটকথা হযরত উসমান (রা.) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাঁর শাহাদাতের পর মদিনায় যখন চরম নেতৃত্বহীনতা এবং অরাজকতা তৈরি হয়, তখন মদিনার আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে হযরত আলী (রা.)-কে চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র ও খলিফার শাহাদাত

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষভাগে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে ভয়াবহ ফিতনা, অস্থিরতা এবং খলিফা হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছিল, তার নেপথ্যের মূল মাস্টারমাইন্ড ও উস্কানিদাতা ছিল *আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা* (তাকে *'ইবনে সাওদা' বা কালো দাসীর পুত্রও* বলা হতো)। ইতিহাসবিদদের (বিশেষ করে ইমাম তবারি ও সাইফ ইবনে উমরের বর্ণনা) মতে, সে সরাসরি কোনো যুদ্ধ করেনি, বরং ইসলামের ইতিহাসে *প্রথম সুসংগঠিত 'আন্ডারগ্রাউন্ড' বা আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্রের জাল* বুনেছিল।আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল মূলত ইয়েমেনের সান'আ অঞ্চলের একজন ইহুদি। সে দেখল, সামরিক শক্তি দিয়ে মুসলমানদেরকে পরাজিত করা অসম্ভব। তাই সে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ভেতর থেকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের মাঝামাঝি সময়ে সে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় আসে এবং নিজেকে একজন পরম পরহেজগার মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে।মদিনার সচেতন সাহাবিদের মাঝে ডালপালা মেলতে না পেরে সে মদিনা ছেড়ে হিজাজ, বসরা, কুফা, সিরিয়া এবং মিশরে ভ্রমণ শুরু করে। সেসব অঞ্চলের নতুন ও সরলমনা মুসলমানদের মাঝে সে সুকৌশলে কিছু বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় তত্ত্ব ছড়াতে থাকে। সে প্রচার করতে থাকে, যদি হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারেন, তবে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.) কেন ফিরে আসবেন না? তিনি অবশ্যই কিয়ামতের আগে ফিরে আসবেন। সে দাবি করে, প্রত্যেক নবীর একজন করে 'ওসি' বা স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওসি হলেন হযরত আলী (রা.) ।এই তত্ত্বটিই পরবর্তীতে শিয়া আকিদার ভিত্তি হিসেবে রূপ নেয়। সে প্রচারণা চালায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর হক নষ্ট করে হযরত উসমান (রা.) জোরপূর্বক খিলাফতের আসন দখল করে আছেন। সুতরাং, উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। কুখ্যাত ষড়যন্ত্রকারী عبد الله بن سبأ (আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা) যখন বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে প্রচার করত যে, *"হযরত আলী (রা.) থাকতে হযরত উসমান (রা.) কেন খলিফা হলেন?"*—তখন সে মূলত সাধারণ মানুষ এবং কিছু প্রখ্যাত সাহাবির কাছে গিয়ে তাদের মন চাঙ্গা বা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।ইতিহাসের বর্ণনা (বিশেষ করে ইমাম তবারির ইতিহাস গ্রন্থ) অনুযায়ী, ইবনে সাবা এবং তার অনুসারীরা সরাসরি বা সুকৌশলে যাদের কাছে গিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন বা বিভ্রান্তি তোলার চেষ্টা করেছিল, তারা হলেন:

হযরত আবু জর গিফারী (রা.) [সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিল]ঃ ইবনে সাবা সিরিয়াতে গিয়ে বিখ্যাত ও দরবেশ সাহাবি হযরত আবু জর গিফারী (রা.)-এর কাছে যায়।আবু জর গিফারী (রা.) স্বভাবগতভাবেই খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং ধনীদের অতিরিক্ত সম্পদ জমিয়ে রাখার তীব্র বিরোধী ছিলেন।ইবনে সাবা তাঁর এই সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুরু করে, "হে আবু জর! দেখুন খলিফা উসমান এবং গভর্নর মুয়াবিয়া কীভাবে সম্পদ বণ্টন করছেন! অথচ এর আসল হকদার তো হযরত আলী!"আবু জর গিফারী (রা.) ইবনে সাবার রাজনৈতিক চাল বুঝতে পারেননি, তবে তিনি তাঁর চারণভূমি ও সম্পদ জমানোর বিরুদ্ধে নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখেন। পরে খলিফা উসমান (রা.) ইবনে সাবার এই চাল বুঝতে পেরে আবু জরকে মদিনায় ডেকে পাঠান।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)ঃ ইবনে সাবা মিশরে গিয়ে ইসলামের অন্যতম প্রবীণ ও সম্মানিত সাহাবি হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-কে টার্গেট করে।সে তাঁর কাছে গিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর গুণগান গাইতে শুরু করে এবং প্রশ্ন তোলে, "রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে কাছের মানুষ আলী থাকতে কেন উসমানকে খিলাফতের আসনে বসানো হলো? উসমান কি স্বজনপ্রীতি করছেন না? "হযরত আম্মার (রা.) খলিফা উসমানের কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের (যেমন নির্দিষ্ট কিছু গভর্নর নিয়োগ) সমালোচনা করলেও, ইবনে সাবার তৈরি করা খলিফা-হত্যার চরমপন্থী ষড়যন্ত্রের সাথে কখনোই একমত হননি।

হযরত আবু দর্দা (রা.)ঃ সিরিয়াতে থাকার সময় ইবনে সাবা প্রখ্যাত সাহাবি ও ফকিহ হযরত আবু দর্দা (রা.)-এর কাছেও নিজের এই 'আলীপন্থী' ও 'উসমান বিরোধী' মতবাদ নিয়ে হাজির হয়েছিল।

হযরত আবু দর্দা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি ইবনে সাবার কথা শোনামাত্রই তার আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলেন। তিনি রেগে গিয়ে ইবনে সাবাকে সরাসরি বলেন, *"তুমি কে? আমার তো মনে হচ্ছে তুমি একজন ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাতে এসেছ।"*

এরপর তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন।

উবাদা ইবনে সামিত (রা.)ঃ সিরিয়ার আরেক প্রভাবশালী সাহাবি হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.)-এর কাছে গিয়েও ইবনে সাবা খলিফা উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্রশ্ন করেছিল।হযরত উবাদা (রা.) বিন্দুমাত্র দেরি না করে ইবনে সাবাকে শক্ত করে ধরে গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর দরবারে নিয়ে যান এবং বলেন, *"এই লোকটাই মদিনা এবং খলিফার বিরুদ্ধে আপনার এলাকায় ফিতনা ছড়াচ্ছে।"* এরপরই মুয়াবিয়া (রা.) ইবনে সাবাকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করেন।

হযরত আলী (রা.)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা শুধু অন্যান্য সাহাবিদের কাছেই যায়নি, সে স্বয়ং হযরত আলী (রা.)-এর সামনে গিয়েও তাঁর উপস্থিতিতে চরম বিভ্রান্তিকর ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা বলেছিল।

ইবনে সাবা হযরত আলী (রা.)-এর সামনে গিয়ে অত্যন্ত ভক্তির ভান করে বলেছিল: *"আপনিই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একমাত্র 'ওসি' (উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত)। আবু বকর, উমর এবং উসমান আপনার হক নষ্ট করে জোরপূর্বক খিলাফত দখল করেছে। খিলাফতের প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনি।"*হযরত আলী (রা.) ইবনে সাবার এই অতি-ভক্তি এবং উস্কানিমূলক কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন। তিনি বুঝতে পারেন এই লোকটির উদ্দেশ্য প্রশংসার আড়ালে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা। তিনি তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলেন: *"ধ্বংস হোক তোমার! রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এমন কোনো গোপন ওসিয়ত বা বিশেষ কিতাব রেখে যাননি যা সাধারণ মুসলমানদের জানা নেই। আবু বকর ও উমর (রা.) ইসলামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তুমি ইসলামের নামে কুৎসা রটাচ্ছ।"*এরপর হযরত আলী (রা.) তাকে মদিনা থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাকে **মাদায়েন** (পারস্যের একটি অঞ্চল) নামক স্থানে নির্বাসিত করেন। ইবনে সাবা বুঝতে পেরেছিল যে, সরাসরি খলিফার বিরোধিতা করলে সাধারণ মুসলমানরা তা মেনে নেবে না। তাই সে একটি চতুর কৌশল খাটায়। সে তার অনুসারীদের নির্দেশ দেয়— তোমরা মানুষের সামনে খুব ধর্মপরায়ণতা দেখাও এবং *'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দের নিষেধ'*-এর স্লোগান তোলো। এই স্লোগানের আড়ালে তোমরা প্রতিটি অঞ্চলের গভর্নর ও খলিফার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা ও খুঁত ধরতে শুরু করো। সে কুফা, বসরা ও মিশরে অত্যন্ত শক্তিশালী গোপন নেটওয়ার্ক বা 'সিক্রেট সোসাইটি' গড়ে তোলে।তারা খলিফা এবং তাঁর নিযুক্ত গভর্নরদের বিরুদ্ধে নানা কাল্পনিক ও মিথ্যা অপবাদের চিঠি তৈরি করত।যেমন: কুফার সাবায়ীরা চিঠি লিখত মিশরে

যে— "আমাদের গভর্নর মুসলমানদের ওপর জুলুম করছে।" আবার মিশরের সাবায়ীরা চিঠি পাঠাত কুফায় যে— "মিশরে দ্বীন ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, খলিফা স্বজনপ্রীতি করছেন।"এর ফলে বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ মুসলমানরা ভাবতে শুরু করে যে, পুরো সাম্রাজ্যেই বুঝি খলিফা উসমান (রা.) অন্যায় ও জুলুম ছড়াচ্ছেন, অথচ বাস্তবে মদিনায় খলিফা এগুলোর কিছুই জানতেন না।ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত ধাপে সাবায়ীরা মদিনার শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের (যেমন: হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.) সই জাল করে বিভিন্ন প্রদেশে চিঠি পাঠায়। চিঠিতে লেখা থাকত— *"মদিনায় ইসলাম বিপন্ন। খলিফা শরিয়ত পরিবর্তন করে ফেলেছেন। তোমরা দ্রুত মদিনায় এসে খলিফাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করো।"* এই জাল চিঠিগুলো দেখে বিভিন্ন অঞ্চলের হাজার হাজার সরলমনা মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয়।

৪০ দিনের অবরুদ্ধ জীবনঃ ৩৫ হিজরির জিলকদ মাসে মিসর, কুফা ও বসরা থেকে আসা প্রায় দুই থেকে তিন হাজার বিদ্রোহী মদিনা ঘেরাও করে। তারা খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর পদত্যাগ দাবি করে। খলিফা পদত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি অবরুদ্ধ করে ফেলে।এই অবরোধ দীর্ঘ **৪০ দিন** স্থায়ী হয়েছিল। শেষ দিনগুলোতে বিদ্রোহীরা এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল যে, তারা খলিফার বাড়ির পানি ও খাবার সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) পানি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলে বিদ্রোহীরা তাঁর ওপরও চড়াও হয়।

খলিফার স্বপ্নের সেই রাতঃ শাহাদাতের আগের রাতে (১৭ জিলহজ) হযরত উসমান (রা.) স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে দেখতে পান। স্বপ্নে আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁকে বলেন: *"হে উসমান! ওরা কি তোমাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে? ওরা কি তোমাকে তৃষ্ণার্ত রেখেছে?"* হযরত উসমান বললেন, *"হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!"* তখন রাসুল (সা.) বললেন, *"আজ তুমি আমাদের সাথে এসে ইফতার করবে।"*ঘুম থেকে উঠে হযরত উসমান (রা.) নিশ্চিত হন যে আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন। তিনি ওই দিন রোজা রাখেন এবং নিজের ক্রীতদাসদের ডেকে সবাইকে মুক্ত (আজাদ) করে দেন।

রক্তপাতহীনতার চূড়ান্ত নির্দেশঃ হযরত আলী (রা.)-এর দুই পুত্র হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.), হযরত যুবায়ের-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) সহ বেশ কয়েকজন তরুণ সাহাবি তরবারি হাতে খলিফার বাড়ির প্রধান ফটক পাহারা দিচ্ছিলেন। তারা বিদ্রোহীদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না। ভেতর থেকে হযরত উসমান (রা.) তাঁদের ডেকে বলেন, *"আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা তরবারি খাপবদ্ধ করো এবং নিজেদের ঘরে ফিরে যাও। আমার কারণে আমি মদিনার মাটিতে এক ফোঁটা রক্তও ঝরাতে চাই না।"* তিনি নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বাধাতে চাননি।

নির্মম শাহাদাতের বিবরণ (১৮ জিলহজ, ৩৫ হিজরি)ঃ অবরোধ চলাকালীন এক পর্যায়ে সাহাবিদের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহীরা ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু ইবনে সাবা জানত, বিদ্রোহীরা ফিরে গেলে তার পুরো পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তাই সে খলিফার সরকারি সিল জাল করে বিদ্রোহীদের দমনের এক ভুয়া নির্দেশনামা তৈরি করে এবং তা বিদ্রোহীদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে।এই ভুয়া চিঠি দেখে বিদ্রোহীরা চরম ক্ষিপ্ত হয়ে মাঝপথ থেকে মদিনায় ফিরে আসে। তারিখটি ছিল ১৮ জিলহজ, ৩৫ হিজরি (জুন, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)। *জুমার* দিন। হযরত উসমান (রা.) অত্যন্ত শান্তভাবে ঘরের ভেতর বসে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। প্রধান ফটকে সাহাবিদের কড়া পাহারা থাকায় মূল হন্তারক 'মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর' (তৎকালীন

পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেওয়া) এবং আরও কয়েকজন বিদ্রোহী পেছনের আনসারদের একটি বাড়ির দেয়াল টপকে খলিফার ঘরে প্রবেশ করে। তারা যখন ঘরে ঢোকে, খলিফা তখনো কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ঘাতকরা প্রথমে তাঁর দাড়ি ধরে টান দেয়। খলিফা অত্যন্ত শান্তভাবে বলেন, *"তুমি যদি আজ তোমার পিতা (আবু বকর) বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি তোমার এই কাজ পছন্দ করতেন না।"* এতে সে লজ্জিত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে যায়। কিন্তু অন্য দুই কুখ্যাত বিদ্রোহী *(কিবানা ইবনে বিশর এবং আমর ইবনে হামিক)* খলিফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লোহার রড ও তরবারি দিয়ে তাঁর মাথায় ও বুকে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। খলিফার স্ত্রী হযরত নায়েলা (রা.) স্বামীকে বাঁচাতে নিজের হাত দিয়ে তরবারি চেপে ধরলে ঘাতকদের ধারালো আঘাতে তাঁর হাতের ৩টি আঙুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘাতকদের তরবারির আঘাতে ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ খলিফা জায়নামাজেই লুটিয়ে পড়েন। শাহাদাতের মুহূর্তে তাঁর পবিত্র রক্ত পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির ওপর গিয়ে পড়ে: **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** *"অতএব তাদের মোকাবেলায় আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সব শোনেন ও সব জানেন।" (সূরা বাকারা: ১৩৭)*

জানাজা ও দাফন

খলিফাকে শহীদ করার পরও ঘাতকদের তাণ্ডব থামেনি। তারা খলিফার বাড়ি ও বায়তুল মাল লুট করে। মদিনাজুড়ে তখন খুনিদের রাজত্ব।খলিফার পবিত্র মরদেহ তিন দিন পর্যন্ত দাফন করা সম্ভব হয়নি।অবশেষে শাহাদাতের তৃতীয় রাতে, *হযরত আলী (রা.)*-এর হস্তক্ষেপে এবং কড়া পাহারার মধ্যে রাতের অন্ধকারে মাত্র কয়েকজন সাহাবি *(মতান্তরে ১৭ জন)* খলিফার জানাজা পড়েন। হযরত উসমান (রা.)-এর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি *হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) (মতান্তরে হযরত হাকিম ইবনে হিযাম অথবা জাবীর ইবনে মুতইম) ।* মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান *'জান্নাতুল বাকি'*-র ঠিক পেছনে *'হাশশেক কাওকাব'* নামক একটি জায়গায় (যা পরে জান্নাতুল বাকির অংশ হয়ে যায়) এই মহান খলিফাকে দাফন করা হয়।

ওফাতের প্রভাবঃ হযরত উসমান (রা.)-এর এই নির্মম শাহাদাত মুসলিম উম্মাহর বুক চিরতরে দুভাগে বিভক্ত করে দেয়। এই হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ এবং জিমাল ও সিফফিনের মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত হয়—যার ক্ষত মুসলিম উম্মাহ আজও বহন করছে।

এক নজরে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতে ইসলামের প্রধান উন্নতিসমূহ

পবিত্র কুরআন সংকলন: আঞ্চলিক উচ্চারণের বিকৃতি রোধে কুরাইশীতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের প্রামাণ্য অনুলিপি তৈরি করে প্রধান প্রদেশগুলোতে প্রেরণ করেন (এজন্য তাঁকে 'জামেউল কুরআন' বলা হয়)।

প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী গঠন: রোমানদের সমুদ্রপথের আক্রমণ ঠেকাতে ২৮ হিজরিতে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলেন।

বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার: তাঁর আমলে উত্তর আফ্রিকা, সাইপ্রাস, আরমেনিয়া, আজারবাইজান এবং এশিয়ার খোরাসান ও পারস্যের অবশিষ্ট অংশ বিজিত হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রথম পৃথক আদালত ভবন (দারুল কাজা) নির্মাণ: বিচারিক কাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং মসজিদের পবিত্রতা রক্ষায় ইতিহাসে প্রথম আলাদা আদালত ভবন প্রতিষ্ঠা করেন।

মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ: মদিনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মসজিদে নববীকে

প্রথমবার পাথর ও সেগুন কাঠ দিয়ে নকশাময়, মজবুত ও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করেন।
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনকল্যাণ: বায়তুল মালের সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনগণের ভাতা বৃদ্ধি করেন এবং পানির সংকট দূর করতে চারণভূমি ও পানির কূপের উন্নয়ন করেন।
সরকারি দপ্তরে জবাবদিহিতা: দূরবর্তী প্রদেশগুলোর গভর্নর ও কর্মকর্তাদের ওপর কঠোর নজরদারি এবং জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেন।
প্রথম পুলিশ বাহিনী ও কারাগার আধুনিকায়ন: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমনে হযরত উমর (রা.)-এর শুরু করা পুলিশ ব্যবস্থাকে তিনি আরও সংগঠিত করেন এবং বন্দীদের জন্য বিশেষ কারাগার নির্মাণ করেন।
বিশাল চারণভূমি (হিমা) তৈরি: রাষ্ট্রীয় ঘোড়া ও উটের খাদ্যের অভাব দূর করতে মদিনার অদূরে 'রাবজা' নামক স্থানে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চারণভূমি গড়ে তোলেন।
হজের প্রশাসনিক সংস্কার: মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী রাস্তায় হাজীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ সেনা ছাউনি এবং পানির ফোয়ারা বা কূপ খনন করান।
মুয়াজ্জিনদের সরকারি ভাতা প্রদান: ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মসজিদের মুয়াজ্জিনদের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত সরকারি ভাতা বা সম্মানী নির্ধারণ করেন।
জাকাত ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ: জনগণের সুবিধার্থে তিনি স্বর্ণ ও রোপ্যের (নগদ অর্থ) জাকাত হিসাব করার দায়িত্ব সরাসরি মালিকদের ওপর ছেড়ে দেন এবং দৃশ্যমান সম্পদের (পশু, ফসল) জাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে উসুল করার নিয়ম করেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল থেকে শিক্ষণীয়

হযরত উসমান (রা.)-এর ১২ বছরের খিলাফতকাল থেকে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিনগুলোতে যখন বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, তখন তিনি চাইলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তাদের দমন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মদিনার মাটিতে মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত এড়াতে নিজের জীবন উৎসর্গ করাকে বেছে নিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায় নিজের স্বার্থ বা জীবন বাঁচানোর চেয়ে সমাজ ও উম্মাহর ঐক্য রক্ষা করা এবং ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তপাতহীন শান্তি বজায় রাখা অনেক বড় গুণ। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে যখন পবিত্র কুরআন পাঠে আঞ্চলিক উচ্চারণের ভিন্নতা দেখা দেয়, তখন তিনি কুরাইশ বংশের প্রামাণ্য রীতি অনুযায়ী অনুলিপি তৈরি করে সব প্রদেশে পাঠান। এছাড়া প্রথম নৌবাহিনী গঠন এবং 'দারুল কাজা' (পৃথক আদালত ভবন) নির্মাণ তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ। এ থেকে বুঝা যায় যুগের পরিবর্তন ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সঠিক সময়ে সাহসী ও দূরদর্শী প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তিনি খলিফা থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে একটি দিরহামও ভাতা নেননি। উল্টো নিজের ব্যক্তিগত অর্থ খরচ করে রাষ্ট্রীয় মেহমানদের রাজকীয় আপ্যায়ন করতেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করতেন। এ থেকে বুঝা যায় ক্ষমতা বা উচ্চ পদকে নিজের সম্পদ বাড়ানোর মাধ্যম না বানিয়ে, তা মানুষের নিঃস্বার্থ সেবায় উজার করে দেওয়া উচিত। কোটি কোটি মানুষের শাসক হয়েও তিনি একজন সাধারণ ক্রীতদাসের কাছে নিজের মাথা নিচু করে দুনিয়াতেই কান টানার প্রতিশোধ নিতে বলেছিলেন, যাতে আখেরাতের আদালতে দাঁড়াতে না হয়। আদালতে সাধারণ নাগরিকের পাশে দাঁড়িয়ে বিচারকের রায় মেনে নেওয়ার ঘটনাও তাঁর বিনয় প্রকাশ করে। এ থেকে বুঝা যায় পদমর্যাদা যতই ওপরে হোক না কেন, সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা এবং পরকালের জবাবদিহিতাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করা উচিত। বিদ্রোহীরা যখন

তাঁর বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিল, তখন তিনি রেগে না গিয়ে মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত নম্রভাবে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এমনকি অবরুদ্ধ অবস্থায় আহত শত্রুর ক্ষতে ব্যান্ডেজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় নেতৃত্বের আসনে থাকলে কুৎসা বা সমালোচনার মুখোমুখি ধৈর্য ও ক্ষমার সাথে হতে হয়, প্রতিহিংসা দিয়ে নয়। হযরত উসমান (রা.)-এর জীবন আমাদের শেখায় কীভাবে প্রাচুর্য ও ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও নির্মোহ, বিনয়ী, পরোপকারী এবং পরম ধৈর্যশীল থাকা যায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর এই অহিংস ও আত্মত্যাগের নীতি মানব ইতিহাসের এক অনন্য আদর্শ।

উসমান (রা.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব

হযরত উসমান (রা.)-এর দীর্ঘ ১২ বছরের খিলাফতকাল ইসলামের ইতিহাসে সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের এক স্বর্ণযুগ, যার গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর শাসনামলে মুসলিম ম্যাপের পরিধি উত্তর আফ্রিকা, সাইপ্রাস, আরমেনিয়া ও খোরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এক বিশাল বিশ্বসাম্রাজ্যে রূপ নেয় এবং রোমানদের সমুদ্রপথের আক্রমণ প্রতিহত করতে ইসলামের প্রথম শক্তিশালী 'নৌবাহিনী' গঠিত হয়। তবে তাঁর খিলাফতের সবচেয়ে কালজয়ী ও ঐতিহাসিক গৌরবময় অবদান হলো আঞ্চলিক উচ্চারণের বিকৃতি থেকে রক্ষা করে কুরাইশ রীতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের একক প্রামাণ্য অনুলিপি তৈরি ও তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া, যা তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা কুরআন একত্রকারীর মর্যাদায় ভূষিত করে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি মসজিদে নববীর প্রথম বৃহৎ ও মজবুত সম্প্রসারণ করেন, ইতিহাসের প্রথম পৃথক আদালত ভবন বা 'দারুল কাজা' নির্মাণ করে বিচার বিভাগকে এক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন এবং প্রথম সংগঠিত পুলিশ বাহিনী ও কারাগার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন নিশ্চিত করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন; খলিফা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে নিজে কোনো বেতন বা ভাতা না নিয়ে, উল্টো নিজের বিপুল ব্যক্তিগত সম্পদ দিয়ে প্রতিদিন দূর-দূরান্তের রাষ্ট্রীয় মেহমান ও অভাবী মানুষের রাজকীয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন, যা তাঁর অতুলনীয় দানশীলতা ও নির্মোহ নেতৃত্বের পরিচয় দেয়। এছাড়া চারণভূমি উন্নয়ন, হজের প্রশাসনিক সংস্কার এবং মুয়াজ্জিনদের সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তিনি সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। খিলাফতের শেষভাগে কুচক্রী বিদ্রোহীদের দ্বারা মদিনা অবরুদ্ধ হলে, ৮০ বছর বয়সী এই মহান খলিফা নিজের জীবন বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বা রক্তপাত চাননি; ফলে চরম ধৈর্য ও অহিংস নীতি বজায় রেখে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আত্মত্যাগ এবং খিলাফতকাল উম্মাহকে যেমন এক শাশ্বত ও একক কুরআন উপহার দিয়েছে, তেমনি ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও কীভাবে চরম বিনয়ী, পরোপকারী এবং খোদাভীরু থাকা যায়, তার এক কালজয়ী আদর্শ রেখে গেছে।

চতুর্থ খলিফা নির্বাচন [হযরত আলী (রা.)]

হযরত উসমান (রা.)-এর নির্মম শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলী (রা.)-এর দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষাপটটি ছিল অত্যন্ত জটিল, আকস্মিক এবং চরম উত্তেজনাকর। ইসলামের ইতিহাসে এর আগে কখনো এত বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মধ্যে কোনো খলিফা নির্বাচিত হননি। ৩৫ হিজরির ১৮ জিলহজ খলিফা উসমান (রা.) শহীদ হওয়ার পর মদিনা শহরটি সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। মদিনার আনসার ও মুহাজির সাহাবিরা

চরম শোক ও আতঙ্কে নিজেদের ঘরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মিশর, কুফা ও বসরা থেকে আসা প্রায় ৩,০০০ খলিফা-হত্যাকারী উগ্র বিদ্রোহীদের হাতে। ইসলামের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথমবার, যখন খেলাফতের রাজধানী কোনো বৈধ শাসক ছাড়া সম্পূর্ণ গুণ্ডা ও বিদ্রোহীদের অধীনে চলে যায়। বিদ্রোহীরা মদিনা দখল করলেও তারা ভালো করেই জানত যে, মদিনার কোনো সম্মানিত ও প্রবীণ সাহাবিকে যদি খলিফা হিসেবে দাঁড় করানো না যায়, তবে পুরো মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য প্রদেশের গভর্নর ও সাধারণ মুসলমানরা তাদের ওপর চড়াও হবে এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেবে। তাই নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তারা মদিনার শীর্ষ সাহাবিদের ওপর খলিফা হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে গিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার জোরালো অনুরোধ করে। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই রক্তাক্ত ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিতে পরিষ্কার *অস্বীকৃতি জানান।* এরপর বিদ্রোহীরা যথাক্রমে হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর কাছে যায়। কিন্তু তাঁরা দুজনেই বিদ্রোহীদের প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি বিদ্রোহীরা হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কেও খলিফা হওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনিও এই ফিতনার সময়ে রাজি হননি। কোনো সাহাবিই যখন খলিফা হতে রাজি হচ্ছিলেন না, তখন মদিনার সংকট চরমে পৌঁছায়। বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে সমবেত করে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে: *"আমরা আর মাত্র দুই দিন মদিনায় আছি। এর মধ্যে যদি তোমরা তোমাদের খলিফা নির্বাচন না করো, তবে আমরা আলী, তালহা, যুবায়েরসহ মদিনার সব শীর্ষস্থানীয় মানুষকে হত্যা করব এবং মদিনা শহর ধ্বংস করে দেব।"* এই ভয়াবহ হুমকির পর মদিনার আনসার ও মুহাজিররা বুঝতে পারেন যে, এখন খলিফা নির্বাচন না করলে ইসলামি রাষ্ট্র চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। মদিনার সর্বস্তরের সাহাবি ও সাধারণ মানুষ দলবেঁধে হযরত আলী (রা.)-এর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। তাঁরা আকুল আবেদন জানিয়ে বলেন, "হে আলী! ইসলাম আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। খলিফা ছাড়া এই রাষ্ট্র এক মুহূর্তও চলতে পারে না। আর এই মুহূর্তে আপনার চেয়ে যোগ্য, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটবর্তী এবং সম্মানের অধিকারী আর কেউ বেঁচে নেই। উম্মাহর স্বার্থে আপনাকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে।" হযরত আলী (রা.) তখনও দ্বিমত পোষণ করে বলেন, *"আমাকে খলিফা না বানিয়ে তোমরা বরং অন্য কাউকে বানাও, আমি তার উজির বা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করব।"* কিন্তু সাহাবিরা পিছু হঠলেন না। তাঁরা বললেন, "আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই মানবো না।" অবশেষে, উম্মাহর ভাঙন রোধ করতে এবং মদিনাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খিলাফতের এই কঠিন কাঁটাময় মুকুট মাথায় তুলে নিতে রাজি হন। তবে তিনি একটি ঐতিহাসিক শর্ত দেন: *"আমার বায়াত (আনুগত্যের শপথ) কোনো ঘরের ভেতরে গোপনে হবে না। এটি হবে মসজিদে নববীতে, জনসম্মুখে এবং সমস্ত মুসলমানের উপস্থিতিতে ও সম্মতিতে।"*হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ৫ দিন পর, ৩৫ হিজরির ২৩ জিলহজ মসজিদে নববীতে মদিনার সমস্ত সাধারণ মানুষ ও সাহাবিরা সমবেত হন। হযরত আলী (রা.) মিম্বরে আরোহণ করেন। সেখানে উপস্থিত প্রায় সমস্ত আনসার ও মুহাজির সাহাবি (যাঁদের মধ্যে *হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের*ও ছিলেন) অত্যন্ত
স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হাতে খিলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন।

হজরত আলী (রা.)-এর বায়াত (শপথ গ্রহণ)

হজরত আলী (রা.)-এর বায়াতের ক্ষেত্রে এই 'আম' (সাধারণ) ও 'খাস' (বিশেষ) বিষয়ের একটি আলাদা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বিতর্ক রয়েছে, যা অন্য খলিফাদের চেয়ে ভিন্ন। অন্যান্য

খলিফাদের (যেমন হজরত আবু বকর বা ওমরের) ক্ষেত্রে বায়াতে খাস হয়েছিল মদিনার সকল শীর্ষস্থানীয় সাহাবির সর্বসম্মত উপস্থিতিতে। কিন্তু আলী (রা.)-এর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। হজরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মদিনায় চরম উত্তেজনা ছিল। বায়াতে খাসের সময় মদিনার অনেক বিশিষ্ট সাহাবি উপস্থিত ছিলেন না বা পরিস্থিতির কারণে নীরব ছিলেন। হজরত তালহা (রা.) ও যুবায়ের (রা.) প্রথম দিকে বায়াতে খাসে অংশ নেননি। পরবর্তীতে তাঁরা বায়াত করলেও দাবি করেছিলেন যে, মদিনা অবরুদ্ধ করে রাখা কুফা ও মিসরের বিদ্রোহীদের চাপে (তরবারির নিচে) তাঁরা বায়াত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলী (রা.)-এর 'বায়াতে আম' বা সাধারণ গণ-শাপথটি সম্পূর্ণ 'আম' (সর্বজনীন) হতে পারেনি। মদিনা, কুফা, বসরা ও মিসরের জনগণ তাঁর বায়াতে আম-এ শামিল হলেও সিরিয়াবাসী এবং সেখানে অবস্থানরত বনু উমাইয়ারা এই বায়াত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। সিরিয়ার গভর্নর হজরত মুয়াবিয়া (রা.) পরিষ্কার জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার বা কিসাস নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি বা সিরিয়ার জনগণ আলী (রা.)-এর হাত ধরে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ নেবেন না।

কেন আলীর (রা.) বায়াতকে ঐতিহাসিকভাবে 'আলাদা' বলা হয়? পূর্ববর্তী খলিফাদের নির্বাচন হয়েছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সাহাবিদের সুশৃঙ্খল মশোয়ারার (পরামর্শ) মাধ্যমে। কিন্তু আলী (রা.)-এর বায়াতের পেছনে মদিনা দখল করে রাখা বিদ্রোহী ও উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের একটি বড় প্রভাব বা চাপ ছিল। আবু বকর (রা.), উমর (রা.) বা উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় বায়াত সম্পন্ন হওয়ার পর পুরো মুসলিম বিশ্বে কোনো দ্বিমত ছিল না। কিন্তু আলী (রা.)-এর বায়াতের সময় খোদ মদিনার কিছু সাহাবি (যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে উমর, সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস, উসামা বিন জায়েদ) এই বায়াত থেকে দূরে বা নিরপেক্ষ ছিলেন।বায়াতে আম ও খাসের এই অসম্পূর্ণতা এবং উসমান (রা.)-এর কিসাস (হত্যাকাণ্ডের বিচার) সংক্রান্ত মতভেদের কারণেই পরবর্তীতে জুমাল (উটের যুদ্ধ) এবং সিফফিনের মতো ভয়াবহ মুসলিম গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে, অন্য খলিফাদের বেলায় বায়াতে খাস ও আম ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বজনীন; আর হজরত আলী (রা.)-এর বেলায় বায়াতে খাস ও আম ছিল সংকটকালীন, চাপের মুখে এবং রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত।

খলিফা হিসেবে প্রথম ঐতিহাসিক ভাষণ

দায়িত্ব গ্রহণের পর হজরত আলী (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে এক ঐতিহাসিক ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। এই ভাষণে তাঁর শাসননীতি, তাকওয়া (আল্লাহভীতি) এবং তৎকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছিল। ভাষণের মূল অংশগুলো হলো: *"আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে পথপ্রদর্শক কিতাব (কোরআন) নাজিল করেছেন। এতে ভালো ও মন্দের পরিচয় স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং আপনারা মন্দের পথ পরিহার করে ভালোর পথ অবলম্বন করুন। আল্লাহর ফরজ কাজগুলো আদায় করুন, তিনি আপনাদের জান্নাতে নিয়ে যাবেন।"*তিনি মুসলমানদের অধিকার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর জোর দিয়ে বলেন: *"আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মান ও অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি নিষ্ঠা ও তওহিদের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকারগুলোকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলমান সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"*তিনি জনগণকে দুনিয়ার মোহ ছেড়ে

আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান: *"আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। হে আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আপনাদের সমাজ ও চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। মনে রাখবেন, আপনাদেরকে পশু এবং ঘরবাড়ি সম্পর্কেও (ধর্তব্যের দিনে) জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য করুন এবং তাঁর নাফরমানি থেকে দূরে থাকুন।"*মদিনার তৎকালীন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির দিকে ইশারা করে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলেন: *"আল্লাহর কসম! সত্য আজ হোক বা কাল, তার আপন জায়গায় ফিরে আসবেই। অন্যায়ভাবে যারা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যদি কেউ কোনো সম্পদ অন্যায়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে—তা দিয়ে যদি সে বিয়েও করে ফেলে বা দাসীও কেনে—আমি তা বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) ফিরিয়ে আনব। কারণ, ন্যায়বিচারের মধ্যেই শান্তি নিহিত।"*

হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

হজরত আলী (রা.) যখন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন ইসলামি রাষ্ট্র এক চরম সংকটকাল পার করছিল। তাঁর পুরো ৫ বছরের (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) শাসনামলই ছিল নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত।উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার (কিসাস) সংক্রান্ত জটিলতা ছিল তাঁর খিলাফতের সবচেয়ে বড় এবং মূল প্রতিবন্ধকতা।হজরত উসমান (রা.)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর মদিনা জুড়ে হত্যাকারী ও বিদ্রোহীদের আধিপত্য ছিল। মদিনার বিশিষ্ট সাহাবি এবং সিরিয়ার *গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)*-এর দাবি ছিল—আগে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করতে হবে।হজরত আলী (রা.)-এর অবস্থান ছিল বাস্তবসম্মত কিন্তু ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, চারদিকে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও সামরিক অস্থিতিশীলতা চলছে, তাতে আগে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি ফিরিয়ে আনা জরুরি। তা না করে সরাসরি বিদ্রোহীদের হাত দিতে গেলে রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার ঝুঁকি ছিল। এই কৌশলগত মতভেদই তাঁর শাসনের পথে প্রধান কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। খিলাফতের শুরুতেই হজরত আলী (রা.)-কে মদিনার অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামলাতে হয়। উসমান (রা.)-এর কিসাসের দাবিতে *উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা (রা.), হজরত তালহা (রা.) এবং হজরত যুবায়ের (রা.)* মক্কা থেকে বসরার দিকে রওনা হন। হজরত আলী (রা.) তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত হিজরি ৩৬ সনে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ *'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধ* সংঘটিত হয়। এতে *তালহা ও যুবায়ের (রা.)* শাহাদাত বরণ করেন। এই যুদ্ধ হজরত আলী র শাসনকে মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত করে তোলে। হজরত আলী (রা.) দায়িত্ব নিয়েই উসমান (রা.)-এর আমলের প্রাদেশিক গভর্নরদের পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সিরিয়ার শক্তিশালী গভর্নর হজরত মুয়াবিয়া (রা.) এই নির্দেশ অমান্য করেন এবং আলী র (রা.) বায়াত নিতে অস্বীকৃতি জানান।এর চূড়ান্ত পরিণতি ছিল হিজরি ৩৬ সনের *সিফফিনের যুদ্ধ*।যুদ্ধ যখন আলী (রা.)-এর জয়ের কাছাকাছি, তখন মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী বর্শার ডগায় কোরআন বেঁধে শান্তির আহ্বান জানায়। পরিস্থিতির চাপে আলী (রা.) যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হন, যা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল করে দেয়।সিফফিনের যুদ্ধ থামার পর দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনার জন্য 'তাহকিম' (সালিশি ব্যবস্থা) গঠিত হয়। কিন্তু এই সালিশি ব্যবস্থার কারণে হজরত আলীর নিজের দলেই চরম ফাটল ধরে। তাঁর বাহিনীর একটি বড় অংশ (প্রায় ১২ হাজার সৈন্য) দাবি করে—*"আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনো মানুষের ফয়সালা মানা কুফরি।"* * এরা দলছুট হয়ে চরমপন্থী *'খারেজি' (দলত্যাগী)* সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা হজরত আলী এবং মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কেই কাফের ঘোষণা করে এবং ফেতনা সৃষ্টি

করতে থাকে। পরবর্তীতে হিজরি ৩৮ সনে *নাহরাওয়ানের যুদ্ধে* আলী (রা.) খারেজিদের দমন করলেও, তারা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি এবং তাঁর জন্য স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।মদিনার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হজরত আলী (রা.) ইসলামের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের *কুফায়* স্থানান্তর করেন। কিন্তু কুফাবাসীরা ছিল চরম অবাধ্য, চঞ্চল এবং সুযোগসন্ধানী।সিরিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানের জন্য হজরত আলী যখনই কুফাবাসীদের আহ্বান জানাতেন, তারা অলসতা ও নানা অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে যেত।নিজের সেনাবাহিনীর এই অনৈক্য ও আদেশ অমান্য করার প্রবণতা হজরত আলী (রা.)-কে দারুণভাবে ব্যথিত ও দুর্বল করেছিল।হজরত আলী (রা.) দায়িত্ব নেওয়ার পর পূর্ববর্তী আমলের দেওয়া অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেন এবং সবার জন্য সমান ভাতার নীতি (সাম্য) চালু করেন। এই কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কারের কারণে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও গোত্রপ্রধান তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে চলে যায়।হজরত আলী (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, পরম দয়ালু এবং অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক। কিন্তু উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে ফেতনা ও গোষ্ঠীগত কোন্দল তৈরি হয়েছিল, তার বিষাক্ত প্রভাব হজরত আলী র পুরো শাসনকালকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত এই খারেজিদেরই একজন (আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম)-এর তরবারির আঘাতে হিজরি ৪০ সনে (৬৬১ খ্রি.) এই মহান খলিফা শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে প্রধান কাজসমূহ

হজরত আলী (রা.)-এর ৫ বছরের (৬৫৬-৬৬১ খ্রি.) শাসনকাল চরম অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কাটলেও, এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মাঝেই তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় বেশ কিছু যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর শাসননীতি ছিল মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হজরত আবু বকর (রা.)-এর সরল ও কঠোর সাম্যবাদী নীতির হুবহু প্রতিফলন।হজরত আলী (রা.)-এর শাসনামলের প্রধান কাজসমূহ হলো:

কঠোর প্রশাসনিক সংস্কার ও দুর্নীতি দমনঃ খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি খেলাফতের প্রশাসনিক কাঠামোতে বড় ধরনের শুদ্ধি অভিযান চালান।হজরত উসমান (রা.)-এর আমলের শেষ দিকে যেসব প্রাদেশিক গভর্নরদের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, আলী (রা.) তাঁদের পদচ্যুত করেন। তিনি কুফা, বসরা, মিসর ও ইয়েমেনে নতুন এবং বিশ্বস্ত সাহাবিদের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন।পূর্ববর্তী আমলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে স্বজনপ্রীতি বা উপহার হিসেবে যাদেরকে বড় বড় জমি ও সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল, আলী (রা.) তা অবৈধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ফিরিয়ে নেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

অর্থনৈতিক সাম্য ও বায়তুল মালের সুষম বণ্টনঃ হজরত আলী (রা.) খিলাফতের মজ্জাগত বৈষম্য দূর করে ইসলামের আদি অর্থনৈতিক সাম্য ফিরিয়ে আনেন।হজরত উমর (রা.)-এর আমলে সাহাবিদের মর্যাদা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ভাতার তারতম্য করা হতো। কিন্তু হজরত আলী (রা.) তা পরিবর্তন করে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মতো ছোট-বড়, আরব-অন আরব, নতুন-পুরোনো নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য **সমান ভাতার নীতি** চালু করেন। তিনি বায়তুল মালে উদ্‌বৃত্ত অর্থ জমিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রতি সপ্তাহের শেষে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সমস্ত অর্থ ও সম্পদ জনগণের মাঝে বণ্টন করে দিতেন এবং খালি কোষাগারে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দুই রাকাত নামাজ পড়তেন।

রাজধানী পরিবর্তন (কুফায় স্থানান্তর)ঃ হজরত আলী (রা.)-এর একটি অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের **কুফায়** স্থানান্তর করা (হিজরি ৩৬ সন)। মদিনা ছিল ইসলামের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, যা গৃহযুদ্ধের কারণে বারবার আক্রান্ত হচ্ছিল। এছাড়া তৎকালীন ভূ-রাজনীতিতে কুফা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের একদম কেন্দ্রস্থলে এবং সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী অঞ্চল। সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধার্থেই তিনি এই পরিবর্তন করেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবি ব্যাকরণের (নাহু) ভিত্তি স্থাপনঃ ইসলামের ইতিহাসে হজরত আলী (রা.)-কে জ্ঞানের দরজা বলা হয়। তাঁর আমলেই অমুসলিম ও অন-আরবদের (আজমি) সুবিধার্থে আরবি ভাষার সুরক্ষায় প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অন-আরবরা যখন ভুল উচ্চারণে কোরআন পড়া শুরু করে, তখন তিনি তাঁর বিখ্যাত ছাত্র *আবু আসওয়াদ আদ-দুয়ালি*-কে আরবি ব্যাকরণের নিয়ম (قواعد النحو - ইলমে নাহু) তৈরি করার নির্দেশ দেন। এটি আরবি ভাষার ইতিহাসে এক বিশাল বিপ্লব ছিল।

বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও উন্নয়নঃ হজরত আলী (রা.) নিজে একজন অনন্য বিচারক ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখেন। একবার খলিফা আলী (রা.)-এর একটি বর্ম হারিয়ে যায়, যা পরে এক ইহুদির কাছে পাওয়া যায়। খলিফা নিজে দেশের প্রধান বিচারপতি কাজী শুরাইহ-এর আদালতে সাধারণ নাগরিকের মতো মামলা লড়েন। উপযুক্ত সাক্ষী না থাকায় বিচারক খলিফার বিপক্ষে এবং ইহুদির পক্ষে রায় দেন। খলিফা সানন্দে এই রায় মেনে নেন। বিচারকের এই নিরপেক্ষতা দেখে সেই ইহুদি মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং বর্মটি খলিফাকে ফিরিয়ে দেয়।

সামাজিক নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমূলক কাজঃ যুদ্ধবিগ্রহের মাঝেও তিনি রাষ্ট্রের দুর্বল ও অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষায় কাজ করেছেন। তিনি দাস, অনাথ, বিধবা এবং বৃদ্ধদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকরা যাতে অন্যায় জুলুমের শিকার না হয় এবং তাদের উপাসনালয়গুলো যেন নিরাপদ থাকে, সে ব্যাপারে তিনি প্রাদেশিক গভর্নরদের কঠোর নির্দেশ জারি করেছিলেন।

খারেজিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিরোধ (নাহরাওয়ানের যুদ্ধ)ঃ সিফফিনের যুদ্ধের পর হিজরি ৩৮ সনে খারেজিরা যখন ইরাকের সাধারণ মানুষের ওপর রক্তক্ষয়ী অত্যাচার শুরু করে, তখন হজরত আলী (রা.) তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেন। *নাহরাওয়ানের যুদ্ধে* তিনি খারেজিদের মূল বাহিনীকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন। তবে এই যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবেই পরবর্তীতে খারেজি আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম তাঁকে শহীদ করেছিল।

যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর অনন্য মানবিক নীতিমালাঃ গৃহযুদ্ধের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও হজরত আলী (রা.) যুদ্ধের যে মানবিক নীতিমালা তৈরি করেছিলেন, তা আধুনিক আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের চেয়েও উন্নত। যুদ্ধে শত্রু পক্ষ পিছু হটলে বা পালিয়ে গেলে তাদের পেছন থেকে তাড়া বা আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। উটের যুদ্ধ এবং সিফফিনের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পরও তিনি বিরোধীদের কোনো ধন-সম্পদ বা যুদ্ধলব্ধ মাল (গনিমত) হিসেবে সৈনিকদের স্পর্শ করতে দেননি। তিনি বলেছিলেন, *"তারা আমাদেরই ভাই, কেবল আমাদের সাথে দ্বিমত করেছে।"* শত্রুপক্ষের কোনো নারী বা শিশুকে বন্দী করা বা উত্যক্ত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

কর ও রাজস্ব নীতিতে সংস্কার (কৃষকদের অধিকার)ঃ তিনি কর আদায়ের ক্ষেত্রে প্রজাদের ওপর জুলুম করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। মিশরের গভর্নর মালিক আশতার-এর কাছে লেখা তাঁর ঐতিহাসিক চিঠিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন:"ভূমি রাজস্ব (খরাজ) আদায়ের চেয়ে ভূমি ও কৃষির উন্নয়নের দিকে বেশি নজর দেবে। কারণ, জমি যদি আবাদ না হয়, তবে রাজস্ব আসবে

কোত্থেকে? আর যে শাসক প্রজাদের উন্নয়ন না করে শুধু কর আদায় করতে চায়, সে দেশকে ধ্বংস করে এবং প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।"

আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় 'শূর্তা' (পুলিশ বাহিনী) গঠনঃ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চুরি, ডাকাতি ও অভ্যন্তরীণ অপরাধ দমনের জন্য তিনি *'শূর্তাতুল খামিস'* নামে একটি বিশেষ ও অনুগত বাহিনী গঠন করেন, যা আধুনিককালের পুলিশ বা র‍্যাপিড রেসপন্স ফোর্সের মতো কাজ করত। এর মাধ্যমে তিনি কুফা ও এর আশেপাশের এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তা অধিকার রক্ষাঃ হজরত আলী (রা.) নিজে হাতে চাবুক বা লাঠি নিয়ে কুফার বাজারে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ব্যবসায়ীদের ওজনকে ঠিক রাখা, মজুদদারি (এহতেকার) না করা এবং পণ্যের দাম সহনীয় রাখার জন্য সরাসরি তদারকি করতেন। কোনো ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন।

হজরত আলী (রা.)-এর শাসনকাল ছিল মূলত *ইসলামের আদর্শিক পুনরুদ্ধার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।* শত বাধা এবং গৃহযুদ্ধের চাপের মুখেও তিনি যে প্রশাসনিক সততা, অর্থনৈতিক সাম্য এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য হয়ে আছে।

বিস্তারিত কিছু ঘটনা

রাজধানী পরিবর্তন (কুফায় স্থানান্তর)

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদর্শী রাজনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্ত ছিল। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ৩৬ হিজরিতে (৬৫৬-৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামি খেলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফা নগরীতে স্থানান্তর করেন। ততদিনে ইসলামি সাম্রাজ্য মক্কা ও মদিনার সীমানা ছাড়িয়ে পারস্য (ইরান), সিরিয়া, মিসর এবং মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিশাল এলাকায় বিস্তৃত হয়েছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে মদিনা ছিল এই বিশাল সাম্রাজ্যের এক কোণে বা প্রান্তে অবস্থিত। এর বিপরীতে *কুফা ছিল সাম্রাজ্যের একদম কেন্দ্রে।* সেখান থেকে যেকোনো দূরবর্তী প্রদেশের সাথে দ্রুত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং শাসনকার্য পরিচালনা করা অনেক সহজ ছিল।তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদত এবং তার পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিরতা মদিনার শান্ত পরিবেশকে বিঘ্নিত করেছিল।হযরত আলী (রা.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, মদিনা যদি রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বহাল থাকে, তবে ভবিষ্যতে যেকোনো গৃহযুদ্ধ বা রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে মহানবী (সা.)-এর স্মৃতিবিজড়িত এই পবিত্র নগরী এবং তার অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই *রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শহরের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে* তিনি রাজনীতিকে মদিনার বাইরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।সে সময় সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ থেকে খিলাফতের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছিল। মদিনা থেকে সিরিয়ার ওপর নজর রাখা বা সেখানে দ্রুত সেনা মোতায়েন করা কঠিন ছিল। কুফা ছিল সিরিয়া এবং দামেস্কের কাছাকাছি একটি শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি (Garrison Town) । সেখান থেকে মুয়াবিয়া (রা.)-এর যেকোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজরদারি রাখা সহজ ছিল। উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর সৃষ্ট 'উটের যুদ্ধ' বা জমলের যুদ্ধে কুফাবাসীরা হযরত আলী (রা.)-কে ব্যাপক সামরিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। মদিনার অনেক প্রভাবশালী সাহাবী তখন

রাজনীতি থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন এবং মদিনায় নতুন সৈন্য সংগ্রহের সুযোগও সীমিত ছিল। অন্যদিকে, কুফায় হযরত আলী (রা.)-এর বিপুল সংখ্যক একনিষ্ঠ সমর্থক ও বিশাল জনবল ছিল, যা একটি শক্তিশালী ও অনুগত সেনাবাহিনী গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মদিনা মূলত একটি মরুভূমিবেষ্টিত অঞ্চল ছিল, যার অর্থনীতি কৃষি ও বাণিজ্যের দিক থেকে সীমিত ছিল। একটি বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সেনা দলের রসদ ও খাদ্য সরবরাহ করার মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা তখন মদিনার ছিল না। এর বিপরীতে ইরাকের উর্বর অঞ্চল এবং কুফার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি খেলাফতের বিশাল সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ ও প্রশাসনিক খরচ বহনে অনেক বেশি উপযুক্ত ছিল।এই স্থানান্তরের ফলে কুফা টানা পাঁচ বছর (হযরত আলী রা এর শাহাদত পর্যন্ত) ইসলামি খেলাফতের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটি পরবর্তীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে ইসলামি ফিকহ ও হাদিস চর্চার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তবে ৪০ হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের পর উমাইয়া আমলে রাজধানী আবার কুফা থেকে সিরিয়ার দামেশকে স্থানান্তরিত হয়।এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পেছনে কোনো ধর্মীয় কারণ ছিল না; এটি ছিল সম্পূর্ণ একটি *রাজনৈতিক, সামরিক এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত।*

জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ

জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধ হলো ইসলামি ইতিহাসের প্রথম গৃহযুদ্ধ (প্রথম ফিতনা)-এর অন্তর্ভুক্ত অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। হিজরি ৩৬ সনের জমাদিউল আউয়াল মাসে (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে) ইরাকের বসরা নগরীর উপকণ্ঠে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের মূল সূত্রপাত হয়েছিল ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর নির্মম শাহাদতের মাধ্যমে উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পর মদিনার চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির মধ্যে হযরত আলী (রা.) চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দুটি পক্ষের দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (ইজতিহাদ)। হযরত আলী (রা.)- মনে করেছিলেন, মদিনা তথা পুরো সাম্রাজ্যে তখনো বিদ্রোহীদের দাপট ও বিশৃঙ্খলা চরমে। তাই আগে প্রশাসন গুছিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করা জরুরি, এরপর উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার (কিসাস) করা যাবে। এখনই তাড়াহুড়ো করলে রাষ্ট্র আরও বড় গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দুই মহান সাহাবি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.) মনে করেছিলেন, খলিফা হত্যার বিচার অবিলম্বে হওয়া উচিত। বিচার বিলম্বিত হলে অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে এবং উম্মাহর ক্ষতি হবে। তাঁরা খলিফার ওপর চাপ সৃষ্টি ও জনমত গঠনে বসরার দিকে রওনা হন। আধুনিক ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসগণের মতে, দুই পক্ষের কেউই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করা।হযরত আলী (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে বসরার কাছাকাছি পৌঁছানোর পর উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। হযরত আলী (রা.)-এর দূত কা'কা বিন আমর (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর শিবিরে গিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার পর উভয় পক্ষই শান্তিতে বিষয়টি মীমাংসা করতে একমত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর যুদ্ধ এড়ানোর সিদ্ধান্ত হওয়ায় সাধারণ সৈন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং রাতে যে যার তাঁবুতে ঘুমাতে যায়। শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হলে উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী ও চরমপন্থী ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী (যারা ইতিহাসে *সাবায়ী দল* বা আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী নামে পরিচিত) চরম আতঙ্কে পড়ে যায়। তারা জানত, দুই পক্ষ এক হয়ে গেলে তাদের আর রক্ষা নেই, সবার আগে তাদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।তাই যুদ্ধ বাধাতে তারা এক

জঘন্য চাল চালল।রাতের শেষভাগে কুচক্রীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়।একদল আচমকা হযরত আলী (রা.)-এর শিবিরে আক্রমণ করে এবং অন্য দল হযরত আয়েশা (রা.)-এর শিবিরে আক্রমণ চালায়।অন্ধকারের মধ্যে উভয় পক্ষই মনে করে, অপর পক্ষ তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাতের আঁধারে আক্রমণ করেছে।এই চরম ভুল বোঝাবুঝি ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের তীব্রতা যখন তুঙ্গে, তখন হযরত আয়েশা (রা.) একটি উটের পিঠে বসা হাওদায় (বিশেষ আসন) চড়ে ময়দানে আসেন, যাতে তাঁর উপস্থিতি দেখে মুসলমানরা যুদ্ধ থামায়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর উটটিকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে থাকে। তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাঁকে রক্ষা করতে তাঁর চারপাশের বিশ্বস্ত সাহাবীরা ঢাল হয়ে দাঁড়ান। একে একে প্রায় ৭০ জন বীর যোদ্ধা উটের লাগাম ধরে রাখতে গিয়ে শহীদ হন। যেহেতু যুদ্ধটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর *'উটের (আরবিতে জামাল)'* চারপাশ ঘিরে চরম আকার ধারণ করেছিল, তাই ইতিহাসে একে *'জঙ্গে জামাল' বা 'উটের যুদ্ধ'* বলা হয়। জঙ্গে জামালের চূড়ান্ত মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটের পা কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন *হযরত আলী (রা.)।* হযরত আলী (রা.) যখন নির্দেশ দেন, *"তোমরা উটটির পা কেটে দাও, কারণ ওটিই এখন যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু!"* তখন তাঁর বাহিনীর *মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.)* (তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর আপন ছোট ভাই এবং হযরত আলী (রা.)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী) ও *কাকা ইবনে আমর (রা.)* অথবা কোনো কোনো বর্ণনামতে *আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)* এগিয়ে যান।তাঁরা উটের পেছনের পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। পা কেটে দেওয়ার সাথে সাথে উটটি আলতো করে মাটিতে পড়ে যায়। উটটি মাটিতে পড়ার পরপরই যুদ্ধের উত্তেজনা দমে যায় এবং যুদ্ধ পুরোপুরি থেমে যায়।উটটি পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রা.) দ্রুত তাঁর বোন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাওদার কাছে ছুটে যান এবং বোন অক্ষত ও নিরাপদ আছেন কিনা তা নিশ্চিত করেন। এই বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কারণে সেদিন আরও বড় ধরনের রক্তপাতের হাত থেকে বহু মুসলমান রক্ষা পেয়েছিলেন। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় ১০,০০০ (মতান্তরে আরও বেশি) মুসলমান প্রাণ হারান। যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি ছিল ইসলামের দুই মহান স্তম্ভ ও আশারা মুবাশশারার (দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত) অন্তর্ভুক্ত দুই সাহাবীর শাহাদত:

হযরত তালহা (রা.): তিনি যুদ্ধ করতে চাননি, ময়দান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় মারওয়ান ইবনে হাকামের ছোড়া একটি তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

হযরত যুবাইর (রা.): হযরত আলী (রা.) যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে মদিনার দিকে রওনা হন। পথিমধ্যে আমর ইবনে জুর্মুজ নামক এক কুচক্রী নামাজরত অবস্থায় তাঁকে পেছন থেকে নির্মমভাবে শহীদ করে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) রণক্ষেত্রে গিয়ে সাহাবীদের লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে আফসোস করতে থাকেন। তিনি নিজ তত্ত্বাবধানে উভয় পক্ষের শহীদদের জানাজা পড়ান এবং যৌথ কবরে দাফনের ব্যবস্থা করেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন। আয়েশা (রা.)-এর ভাই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এবং একদল সৈন্য দিয়ে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে তাঁকে মদিনায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বিদায়বেলায় হযরত আয়েশা (রা.)-ও দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এটি কেবলই একটি ভুল বোঝাবুঝি ছিল।এটি ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের প্রথম অভ্যন্তরীণ বড় যুদ্ধ, যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি রাজনৈতিক ফাটল তৈরি করে। এই যুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধ

আরও তীব্র হয়, যা পরবর্তীতে *সিফফিনের যুদ্ধের* রূপ নেয়।ষড়যন্ত্রকারী মুনাফিক চক্র এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রমাণ করে যে, তারা খিলাফতের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তগুলোকে যেকোনো সময় প্রভাবিত করতে সক্ষম।

সিফফিনের যুদ্ধ

সিফফিনের যুদ্ধ হলো ইসলামি ইতিহাসের দ্বিতীয় এবং অন্যতম রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। হিজরি ৩৭ সনের সফর মাসে (৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ) ফোরাত নদীর তীরে 'সিফফিন' নামক একটি স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।এটি ছিল খলিফা *হযরত আলী (রা.)* এবং সিরিয়ার গভর্নর *হযরত মুয়াবিয়া (রা.)*-এর বাহিনীর মধ্যে। উটের যুদ্ধের মতোই, সিফফিনের যুদ্ধের মূলেও ছিল তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর খলিফা হত্যার বিচার (কিসাস) সংক্রান্ত মতবিরোধ। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন উসমান (রা.)-এর নিকটাত্মীয়। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের প্রতি আনুগত্য (বাইয়াত) স্বীকার করবেন না। উপরন্তু, আলী (রা.) যখন তাঁকে সিরিয়ার গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করেন, তিনি তা মানতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা.) মনে করতেন, খলিফার আনুগত্য করা সব প্রদেশের গভর্নরের জন্য বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আগে এককভাবে কোনো গোষ্ঠীর বিচার করতে গেলে রাষ্ট্র ভেঙে পড়তে পারে। তাই আগে মুয়াবিয়া (রা.)-কে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, তারপর আইনি প্রক্রিয়ায় বিচার হবে।হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য মদিনা এবং পরবর্তীতে কুফা থেকে বেশ কয়েকজন দূত পাঠিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু দুই পক্ষই নিজেদের ইজতিহাদ বা সিদ্ধান্তে অটল থাকায় রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে। ৩৬ হিজরির শেষদিকে উভয় বাহিনী সিফফিন প্রান্তরে মুখোমুখি হয়। সেখানে একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী ফোরাত নদীর ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং আলী (রা.)-এর বাহিনীর পানি পানের পথ বন্ধ করে দেয়।পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নেয়।তবে আলী (রা.) উদারতা দেখিয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনীকে পানি ব্যবহারের পূর্ণ অনুমতি দেন।এরপর জিলহজ ও মহররম মাসে যুদ্ধ বন্ধ রেখে পুনরায় শান্তি আলোচনা চলে, কিন্তু কোনো সমাধান আসেনি। অবশেষে ৩৭ হিজরির সফর মাসের শুরুতে মূল যুদ্ধ শুরু হয়।কয়েকদিন ধরে ছোটখাটো সংঘর্ষের পর যুদ্ধের তীব্রতা চরম আকার ধারণ করে। ইতিহাসের অন্যতম বীর যোদ্ধা *হযরত মালিক আশতার (রা.)* হযরত আলীর পক্ষে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।যুদ্ধের এক পর্যায়ে *'লাইলাতুল হারির'* নামক এক রাত আসে, যখন সারারাত ধরে অবিরাম যুদ্ধ চলে। তলোয়ারের ঝনঝনানি আর তীরের আঘাতে পুরো ময়দান কেঁপে উঠেছিল। এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর প্রবীণ সাহাবি *হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)* আলী (রা.)-এর পক্ষে লড়তে গিয়ে শহীদ হন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একটি ভবিষ্যৎবাণীকে সত্য প্রমাণ করে (রাসূলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, *আম্মারকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে*) । যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনী জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই সংকটময় মুহূর্তে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর প্রধান উপদেষ্টা *আমর ইবনুল আস (রা.)* একটি চতুর ও রাজনৈতিক কৌশল খাটান।তিনি সিরিয় বাহিনীর সৈন্যদের নির্দেশ দেন যেন তারা তাদের

বল্লমের মাথায় কুরআন শরিফের পাতা (বা সম্পূর্ণ নুসহা) বেঁধে উঁচিয়ে ধরে।তারা চিৎকার করে বলতে থাকে: *"আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে এই আল্লাহর কিতাবই ফয়সালা করবে। যুদ্ধ বন্ধ করুন!"*এই দৃশ্য দেখে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর একটি বড় অংশ (বিশেষ করে ক্বারীরা বা কুরআন মুখস্থকারীরা) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। তারা খলিফা আলীকে বলে, *"তারা যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকছে, আমরা আর যুদ্ধ করতে পারব না।"* হযরত আলী (রা.) এটি যুদ্ধের কৌশল হিসেবে বুঝতে পেরে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করলেও সৈন্যরা তা মানতে অস্বীকার করে। ফলে আলী (রা.) বাধ্য হয়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। যুদ্ধ বন্ধের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, তরবারি দিয়ে নয়, বরং উভয় পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি বা সালিশ (আর্বিট্রেটর) নিযুক্ত করা হবে। তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই বিরোধের মীমাংসা করবেন। একে ইতিহাসে *'তাহকিম'* বলা হয়।হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে প্রতিনিধি ছিলেন আবু মুসা আল-আশআরি (রা.) [সৈন্যদের চাপে আলী রা. তাঁকে মনোনীত করতে বাধ্য হন] । হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষে প্রতিনিধি ছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.) । এই দীর্ঘ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় *৭০,০০০ মুসলমান* শাহাদত বরণ করেন (যার মধ্যে ৪৫,০০০ সিরিয় এবং ২৫,০০০ ইরাকি বা আলীর পক্ষের সৈন্য ছিলেন)। সালিশি চুক্তি মেনে নেওয়ার কারণে হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে দলত্যাগ করে। তারা স্লোগান দেয়, *"লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ"* (আল্লাহর বিধান ছাড়া কারও ফয়সালা মানব না)। এই দলত্যাগী চরমপন্থীরাই ইতিহাসে *'খারেজি'* নামে পরিচিতি পায়, যারা পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়। এই যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা.)-এর কেন্দ্রীয় খিলাফত দুর্বল হয়ে পড়ে। সিরিয়া ও মিসর অঞ্চলের ওপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করে।

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (Battle of Nahrawan)

খারেজিদের সাথে যুদ্ধ, যা ইসলামের ইতিহাসে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। হিজরি ৩৮ সনের সফর মাসে (৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে) বর্তমান ইরাকের বাগদাদের কাছে নাহরাওয়ান নামক স্থানে খলিফা *হযরত আলী (রা.)* এবং চরমপন্থী উগ্রবাদী গোষ্ঠী *খারেজিদের* মধ্যে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। 'খারেজি' শব্দের অর্থ 'দলত্যাগী' বা 'বহির্গত'। এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল সিফফিনের যুদ্ধের সময়। সিফফিনের যুদ্ধে যখন হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী বল্লমের মাথায় কুরআন বেঁধে যুদ্ধবিরতি ও সালিশির (তাহকিম) আহ্বান জানায়, তখন হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর একদল সৈন্য (মূলত ক্বারীরা) খলিফাকে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য করে। কিন্তু যখন সালিশি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল, তখন এই দলটির চিন্তাভাবনায় অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। তারা বলতে শুরু করে, *"মানুষের তৈরি কোনো সালিশ বা ফয়সালা মানা যাবে না। বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ (লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ)।"* তারা দাবি করে, সালিশি চুক্তি মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা.) (নাউজুবিল্লাহ) *কুফরি* বা পাপ করেছেন। তারা খলিফাকে এই সিদ্ধান্ত থেকে তাওবা করার আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা.) যখন বলেন যে, তোমরাই আমাকে চুক্তি করতে বাধ্য করেছিলে এবং চুক্তি করার পর তা ভঙ্গ করা ইসলামের নিয়ম নয়, তখন প্রায় ১২,০০০ সৈন্য আলীর দল ত্যাগ করে 'হারুরা' নামক স্থানে চলে যায়। এদেরকেই ইতিহাসে *খারেজি* বলা হয়। খারেজিরা বাহ্যিকভাবে অত্যন্ত ইবাদতগুজার, পরহেজগার এবং সারারাত কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিল। কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনা ছিল চরম উগ্র ও সংকীর্ণ। তাদের মূল বিশ্বাসগুলো ছিল যে কেউ কবিরা গুনাহ (বড় পাপ) করবে, সে ইসলাম

থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে। হযরত আলী (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং সিফফিন ও উটের যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমস্ত সাহাবী (নাউজুবিল্লাহ) কাফের।তাদের এই উগ্র মতবাদের সাথে যারা একমত হবে না, সেইসব সাধারণ মুসলমানদের হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করা বৈধ (হালাল)। খারেজিরা ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার শুরু করে। তারা মহানবী (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী *হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রা.)* এবং *তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে* পথিমধ্যে আটক করে। খারেজিদের উগ্র মতবাদ না মানায় তারা এই সাহাবীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে জবেহ করে এবং তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে সন্তানকে হত্যা করে। এই জঘন্য ঘটনা পুরো মুসলিম সমাজে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। হযরত আলী (রা.) যখন সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সাধারণ জনগণ ও সাহাবীরা দাবি তোলেন যে, পেছনে খারেজিদের মতো হিংস্র ও উগ্র দলকে রেখে সিরিয়া যাওয়া নিরাপদ নয় আগে এদের দমন করা উচিত। হযরত আলী (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে নাহরাওয়ানে খারেজিদের ঘাঁটির সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি সরাসরি যুদ্ধ শুরু না করে ইসলামের চিরন্তন নিয়মে প্রথমে শান্তির পথ বেছে নেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী *হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)*-কে খারেজিদের ক্যাম্পে পাঠান আলোচনা করতে। ইবনে আব্বাসের অকাট্য দলিলের সামনে টিকতে না পেরে এবং খলিফার সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় ১২,০০০ খারেজির মধ্যে প্রায় ৮,০০০ খারেজি তাওবা করে হযরত আলীর বাহিনীতে ফিরে আসে বা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। বাকি ৪,০০০ চরমপন্থী খারেজি তাদের নেতা *আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব আল-রাসবির* নেতৃত্বে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। হযরত আলী (রা.) একটি *'নিরাপত্তা পতাকা'* উত্তোলন করে ঘোষণা করেন, *"যারা এই পতাকার নিচে আসবে বা বসরার দিকে ফিরে যাবে, তারা নিরাপদ।"* সব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর খারেজিরাই প্রথম হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর ওপর অন্ধের মতো আক্রমণ চালিয়ে বসে। খারেজিদের স্লোগান ছিল, *"চলো, দ্রুত জান্নাতে চলে যাই!"*৩৮ হিজরির সফর মাসে শুরু হওয়া এই যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র। হযরত আলী (রা.)-এর সুশৃঙ্খল ও অভিজ্ঞ বাহিনীর সামনে উগ্র খারেজিরা পাত্তাই পায়নি।খারেজিদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাবসহ প্রায় ৪,০০০ খারেজির প্রায় সবাই এই যুদ্ধে নিহত হয়।মাত্র ৮ থেকে ৯ জন খারেজি কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল।অন্যদিকে,হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর মাত্র ৭ থেকে ৯ জন সৈন্য শহীদ হয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে কয়েকজন খারেজি পালিয়ে বেঁচে গিয়েছিল, তারা গোপনে মুসলমানদের মধ্যে তাদের উগ্র মতবাদ ছড়াতে থাকে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, উম্মাহর এই সমস্যার সমাধানের জন্য হযরত আলী (রা.), হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)—এই তিন নেতাকে একসাথে হত্যা করতে হবে। খারেজিদের এই গুপ্তহত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ৪০ হিজরির ২১শে রমজান (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় *আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম* নামক এক খারেজির বিষাক্ত তলোয়ারের আঘাতে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেন।

খারেজি ফিতনার স্থায়ী রূপ: খারেজিদের এই ধারা পরবর্তীতেও পুরোপুরি শেষ হয়নি। ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে যখনই কোনো গোষ্ঠী সাধারণ মুসলমানদের কাফের ঘোষণা করে রক্তপাত ঘটিয়েছে বা উগ্রবাদের জন্ম দিয়েছে, ওলামায়ে কেরাম তাদের খারেজি বা খারেজিদের উত্তরসূরি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।রাসূলুল্লাহ (সা.) বুখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক হাদিসে এই খারেজিদের সম্পর্কে আগে থেকেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, *"শেষ জামানায় এমন একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে নির্বোধ। তারা খুব চমৎকার কথা বলবে, প্রচুর নামাজ-রোজা করবে, কিন্তু তীর যেমন ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারা তেমনি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।"* নাহরাওয়ানের যুদ্ধ ছিল সেই ভবিষ্যৎবাণীরই বাস্তব প্রতিফলন।

হযরত আলী (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা ও ইনসাফ ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না, বরং মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও বিচারক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, *"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিচারক হলেন আলী।"*

হযরত আলী (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ক) আইনের চোখে সবাই সমানঃ হযরত আলী (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থায় খলিফা, সাধারণ নাগরিক, ধনী, দরিদ্র, মুসলিম কিংবা অমুসলিম—সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য ছিল। খলিফা নিজে অপরাধী বা বিবাদী হলেও সাধারণ মানুষের মতোই আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতেন।

খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতাঃ তিনি বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রেখেছিলেন। তিনি প্রতিটি প্রদেশে অত্যন্ত সৎ, নির্ভীক এবং কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিচারক (কাজী) হিসেবে নিয়োগ দিতেন। কাজীদের তিনি নির্দেশ দিতেন যেন তারা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা স্বয়ং খলিফার চাপেও মাথা নত না করেন।

গ) কাজীদের জন্য উচ্চ বেতন ও মর্যাদাঃ বিচারকরা যাতে কোনো ধরনের লোভ বা দুর্নীতির আশ্রয় না নেন, সেজন্য হযরত আলী (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে কাজীদের জন্য *উচ্চ বেতন ও ভাতার* ব্যবস্থা করেছিলেন। এর ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী থাকতেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারতেন।

ঘ) জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি বাতিলঃ হযরত আলী (রা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করেন যে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, নির্যাতন করে বা জেলখানায় বন্দি রেখে কোনো আসামির কাছ থেকে জোর করে নেওয়া স্বীকারোক্তি আইনের চোখে বৈধ নয়।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা: খলিফা আলী ও ইহুদির বর্মের মামলাঃ হযরত আলী (রা.)-এর ইনসাফের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলো তাঁর নিজের হারানো বর্মের মামলাটি।সিফফিনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে হযরত আলী (রা.)-এর একটি মূল্যবান বর্ম হারিয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে তিনি কুফার বাজারে এক ইহুদিকে সেই বর্মটি বিক্রি করতে দেখেন। আলী (রা.) বর্মটি চিনে ফেলেন এবং বলেন, *"এটি আমার বর্ম, যা সিফফিনের পথে আমার উট থেকে পড়ে গিয়েছিল।"* ইহুদিটি তা অস্বীকার

করে বলে, *"না, এটি আমার বর্ম এবং এটি আমার কাছেই আছে।"* খলিফা হওয়া সত্ত্বেও আলী (রা.) জোর করে বর্মটি কেড়ে নেননি। তিনি সাধারণ নাগরিকের মতো ইহুদিটিকে নিয়ে তৎকালীন প্রধান কাজী *শুনাইহ (রা.)*-এর আদালতে হাজির হন। কাজী শুরাইহ খলিফাকে দেখে সম্মান জানিয়ে দাঁড়াননি, বরং সাধারণ বাদীর মতো বসতে বলেন। কাজী খলিফা আলীর কাছে বর্মটি তাঁর নিজের এর পক্ষে প্রমাণ বা সাক্ষী চাইলেন। হযরত আলী (রা.) সাক্ষী হিসেবে তাঁর ছেলে হযরত হাসান (রা.) এবং তাঁর গোলাম কাম্বর-কে হাজির করেন। কাজী শুরাইহ রায় দিলেন যে, ইসলামী আইন অনুযায়ী বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কায়)। যেহেতু খলিফা অন্য কোনো নিরপেক্ষ সাক্ষী দিতে পারেননি, তাই কাজী *ইহুদিটির পক্ষে রায়* দেন এবং বর্মটি তাকেই দিয়ে দেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক ও খলিফা হওয়া সত্ত্বেও আলী (রা.) কাজীর এই রায় হাসিমুখে মেনে নেন। এই অভূতপূর্ব ইনসাফ এবং বিচারকের নিরপেক্ষতা দেখে ইহুদিটি স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে উঠল, *"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এটি নবীদের বিচার ব্যবস্থা! খলিফা নিজে আমার বিরুদ্ধে আদালতে এলেন আর কাজী তাঁরই বিরুদ্ধে রায় দিলেন!"* ইহুদিটি তৎক্ষণাৎ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় এবং স্বীকার করে যে বর্মটি আসলেই হযরত আলীর

ছিল।

বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে হযরত আলীর ঐতিহাসিক নীতিমালাঃ হযরত আলী (রা.) মিসরের গভর্নর মালিক আশতার-এর কাছে প্রেরিত তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে (যা রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থার একটি অনন্য দলিল) বিচারক নিয়োগের জন্য কিছু স্বর্ণালী নির্দেশনা দিয়েছিলেন: *"হে মালিক! বিচারক হিসেবে এমন ব্যক্তিকে বেছে নাও, যে জনগণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। মামলার জটিলতা যাকে বিভ্রান্ত করে না, বাদীর আচরণে যে রেগে যায় না এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলে যা সংশোধন করতে যে দ্বিধা করে না। যে লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে এবং পূর্ণ সত্য উদঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেয় না।"*

মেধা ও মনস্তাত্ত্বিক বিচারঃ হযরত আলী (রা.) অনেক জটিল মামলার সমাধান করতেন মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে।যেমন, একবার দুই ব্যক্তি সফরে ছিল। একজনের কাছে ছিল ৫টি রুটি, অন্যজনের কাছে ৩টি। পথিমধ্যে এক তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দেয় এবং তারা সবাই মিলে সমান ভাগে রুটিগুলো খায়। বিদায়বেলায় তৃতীয় ব্যক্তি ৮টি দিরহাম দিয়ে যায়। ৫টি রুটির মালিক ৫ দিরহাম এবং ৩টি রুটির মালিক ৩ দিরহাম নিতে চাইলে ৫টি রুটির মালিক দাবি করে সে ৭ দিরহাম পাবে। মামলাটি হযরত আলীর কাছে আসলে তিনি গাণিতিক হিসাব করে বের করেন যে, মোট ৮টি রুটিকে ৩ ভাগ করলে হয় ২৪ টুকরো। প্রত্যেকে খেয়েছে ৮ টুকরো করে। ৫টি রুটির মালিকের ছিল ১৫ টুকরো, সে নিজে খেয়েছে ৮ টুকরো, অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছে ৭ টুকরো। আর ৩টি রুটির মালিকের ছিল ৯ টুকরো, সে নিজে খেয়েছে ৮ টুকরো, অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছে মাত্র ১ টুকরো। হযরত আলী (রা.) নিখুঁত হিসাব করে ৫টি রুটির মালিককে ৭ দিরহাম এবং ৩টি রুটির মালিককে ১ দিরহাম দেওয়ার ঐতিহাসিক রায় দেন। হযরত আলী (রা.)-এর বিচার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং কঠোর নিরপেক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ক্ষমতার কোনো প্রভাব ছিল না। উম্মাহর জন্য তাঁর এই বিচারিক আদর্শ কিয়ামত পর্যন্ত অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

কিছু ঘটনা

হযরত আলী (রা.)-এর ৫ বছরের খিলাফতকাল (৩৬ হিজরি থেকে ৪০ হিজরি) ছিল প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা এবং একই সাথে তাঁর চরম ধৈর্য ও মহত্ত্বের এক অনন্য সময়। কেবল খলিফা থাকাকালীন সময়ে তাঁর জীবনের কিছু বিখ্যাত ঘটনা হলো:

খেলাফতের শুরুতেই ভাই আকিলের অতিরিক্ত ভাতার দাবি ও জ্বলন্ত কয়লাঃ হযরত আলী (রা.) যখন খলিফা হলেন, তখন তাঁর আপন বড় ভাই আকিল ইবনে আবি তালিব (রা.) তাঁর কাছে এসে বললেন, *"ভাই, আমি খুব ঋণগ্রস্ত এবং অভাবী। রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুলমাল) থেকে আমাকে সাধারণ নাগরিকদের চেয়ে একটু বেশি ভাতা দিন।"* * খলিফা আলী (রা.) তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। রাতের অন্ধকারে তিনি ভাইয়ের হাতের কাছে একটি *জ্বলন্ত লোহার টুকরো বা কয়লা* নিয়ে গেলেন। আকিল আগুনের উত্তাপ পেয়েই চিৎকার করে হাত সরিয়ে নিলেন। তখন হযরত আলী (রা.) অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, *"হে আকিল! আপনি মানুষের জ্বালানো এই সামান্য আগুনের উত্তাপ সইতে পারছেন না। আর আমাকে বলছেন এমন কাজ করতে যা করলে কিয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর জাহান্নামের আগুনে পুড়তে হবে? খলিফা হলেও বায়তুল মালের সম্পদে আমার নিজের ভাইয়ের জন্য এক দিরহামও বেশি দেওয়ার অধিকার নেই।"*

খলিফার ছেঁড়া জামা এবং ছেঁড়া জুতো সেলাইঃ তিনি যখন সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা, যার অধীনে পারস্য থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত, তখনও তাঁর জীবনযাপন ছিল একজন অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষের মতো। একবার বিশিষ্ট সাহাবী *হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)*

খলিফার তাবুতে এসে দেখলেন, খলিফা আলী (রা.) বসে বসে তাঁর নিজের একটি ছেঁড়া জুতো সেলাই করছেন। *ইবনে আব্বাস (রা.)* অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলে হযরত আলী (রা.) জুতোটি উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, *"ইবনে আব্বাস! তোমার মতে এই ছেঁড়া জুতোটার দাম কত হতে পারে?"* ইবনে আব্বাস বললেন, *"এর তো কোনো মূল্যই নেই!"* * তখন খলিফা আলী (রা.) বললেন, *"আল্লাহর কসম! আমার কাছে এই ছেঁড়া জুতোটার মূল্য এই বিশাল সাম্রাজ্যের খিলাফতের চেয়েও বেশি, যদি না আমি এই খিলাফতের মাধ্যমে সমাজে ইনসাফ কায়েম করতে পারি এবং জুলুম বন্ধ করতে পারি।"*

রাতের আঁধারে পিঠে আটার বস্তা বয়ে বেড়ানোঃ খলিফা থাকাকালীন সময়ে হযরত আলী (রা.)-এর প্রধান অভ্যাস ছিল—রাতের বেলা যখন পুরো কুফা নগরী ঘুমিয়ে পড়ত, তিনি ছদ্মবেশে একাকী কুফার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি নিজের পিঠে *আটার বস্তা এবং খেজুরের থলে* বহন করে নিয়ে যেতেন এবং কুফার দরিদ্র, বিধবা ও এতিমদের দরজায় দরজায় খাবার রেখে আসতেন। কেউ যেন জানতে না পারে যে খলিফা নিজে এই কাজ করছেন, তাই তিনি পরিচয় গোপন রাখতেন। তাঁর শাহাদতের পর যখন এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন কুফাবাসী বুঝতে পেরেছিল যে রাতের আঁধারে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া সেই ব্যক্তিটি আর কেউ নন, স্বয়ং খলিফা আলী (রা.) ছিলেন। আর তাঁর পিঠে আটার বস্তা বহনের কারণে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল।

উটের যুদ্ধের পর 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ' (গনিমত) বাজেয়াপ্তের নিষেধাজ্ঞাঃ জঙ্গে জামাল বা উটের যুদ্ধে যখন হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনী জয়ী হলো, তখন তাঁর সেনাবাহিনীর কিছু লোক দাবি করল যে, পরাজিত বাহিনীর সমস্ত ধন-সম্পদ এবং বন্দিদের 'যুদ্ধলব্ধ মাল' বা গনিমত হিসেবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হোক।খলিফা আলী (রা.) এই অন্যায় দাবি কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, *"কখনোই নয়! তারা আমাদের ভাই, কেবলই একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে আজ আমাদের মুখোমুখি হয়েছে। তারা কাফের নয় যে তাদের সম্পদ বা নারীদের বন্দি করা যাবে।"*সৈন্যদল যখন হট্টগোল শুরু করল, তখন তিনি তাদের চুপ করিয়ে একটি মোক্ষম প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: *"ঠিক আছে, তোমরা যদি গনিমত ভাগ করতে চাও, তবে বলো তোমাদের উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা রা.) কার ভাগে পড়বেন? কার সাহস আছে মায়ের ওপর হাত তোলার?"* * খলিফার এই চড়থাপ্পড়ের মতো যুক্তির সামনে পুরো সেনাবাহিনী স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে।

কুফার বাজারে নিজের দাসকে ভালো জামা কিনে দেওয়াঃ একবার খলিফা আলী (রা.) তাঁর খাদেম বা দাস কাম্বরকে সাথে নিয়ে কুফার কাপড়ের বাজারে গেলেন। তিনি সাড়ে চার দিরহাম দিয়ে দুটি জামা কিনলেন। একটি জামা ছিল অত্যন্ত চমৎকার ও দামি, আর অন্যটি ছিল সাধারণ। তিনি দামি ও সুন্দর জামাটি তাঁর দাস কাম্বরকে দিয়ে বললেন, *"এটি তুমি পরো।"* কাম্বর লজ্জিত হয়ে বলল, *"আমিরুল মুমিনীন, আপনি খলিফা, এই সুন্দর জামাটি আপনার গায়েই বেশি মানায়।"* খলিফা আলী (রা.) মুচকি হেসে বললেন, *"না কাম্বর, তুমি তরুণ ছেলে। তরুণদের সুন্দর ও রঙিন পোশাক পরার শখ থাকে। আর আমার বয়স হয়েছে, সাধারণ জামাটিই আমার জন্য যথেষ্ট।"*
খলিফা থাকাকালীন সময়ে হযরত আলী (রা.) ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু মনে করেননি, বরং একে আল্লাহর দেওয়া একটি কঠিন আমানত মনে করে অক্ষরে অক্ষরে ইনসাফ কায়েম করে গেছেন।

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের পদক্ষেপসমূহ

হযরত আলী (রা.) তাঁর পরের খলিফা কে হবেন, তা নিজে ঠিক করে যাননি। তিনি খিলাফতের উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম উম্মাহর পরামর্শ (শুরা) এবং জনগণের

মতামতের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) যখন খারেজি ঘাতকের তরবারির আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে শয্যাশায়ী, তখন কুফার মুসলমানরা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবীরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন: *"হে আমিরুল মুমিনীন! আপনার পর আমরা কি আপনার বড় ছেলে হযরত হাসান (রা.)-এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করব? আপনি কি তাঁকে আমাদের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাচ্ছেন?"*হযরত আলী (রা.) এর উত্তরে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন: *"আমি তোমাদের এই বিষয়ে কোনো আদেশও দিচ্ছি না, আবার নিষেধও করছি না। তোমরা মুসলমানদের অবস্থা ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে যা ভালো মনে হয়, তা-ই করো।"* তিনি আরও বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচন জনগণের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিও ঠিক সেই পথই অনুসরণ করতে চান।

কেন তিনি নিজে কাউকে মনোনীত করেননি? ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-কে জনগণ সরাসরি নির্বাচিত করেছিল। হযরত আলী (রা.) মনে করেছিলেন, খিলাফত কোনো রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক রাজত্ব নয় যে বাবা তাঁর ছেলেকে খলিফা বানিয়ে যাবেন।তিনি জানতেন তাঁর ছেলে হযরত হাসান (রা.) অত্যন্ত যোগ্য এবং মহানবী (সা.)-এর অত্যন্ত আদরের দৌহিত্র। কিন্তু খলিফা হিসেবে নিজের ছেলেকে নিজে মনোনয়ন দিলে তা একটি নতুন এবং ভুল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, যা পরবর্তীতে রাজতন্ত্রের রূপ নিতে পারে। যদিও ৪০ হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের পর, কুফা এবং খেলাফতের বাকি অঞ্চলের মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমবেত হয়ে *হযরত হাসান (রা.)*-কে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানান এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ইসলামের পঞ্চম খলিফা হন। তবে হযরত হাসান (রা.) মাত্র ৬ মাস শাসন করার পর মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত চিরতরে বন্ধ করার জন্য এক যুগান্তকারী ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে একটি শান্তি চুক্তি করে স্বেচ্ছায় খিলাফতের পদ ছেড়ে দেন, যা ইসলামের ইতিহাসে *"আমুল জামায়াত"* বা *'ঐক্যের বছর'* নামে পরিচিত।

ওফাত বা শাহাদতের

হযরত আলী (রা.)-এর ওফাত বা শাহাদতের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক কালো অধ্যায়গুলোর একটি। হিজরি ৪০ সনের ২১শে রমজান (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ) তিনি কুফা নগরীতে শাহাদত বরণ করেন। উগ্রপন্থী খারেজিদের একটি পূর্বপরিকল্পিত ও নৃশংস গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তিনি। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজিরা হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এবং মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক সংকট দূর করার এক অদ্ভুত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে তিনজন খারেজি মক্কায় গোপনে মিলিত হয়ে একটি ভয়াবহ পরিকল্পনা করে। তাদের পরিকল্পনা ছিল—ইসলামের তিনজন প্রধান নেতা হযরত আলী (রা.) [কুফায়], হযরত মুয়াবিয়া (রা.) [সিরিয়ায়], এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) [মিসরে]। একই দিনে, একই সময়ে (ফজরের নামাজে) হত্যা করা হবে। এই পরিকল্পনায় হযরত আলী (রা.)-কে হত্যার দায়িত্ব নেয় *আব্দুর রহমান ইবনে মুলাজিম* নামক এক চরমপন্থী খারেজি। সে কুফায় এসে গোপনে বিষাক্ত তলোয়ার তৈরি করে এবং আলী (রা.)-এর ওপর হামলার সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

উল্লেখ্য, বাকি দুই খারেজি সিরিয়া ও মিসরে হামলা চালালেও তলোয়ারটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হযরত মুয়াবিয়া তাঁর মাথায় না লেগে তাঁর উরুতে বা কোমরের নিচের অংশে আঘাত করে বলে বেঁচে যান ও আমর ইবনুল আস তীব্র পেটের ব্যথার কারণে তিনি সেদিন ফজরের নামাজ পড়াতে মসজিদে যেতে না পারায় তাঁর পরিবর্তে কুফার তৎকালীন প্রধান

বিচারপতি এবং বসরার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী প্রবীণ সাহাবী ***হযরত খারিজা ইবনে হুজাফা (রা.)*** *গেলে তাকে ভুলে জামাত পড়ানো অবস্থায় তরবারি দিয়ে আঘাত করে নির্মমভাবে শহীদ করে।*

৪০ হিজরির ১৯শে রমজান শুক্রবারের ফজরের নামাজের সময় ঘাতক ইবনে মুলজিম কুফার কেন্দ্রীয় মসজিদে এসে সাধারণ মুসল্লিদের সাথে ওত পেতে বসে থাকে। হযরত আলী (রা.) প্রতিদিনের মতো শেষ রাতে মসজিদে আসেন এবং উচ্চস্বরে *"আস-সালাহ, আস-সালাহ"* (নামাজে এসো, নামাজে এসো) বলে মানুষদের নামাজের জন্য ডাকতে থাকেন। তিনি যখন নামাজে সেজদারত অবস্থায় ছিলেন (মতান্তরে, জামাত শুরু হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে), তখন ইবনে মুলজিম আচমকা অন্ধকার থেকে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে। সে তার হাজারো দিরহাম খরচ করে বানানো *তীব্র বিষে চুবানো তলোয়ার* দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর পবিত্র মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে। তলোয়ারের আঘাতটি তাঁর কপাল ভেদ করে মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আঘাত পাওয়ার সাথে সাথে খলিফার কপাল বেয়ে রক্তে তাঁর দাড়ি লাল হয়ে যায়। এই চরম সংকটেও তাঁর মুখ থেকে ইসলামের মহান বাণী বের হয়েছিল। তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন*:"ফুততু ওয়া রাব্বিল কা'বাহ!" (কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়ে গেলাম!)* মসজিদের ভেতর হট্টগোল শুরু হলে মুসল্লিরা ঘাতক ইবনে মুলজিমকে ধরে ফেলেন এবং বেঁধে খলিফার সামনে হাজির করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী আলী (রা.) লক্ষ্য করলেন ঘাতকের হাত শক্ত করে বাঁধা এবং সে ভয়ে কাঁপছে।তখন তিনি তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসান (রা.)-কে ডেকে বলেন, *"হে হাসান! ও একজন বন্দি, ওর প্রতি দয়া করো। ওর বাঁধন আলগা করে দাও এবং ওকে ভালো খাবার ও পানি দাও। আমি যদি বেঁচে যাই, তবে ওর ফয়সালা আমি নিজেই করব। আর আমি যদি মারা যাই, তবে তোমরা তাকে কেবল একটি আঘাতের বদলে একটিই আঘাত করবে (কিসাস)। প্রতিশোধের আগুনে অন্ধ হয়ে তার অঙ্গহানি করবে না।"*

চূড়ান্ত মুহূর্ত ও ওফাত (২১শে রমজান, ৪০ হিজরি)ঃ বিষাক্ত তলোয়ারের তীব্র বিষের কারণে হযরত আলী (রা.)-এর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। চিকিৎসকরা এসে পরীক্ষা করে জানান যে, বিষ তাঁর পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর বাঁচার কোনো আশা নেই।জীবনের শেষ দুই দিন তিনি সন্তানদের এবং মুসলিম উম্মাহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু অসিয়ত (উপদেশ) করেন: *সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকবে। এতিম ও প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় থাকবে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়বে এবং নামাজকে আঁকড়ে ধরবে। নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও রক্তপাত বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ থাকবে।* অবশেষে ১৯শে রমজান আক্রান্ত হওয়ার পর, ২১শে রমজান ৪০ হিজরি রাতে ইসলামের এই মহান সিংহ, জ্ঞানের শহর, এবং মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৩ বছর।

জানাজা, দাফন ও মাজার শরীফ (গোপন রাখার কারণ)

হযরত আলী (রা.)-এর জানাজা ও দাফনের বিষয়টি অত্যন্ত গোপনে সম্পন্ন করা হয়েছিল। তিনি নিজেই অসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তাঁর কবর যেন গোপন রাখা হয়। কারণ, উগ্র খারেজিরা তাঁর প্রতি এতটাই বিদ্বেষী ছিল যে, তারা সুযোগ পেলে তাঁর পবিত্র লাশ কবর থেকে বের করে অপমান করার চেষ্টা করতে পারত।তাঁর দুই ছেলে হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.) রাতের

অন্ধকারে কুফার বাইরে তাঁর জানাজা পড়েন এবং দাফন করেন। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী, তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন তাঁর বড় ছেলে *হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)* বহু বছর পর্যন্ত তাঁর কবরের স্থান সাধারণ মানুষের কাছে গোপন ছিল।পরবর্তীতে আব্বাসীয় আমলে এবং ইমাম জাফর সাদিক (রহ.)-এর যুগে প্রকাশ পায় যে, বর্তমান *ইরাকের নাজাফ* শহরেই ইসলামের এই মহান খলিফাকে দাফন করা হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে তাঁর একটি বিশাল ও সুন্দর মাজার শরিফ (রওজা মোবারক) রয়েছে। হযরত আলী (রা.)-এর ওফাতের মাধ্যমে *ইসলামের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদীন'-এর স্বর্ণালী ৩০ বছরের* যুগের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

এক নজরে হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতে ইসলামের প্রধান উন্নতিসমূহ

ইসলামি বিচার ব্যবস্থার পূর্ণ স্বাধীনতা: শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে মুক্ত করে কাজীদের (বিচারক) জন্য উচ্চ বেতন নির্ধারণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গড়ে তোলা হয়।

আইনের চোখে শাসকের সমতা প্রতিষ্ঠা: খলিফা নিজে সাধারণ নাগরিকের সাথে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ইসলামের ইতিহাসে 'আইনের চোখে সবাই সমান'—এই নীতির চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করেন।

মানবিক যুদ্ধনীতির প্রবর্তন: মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পলায়নপর শত্রুকে আঘাত না করা এবং নারীদের বন্দি না করার মতো যুগান্তকারী ও মানবিক যুদ্ধনীতি তৈরি হয়।

মানবাধিকার ও বন্দি অধিকার সুরক্ষা: ভয়ভীতি বা নির্যাতন করে জোরপূর্বক নেওয়া স্বীকারোক্তিকে আইনের চোখে অবৈধ ঘোষণা করে বন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণের নিয়ম চালু।

কৌশলগত রাজধানী স্থানান্তর: খিলাফতের প্রশাসনিক কাজ ও আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ সহজ করতে রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করা হয়, যা দূরদর্শী সামরিক উন্নতি ছিল।

উগ্রবাদ ও চরমপন্থা দমন: ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে কাফের ঘোষণাকারী ও রক্তপাত সৃষ্টিকারী উগ্র 'খারেজি ফিতনা' কঠোরভাবে দমন করে ইসলামের মূল ধারা রক্ষা করা হয়।

জ্ঞান ও ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ: খলিফার নিজস্ব প্রজ্ঞা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কুফা নগরী ইসলামি ফিকহ (আইনশাস্ত্র), হাদিস এবং ইলমে দ্বীনের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আরবি ব্যাকরণ (নাহব) শাস্ত্রের সূচনা: অমুসলিমদের কুরআন পাঠের সুবিধার্থে হযরত আলীর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্র আবু আসওয়াদ আদ-দুয়ালি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম *আরবি ব্যাকরণ* রচনা করেন।

বায়তুল মালের সুষম বণ্টন: রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ কোনো স্বজনপ্রীতি বা সামাজিক ভেদাভেদ ছাড়াই সমাজের ধনী-দরিদ্র সবার মাঝে নিখুঁতভাবে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করার প্রথা জোরদার করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা ও ছদ্মবেশী সেবা: খলিফা নিজে রাতের আঁধারে পিঠে খাবারের বস্তা বহন করে দরিদ্র, এতিম ও বিধবাদের ঘরে ঘরে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমাজকল্যাণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি (Code of Conduct): তিনি মিসরের গভর্নর মালিক আশতারের কাছে যে ঐতিহাসিক চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, তা মূলত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামের প্রথম লিখিত প্রশাসনিক ও নৈতিক নীতিমালা (যাকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনন্য দলিল ধরা হয়)

দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্রের অবসান: তিনি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা সাধারণ মানুষের সাথে কোনো পর্দা বা দূরত্ব বজায় না রাখেন, যাতে নাগরিকরা সরাসরি খলিফা বা গভর্নরের কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন।
বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ভোক্তা অধিকার: খলিফা নিজে চাবুক হাতে কুফার বাজারে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে কোনো ব্যবসায়ী ওজনে কম দিতে না পারে, ভেজাল মিশাতে না পারে বা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়াতে না পারে।
সংখ্যালঘু ও অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা: জিম্মি বা অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাকে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের ওপর কোনো ধরনের জুলুম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।
ট্যাক্স বা কর ব্যবস্থার সংস্কার: তিনি কৃষকদের ওপর থেকে করের বোঝা কমিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, জমি চাষযোগ্য করার ও উৎপাদনের উন্নতির ওপর ভিত্তি করে যেন কর নির্ধারণ করা হয়, জোর করে যেন আদায় না করা হয়।

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল থেকে শিক্ষণীয়

ইনসাফ ও সমতা: আইনের চোখে শাসক, সাধারণ নাগরিক এবং অমুসলিম—সবাই সমান, যার অনন্য উদাহরণ খলিফা আলীর নিজের বর্মের মামলা।
বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: বিচার ব্যবস্থাকে শতভাগ স্বাধীন ও চাপমুক্ত রাখতে হবে এবং বিচারকদের জন্য উচ্চ সম্মানী নিশ্চিত করতে হবে।
ক্ষমতার মোহহীনতা: ক্ষমতা ভোগ-বিলাসের বস্তু নয়, বরং সমাজে ন্যায়বিচার কায়েম করার একটি কঠিন আমানত ও দায়িত্ব।
মানবিক যুদ্ধনীতি: যুদ্ধক্ষেত্রেও নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে; কোনো পলায়নপর বা বন্দী শত্রুর ওপর আঘাত করা এবং নারীদের বন্দি করা যাবে না।
উগ্রবাদ দমন: ধর্মের নামে যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা, উগ্রতা ও সাধারণ মানুষকে কাফের ঘোষণা করে রক্তপাত ঘটায়, তাদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।
স্বীকারোক্তির বৈধতা: ভয়ভীতি দেখিয়ে, নির্যাতন করে বা জেলখানায় আটকে রেখে জোরপূর্বক নেওয়া স্বীকারোক্তি আইনের চোখে সম্পূর্ণ অবৈধ।
স্বজনপ্রীতি বর্জন: রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা বায়তুল মালের ওপর নিজের আপন ভাই বা পরিবারেরও অতিরিক্ত কোনো অধিকার নেই।
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ: খিলাফত বা নেতৃত্ব কোনো রাজতন্ত্র নয়, বরং তা জনগণের মতামত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে (শুরা পদ্ধতি) নির্ধারিত হওয়া উচিত।
উদারতা ও ক্ষমা: চরম রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত শত্রুকেও প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে, যা তিনি উটের যুদ্ধের পর করেছিলেন।
জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ: সমাজ ও রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে তরবারির চেয়ে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ফিকহচর্চাকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে।
ব্যক্তিগত রাগের ঊর্ধ্বে থাকা: মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করার সময় নিজের অহংকার বা ব্যক্তিগত ক্ষোভকে দূরে রাখতে হবে, যেমনটি তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখে থুথু দেওয়ার পর তরবারি থামিয়ে দেখিয়েছিলেন।
বিপদের মুখেও নীতিতে অবিচল থাকা: চারপাশের মানুষ বা পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, সততা এবং ন্যায়ের পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়া যাবে না।

নেতৃত্বের জবাবদিহিতা: নেতা বা শাসক মানেই সাধারণ মানুষের সেবক, যিনি রাতের আঁধারে জনগণের দুঃখ-কষ্টের খোঁজ নিতে নিজে আটার বস্তা পিঠে বহন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।
সরল জীবনযাপন: বিপুল ক্ষমতা ও রাজকোষের চাবিকাঠি হাতে থাকার পরও নিজের ছেঁড়া জুতো ও জামা নিজে সেলাই করে বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে পাওয়া যায়।
পরম শত্রুর প্রতিও দয়া: মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের ঘাতকের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য দুধের বাটি এগিয়ে দেওয়া এবং তার প্রতি মানবিক আচরণ করার যে নজির তিনি রেখেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।
ধৈর্য ও সহনশীলতা: নিজের দলের মানুষের অবাধ্যতা ও একের পর এক রাজনৈতিক সংকটের মুখেও চরম ধৈর্য (সবর) ধারণ করে উম্মাহর ঐক্য ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছেন তিনি।

আলী (রা.)-এর খিলাফতের গুরুত্ব

হযরত আলী (রা.)-এর ৫ বছরের (৩৬-৪০ হিজরি) খিলাফতকাল ছিল ইসলামি শাসনব্যবস্থায় নীতি, ইনসাফ এবং আদর্শ ধরে রাখার এক অনন্য সংগ্রাম। এই সময়ে তিনি খিলাফতকে কোনো রাজতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক শাসনে রূপ নিতে দেননি, বরং চরম রাজনৈতিক সংকটের মুখেও মজলিস-উশ-শূরার (পরামর্শভিত্তিক) গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রেখেছিলেন। প্রশাসনিক ও কৌশলগত সুবিধার্থে তিনি খিলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফায় স্থানান্তর করেন, যা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয়তা রক্ষা করে। তাঁর আমলে আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এক অভূতপূর্ব উচ্চতায় পৌঁছায়, যেখানে খলিফা নিজে সাধারণ অমুসলিম নাগরিকের সাথে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি, কাজীদের জন্য উচ্চ বেতন কাঠামো নির্ধারণ করে দুর্নীতিমুক্ত বিচার নিশ্চিত করেন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আসামির স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করেন। জঙ্গে জামাল ও সিফফিনের মতো বেদনাদায়ক গৃহযুদ্ধগুলোতে তিনি পলায়নপর শত্রুকে আঘাত না করা, শত্রুপক্ষের নারী-শিশুদের বন্দি না করা এবং বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম প্রতিপক্ষের সম্পদকে 'গনিমত' বা যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে লুণ্ঠন করতে না দেওয়ার মতো যুগান্তকারী ও মানবিক যুদ্ধনীতি প্রবর্তন করেন। এছাড়া, ধর্মের নামে উগ্রপন্থী 'খারেজি ফিতনা' কঠোরভাবে দমন করে তিনি মুসলিম উম্মাহকে চরমপন্থার বিরুদ্ধে চিরন্তন দিকনির্দেশনা দেন এবং তাঁর শাসনকালেই কুফা নগরী ইসলামি ফিকহ, হাদিস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়; ফলে তাঁর খিলাফত ক্ষমতার মোহহীনতা এবং প্রতিকূল পরিবেশেও তাকওয়া ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকার এক শাশ্বত আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীন এর গুরুত্ব

খোলাফায়ে রাশেদীন বা ইসলামের প্রথম চার খলিফার (হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী রা.) শাসনকালকে ইসলামের ইতিহাসে **"স্বর্ণযুগ"** বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর ৩০ বছর (১১ হিজরি থেকে৪০ হিজরি) স্থায়ী এই শাসনব্যবস্থা কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং গোটা পৃথিবীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনন্য আদর্শ। রাসুলুল্লাহ (সা.) যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, তা কেবল আরবের মক্কা-মদিনায় সীমাবদ্ধ ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। রোমান ও পারস্যের মতো তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তিগুলোকে পরাজিত করে ইসলামি রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের একাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যুগের। হযরত আবু বকর (রা.)-এর আমলে সাহাবিদের পরামর্শে পবিত্র কুরআনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলো একত্র করে প্রথম গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা.)-এর আমলে এর

একটি আদর্শ কপি তৈরি করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে আজ আমরা হুবহু একই কুরআন তিলাওয়াত করতে পারছি। আজকের আধুনিক রাষ্ট্রে আমরা যেসব প্রশাসনিক কাঠামো দেখি (যেমন: পুলিশ বিভাগ, আদালত, গোয়েন্দা সংস্থা, ডাক বিভাগ, লিখিত রেজিস্টার খাতা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বাইতুল মাল), তার সিংহভাগই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতের আমলে।

খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে আমাদের শিক্ষা

চার খলিফার জীবন ও শাসনপদ্ধতি থেকে বর্তমান সমাজ ও ব্যক্তির জন্য অসংখ্য শিক্ষা রয়েছে।

জবাবদিহিতা ও সুশাসনঃ ক্ষমতা কোনো ভোগের বস্তু নয়, বরং এটি একটি কঠিন আমানত এই শিক্ষা তারা হাতে-কলমে দিয়ে গেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, *"আমি ভালো কাজ করলে আমাকে সাহায্য করবেন, আর ভুল করলে সোজা করে দেবেন।"* শাসক বা নেতা সর্বসাধারণের ঊর্ধ্বে নন এবং তাকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে—এটিই ইসলামের মূল সুশাসন।

চরম সাদাসিধে জীবন ও বিলাসিতা বর্জনঃবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও চার খলিফার কারো কোনো রাজপ্রাসাদ, বডিগার্ড বা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ছিল না। হযরত ওমর (রা.) যখন জেরুজালেম বিজয় করতে যান, তখন তাঁর উটের পিঠে বসার পালা ছিল তাঁর গোলামের, আর খলিফা নিজে উটের রশি ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বর্তমান যুগের নেতাদের জন্য এটি এক চরম শিক্ষা যে, ক্ষমতার মূল সৌন্দর্য বিলাসিতায় নয়, সাধারণ মানুষের কাতারে নামার মধ্যে।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের চোখে সমতাঃ আইনের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র, মুসলিম অমুসলিম সবাই যে সমান, তা খিলাফতে রাশেদার যুগে কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। হযরত আলী (রা.)-এর একটি মূল্যবান বর্ম চুরি হওয়ার পর তিনি খলিফা হওয়া সত্ত্বেও নিজে আদালতে গিয়ে একজন সাধারণ ইহুদির বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। সাক্ষ্যপ্রমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় বিচারক খলিফার বিপক্ষে এবং ইহুদির পক্ষে রায় দেন। এই বিচার দেখে সেই ইহুদি মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ চার খলিফার কেউই একক সিদ্ধান্তে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ চালাননি। তারা প্রতিটি বড় বিষয়ে সাহাবিদের নিয়ে গঠিত পরামর্শ সভার (শূরা) মতামত নিতেন। নেতা যত বড় জ্ঞানী বা ক্ষমতাবানই হোন না কেন, তাকে দল বা সমাজের অন্য স্তরের মানুষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একনায়কতন্ত্র ইসলামের চেতনা পরিপন্থী।

অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার রক্ষাঃ বিজিত অঞ্চলের অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) যখন জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করেন, তখন স্পষ্ট লিখে দিয়েছিলেন যে, তাদের গির্জা ভাঙা হবে না, তাদের ক্রুশ ধ্বংস করা হবে না এবং ধর্মের ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো জোর-জবরদস্তি করা হবে না।

এক নজরে চার খলিফার বিশেষ অবদান ও শিক্ষা

হযরত আবু বকর (রা.)

বিশেষ অবদান: মুরতাদ ও ভণ্ড নবীদের দমন, কুরআন একত্রীকরণ।

আমাদের জন্য মূল শিক্ষা: সংকটের মুহূর্তে দৃঢ়তা এবং ন্যায়ের পথে আপসহীনতা।

হযরত ওমর (রা.)

বিশেষ অবদান: প্রশাসনিক সংস্কার, হিজরি সন প্রবর্তন, বিচার বিভাগ গঠন।

আমাদের জন্য মূল শিক্ষা: কঠোর শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা এবং গভীর মানবিকতা।

হযরত ওসমান (রা.)

বিশেষ অবদান: কুরআনের প্রমিত সংস্করণ তৈরি, নৌবাহিনী গঠন।

আমাদের জন্য মূল শিক্ষা: চরম লজ্জাশীলতা, উদারতা এবং দানশীলতা।

হযরত আলী (রা.)

বিশেষ অবদান: অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা।

আমাদের জন্য মূল শিক্ষা: বীরত্ব, গভীর ইলম (জ্ঞান) এবং ধৈর্য।

খোলাফায়ে রাশেদীনের মূল শিক্ষা হলো—*"শাসন ক্ষমতা মানেই জনগণের সেবক হওয়া।"* আজকের পৃথিবীতে আমরা যদি শান্তি, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ এবং প্রকৃত সুশাসন ফিরিয়ে আনতে চাই, তবে জাতিসংঘ বা পশ্চিমা কোনো মডেলের অন্ধ অনুকরণ করার চেয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের এই সোনালী নীতিগুলোকে ধারণ করাই সবচেয়ে বড় বাস্তবতা।

শাসক, রাষ্ট্রনায়ক বা নেতার জন্য শিক্ষা

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল এবং ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসে একজন শাসক, রাষ্ট্রনায়ক বা নেতার জন্য অত্যন্ত যুগান্তকারী এবং চিরন্তন কিছু শিক্ষা রয়েছে। বর্তমান যুগে কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সমাজের যেকোনো স্তরের নেতা যদি সফল ও জনপ্রিয় হতে চান, তবে তাঁর জন্য নিচের ৭টি শিক্ষা মেনে চলা অপরিহার্য:

১. ক্ষমতা উপভোগের বস্তু নয়, একটি কঠিন পরীক্ষাঃ ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনে ক্ষমতা কোনো অধিকার বা বিলাসের মাধ্যম নয়, বরং এটি আল্লাহ এবং জনগণের পক্ষ থেকে একটি বিশাল *আমানত*। একজন প্রকৃত শাসক কখনোই ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ হবেন না। তাকে মনে রাখতে হবে, আজ তিনি যে চেয়ারে বসে আছেন, কাল সেখানে অন্য কেউ আসবে। সবচেয়ে বড় কথা, পরকালে তাকে তাঁর প্রজাদের প্রতিটি অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।"* (বুখারী)

২. জনগণের সেবক হওয়াঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শাসকরা নিজেদের 'রাজা' মনে করতেন না, বরং জনগণের 'খাদেম' বা সেবক মনে করতেন। একজন প্রকৃত নেতার কাজ হলো জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া, জনগণকে তাঁর কাছে ভিক্ষুকের মতো লাইনে দাঁড় করানো নয়। হযরত ওমর (রা.) রাতের আঁধারে ছদ্মবেশে মদিনার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতেন যেন কোনো নাগরিক ক্ষুধার্ত বা কষ্টে না থাকে। শাসককে হতে হবে জনবান্ধব এবং সহজে সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করার মতো উন্মুক্ত চরিত্রের।

৩. আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়ঃ একটি রাষ্ট্রের পতনের মূল কারণ হলো আইনের দ্বিমুখী নীতি—অর্থাৎ ধনীদের জন্য এক আইন আর গরিবদের জন্য আরেক আইন। শাসক নিজে বা তাঁর পরিবারের কেউ অপরাধ করলেও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সাজা নিশ্চিত করতে হবে। হযরত ওমর (রা.)-এর নিজের ছেলে যখন অপরাধ করেছিলেন, খলিফা আইনের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করেননি। আইনের চোখে পক্ষপাতহীনতাই একটি রাষ্ট্রকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

৪. স্বৈরাচারী মানসিকতা বর্জন এবং 'শূরা' (পরামর্শ) পদ্ধতিঃ একনায়কতন্ত্র বা নিজের ইচ্ছা সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইসলামের নীতি নয়। একজন আদর্শ শাসক যতই বুদ্ধিমান

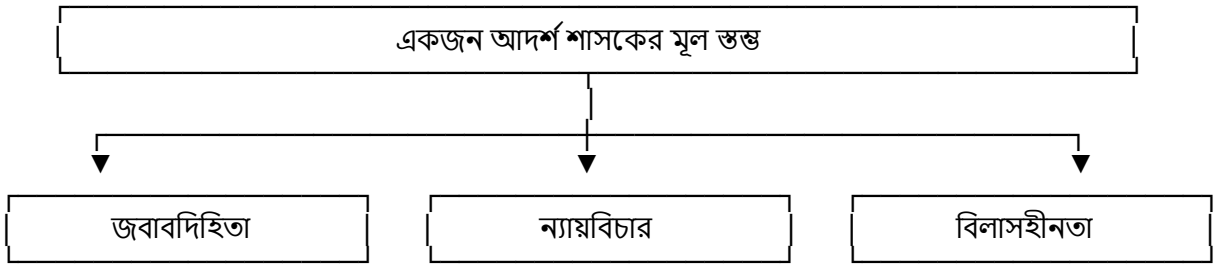
হোন না কেন, রাষ্ট্রীয় বড় বড় সিদ্ধান্তে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং গুণীজনদের সাথে পরামর্শ করবেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মহিলারাও মসজিদে দাঁড়িয়ে খলিফার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে পারতেন এবং খলিফারা আনন্দের সাথে নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিতেন। গঠনমূলক সমালোচনা শোনার ধৈর্য শাসকের থাকতে হবে।

৫. রাষ্ট্রীয় সম্পদের সততা ও বিলাসিতা বর্জনঃ বর্তমান যুগে দেখা যায়, ক্ষমতায় যাওয়ার পর শাসকরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন এবং রাষ্ট্রীয় তহবিল (ট্যাক্সের টাকা) নিজেদের স্বার্থে অপচয় করেন। রাষ্ট্রীয় তহবিল বা জনগণের ট্যাক্সের টাকা আমানত হিসেবে রক্ষা করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হওয়ার পর বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে কেবল একজন সাধারণ মজুরের সমান ভাতা নিতেন, যাতে তাঁর পরিবার কোনোমতে চলতে পারে। শাসকের জীবনযাত্রা যত সাধারণ হবে, রাষ্ট্রে দুর্নীতি তত কমবে।

৬. সংখ্যালঘুদের অধিকার ও জানমালের নিরাপত্তাঃ একটি দেশের প্রকৃত অগ্রগতি নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘুরা কতটা নিরাপদ, তার ওপর। ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন মতাদর্শের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা শাসকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাদের উপাসনালয়, সম্পদ এবং জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে। অমুসলিমদের ওপর জোরপূর্বক নিজের আদর্শ বা সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

৭. যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ (মেরিটোরিওক্রেসি)ঃ স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ বা ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালে পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। যেকোনো প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দেওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হতে হবে *যোগ্যতা, সততা ও দক্ষতা।* নিজের আত্মীয় বা দলের লোক হলেই তাকে বড় পদ দেওয়া যাবে না। হযরত ওমর (রা.) গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোর নীতি অবলম্বন করতেন এবং প্রতিনিয়ত তাদের সম্পদের হিসাব নিতেন।

এক নজরে একজন আদর্শ শাসকের গুণাবলী



প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন—*"ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর সংকট দূর হবে না, যতদিন না কোনো দার্শনিক রাজা হবেন অথবা রাজারা দর্শন চর্চা করবেন।"* আর ইসলামের পরিভাষায় এর বাস্তব রূপ হলো—*ততদিন সমাজে শান্তি আসবে না, যতদিন না একজন শাসক নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং জনগণের সেবক মনে করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।*

অন্যান্য খলিফা ও তাদের খেলাফত

হযরত ইমাম হাসান (রা.)

ইসলামের ইতিহাসে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর খিলাফতের সময়কাল ছিল মাত্র প্রায় *ছয় মাস* (৪০ হিজরি রমজান থেকে ৪১ হিজরি রবিউল আউয়াল/জমাদিউল আউয়াল) । সংক্ষিপ্ত হলেও

ইসলামের ইতিহাসে এই সময়টুকুর গুরুত্ব অপরিসীম। উম্মাহর রক্তপাত বন্ধ এবং শান্তি ও ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর এই ত্যাগ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

কীভাবে খিলাফত গ্রহণ করলেন?

৪০ হিজরির রমজান মাসে কুফার মসজিদে এক চরমপন্থী খারেজির তরবারির আঘাতে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর কুফাবাসী এবং ইরাকের মুসলিম উম্মাহ গভীর সংকটে পড়ে। হযরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের পরপরই ৪০ হিজরির ২১ রমজান (বা মতান্তরে ২২ রমজান) কুফার মুসলিমরা হযরত হাসান (রা.)-এর হাত ধরে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম হযরত কায়েস ইবনে সা'দ আল-আনসারী (রা.) তাঁর আনুগত্যের শপথ নেন। এরপর একে একে কুফা, বসরা, হিজাজ (মক্কা-মদিনা) এবং ইয়েমেনের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ তাঁর পক্ষে বাইআত হন। কোনো রাজতান্ত্রিক উত্তরাধিকার হিসেবে নয়, বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র হিসেবে তাঁর মহান চরিত্র, জ্ঞান, তাকওয়া এবং তৎকালীন সংকটময় পরিস্থিতিতে উম্মাহকে নেতৃত্ব দেওয়ার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই সবাই তাঁকে খলিফা হিসেবে বেছে নেন। **খিলাফত আমলে কী কী কাজ করলেন?**

খুবই সংক্ষিপ্ত এবং যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কায় ঘেরা সময় হওয়ার কারণে তিনি দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসনিক বা কাঠামোগত সংস্কারের সুযোগ পাননি। তবে এই অল্প সময়ে তাঁর প্রধান কাজগুলো ছিল:

প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা রক্ষা: তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নর এবং কর্মকর্তাদের পদে বহাল রাখেন এবং শাসনব্যবস্থায় স্থীতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

খারেজিদের দমন: হযরত আলী (রা.)-এর হত্যাকারী চরমপন্থী খারেজি গোষ্ঠী দেশের অভ্যন্তরে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল, তিনি কঠোর হস্তে তাদের দমন করেন।

হত্যাকারীর বিচার: পিতার হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের ওপর শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কিসাস (শাস্তি) কার্যকর করেন।

ভাতা বৃদ্ধি: তিনি জনগণের কল্যাণে এবং সৈন্যদের মনোবল ধরে রাখতে বায়তুল মাল থেকে তাঁদের ভাতা বা অনুদান কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন।

শান্তির জন্য কূটনীতি: তাঁর খিলাফতের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়াতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

তাঁর সামনে কী কী বাধা ছিল?

হযরত ইমাম হাসান (রা.) এক অত্যন্ত জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান বাধাগুলো ছিল:

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও কুফাবাসীদের চপলতা: ইরাক বা কুফার যে সেনাবাহিনী তাঁর সাথে ছিল, তাদের মধ্যে চরম শৃঙ্খলাহীনতা ও মতবিরোধ ছিল। তারা আবেগপ্রবণ ছিল কিন্তু যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে পিছুটান দিত।

খারেজি ফিতনা: উগ্রপন্থী খারেজিরা প্রতিনিয়ত পেছন থেকে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ছড়াত এবং খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এমনকি এক পর্যায়ে কুফার কিছু চরমপন্থী হাসান (রা.)-এর তাঁবুতে আক্রমণ করে তাঁর মালপত্র লুট করে এবং তাঁকে আঘাত করে আহত করে।

সিরিয়া থেকে সামরিক চাপ: সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুআবিয়া (রা.) হাসান (রা.)-এর খিলাফতকে মেনে নেননি। উল্টো তিনি এক বিশাল ও সুশৃঙ্খল বাহিনী নিয়ে ইরাক আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হন, যা ইমাম হাসান (রা.)-এর জন্য এক বিরাট সামরিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

নিজেদের বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা: মুআবিয়া (রা.)-এর চতুর কূটনীতি ও প্রলোভনের মুখে ইমাম হাসানের বাহিনীর কিছু প্রভাবশালী নেতা ও গোত্রপ্রধান গোপনে পক্ষ পরিবর্তন করেন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। ফলে নিজের বাহিনীর ওপর আস্থা রাখা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল।

কেন ও কাকে খিলাফত দিয়ে দিলেন?

এই চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে হযরত ইমাম হাসান (রা.) ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল (মতান্তরে জমাদিউল আউয়াল) মাসে *হযরত মুআবিয়া (রা.)*-এর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করেন।

খিলাফত হস্তান্তর করার কারণসমূহ:

ইমাম হাসান (রা.) খুব ভালো করেই জানতেন যে, সিরিয়া ও ইরাকের এই দুই বিশাল বাহিনী যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে হাজার হাজার মুসলমানের প্রাণ যাবে। উম্মাহর এই আত্মঘাতী রক্তপাত বন্ধ করাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। খিলাফতের লোভ বা ক্ষমতার মোহ তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম উম্মাহ যেন দুই ভাগে বিভক্ত না থেকে একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। নিজের কুফাবাসী সৈন্যদলের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্থির চরিত্রের কারণে তিনি বুঝেছিলেন, এই বাহিনীকে দিয়ে কোনো টেকসই বা ন্যায়সঙ্গত বিজয় সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর শৈশবেই হাসান (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন: *"আমার এই সন্তানটি একজন সাইয়্যেদ (নেতা)। আশা করা যায় আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিবদমান বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।"* *(সহীহ বুখারী)* । ইমাম হাসান (রা.) খিলাফত হস্তান্তরের মাধ্যমে নানাজানের সেই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীই অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন।

সন্ধির মূল শর্তসমূহ: খিলাফত হস্তান্তরের সময় ইমাম হাসান (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রেখেছিলেন, যার মধ্যে প্রধান ছিল:

** শাসনকাজ আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ □-এর সুন্নাহ অনুযায়ী চালাতে হবে।*
** হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারী ও আহলে বায়তের সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে এবং কাকেও হেনস্তা করা যাবে না।*
** হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁর পরে কাউকে উত্তরাধিকারী (যেমন তাঁর ছেলে ইয়াজিদ) মনোনীত করতে পারবেন না; তাঁর মৃত্যুর পর খিলাফতের বিষয়টি মুসলমানদের শুরা (পরামর্শ সভা) বা সাধারণ জনগণের মতামতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।*

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর এই মহান ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ফলে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এক পতাকার নিচে চলে আসে। এই অভূতপূর্ব ঐক্যের কারণে ইসলামের ইতিহাসে এই বছরটিকে (৪১ হিজরি) *"আমুল জামা'আত" বা "ঐক্যের বছর"* হিসেবে অভিহিত করা হয়। ক্ষমতার চূড়ায় থেকে উম্মাহর শান্তির জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) (উমাইয়া খিলাফত এর সূচনা)

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একটি মোড় পরিবর্তনকারী অধ্যায়। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের পর এবং হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত ত্যাগের মাধ্যমে ৪১ হিজরিতে (৬৬১ খ্রিস্টাব্দে) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর একক শাসন শুরু হয়, যা ৬০ হিজরি (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর স্থায়ী ছিল। *তিনি ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের প্রথম খলিফা।*

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকালের প্রধান বাঁধাসমূহ

দীর্ঘ ৫ বছরের গৃহযুদ্ধের (প্রথম ফিতনা) পর যখন তিনি ক্ষমতায় বসেন, তখন তাঁর সামনে বিশাল কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট বা বাঁধা ছিল:

উম্মাহর অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা: হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার যুদ্ধের কারণে মুসলিম সমাজ মানসিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে ইরাক (কুফা ও বসরা) এবং হেজাজ (মক্কা ও মদিনা) অঞ্চলের মানুষ সিরিয়ার এই নতুন শাসনকে সহজে মেনে নিতে পারছিল না।

খারেজি ফিতনা: উগ্রপন্থী খারেজিরা হযরত আলী (রা.)-কে শহীদ করার পরও শান্ত হয়নি। তারা হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনকেও অবৈধ মনে করত এবং ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে অনবরত বিদ্রোহ ও গেরিলা হামলা চালিয়ে আসছিল।

বাইজান্টাইন (রোমান) হুমকি: মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ শুরু করেছিল এবং ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গোত্রীয় কোন্দল: আরব গোত্রগুলোর মধ্যকার প্রাচীন 'কায়েস' ও 'কালব' (উত্তর ও দক্ষিণ আরব) গোত্রীয় দ্বন্দ্ব পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল, যা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক ছিল।

শাসনকালে গৃহীত্ব ঐতিহাসিক পদক্ষেপসমূহ

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ, কূটনীতিবিদ এবং দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর প্রশাসনিক মেধা দিয়ে একটি খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে রূপ দেন:

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা: তিনি শাসনব্যবস্থাকে গতিশীল করতে বেশ কিছু নতুন সরকারি বিভাগ (Diwan) তৈরি করেন। যেমন—দিওয়ান আল-বারিধ (ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা), দিওয়ান আল-খাতাম (সরকারি সিলমোহর ও নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যুরো) এবং দিওয়ান আল-রাসায়েল (চিঠিপত্র আদান-প্রদান বিভাগ) ।

রাজধানী স্থানান্তর: তিনি রাজধানী মদিনা বা কুফা থেকে সিরিয়ার *দামেস্কে* স্থানান্তর করেন। দামেস্ক ছিল তাঁর দীর্ঘ ২০ বছরের চেনা ঘাঁটি এবং সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত নিরাপদ।

নৌবাহিনীর উন্নয়ন ও জলপথের বিজয়: তিনি মুসলিম জাহানের প্রথম সুসংগঠিত নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর আমলে মুসলিম নৌবহর রোমানদের পরাজিত করে সাইপ্রাস, রোডস দ্বীপ জয় করে এবং রোমান রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (আজকের ইস্তাম্বুল) অবরোধ করে।

নতুন ভূখণ্ড বিজয়: তাঁর শাসনামলে পুনরায় ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়তে থাকে। পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা (তিউনিসিয়া অঞ্চলে কায়রোয়ান শহর প্রতিষ্ঠা) এবং পূর্বে খোরাসান ও বর্তমান পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত ইসলামের পতাকা পৌঁছায়।

হিলম বা সহনশীলতার রাজনীতি: রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে তিনি কঠোরতার চেয়ে কূটনীতি, অর্থ এবং তাঁর বিখ্যাত 'হিলম' (ধৈর্য ও দূরদর্শিতা) নীতি ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, *"যেখানে চাবুক দিয়ে কাজ হয় সেখানে আমি তলোয়ার তুলি না, আর যেখানে কথা দিয়ে কাজ হয় সেখানে চাবুক ধরি না।"*

ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা (মনোনয়ন) করার কারণ ও প্রেক্ষাপট

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জীবনের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পুত্র *ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া*-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করা এবং জনগণের কাছ থেকে তার অগ্রিম বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়া। এর মাধ্যমে ইসলামের পরামর্শভিত্তিক 'খিলাফত' ব্যবস্থা মূলত 'রাজতন্ত্রে' (Monarchy) রূপ নেয়। তিনি কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তার পেছনে প্রধান রাজনৈতিক কারণগুলো ছিল:

পুনরায় গৃহযুদ্ধের ভয় (ঐক্য রক্ষা)ঃহযরত মুয়াবিয়া (রা.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যদি খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা হয়, তবে কুফা, বসরা, মদিনা এবং সিরিয়ার দলগুলোর মধ্যে আবারও ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হবে, যা মাত্র ২০ বছর আগে মুসলিম উম্মাহ প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই একজন শক্তিশালী নেতা ঠিক করে না গেলে রাষ্ট্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সিরিয়ার সামরিক শক্তির চাপঃ উমাইয়া শাসনের মূল ভিত্তি ছিল সিরিয়ার শক্তিশালী ও অনুগত সেনাবাহিনী। সিরিয়ার প্রভাবশালী গোত্র ও নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল যে, খিলাফত যদি সিরিয়ার বাইরে (যেমন মদিনা বা কুফায়) চলে যায়, তবে তারা তা মেনে নেবে না। ইয়াজিদ সিরিয়াতেই বড় হয়েছে এবং সিরিয়ার গোত্রগুলোর সাথে তার রক্তের সম্পর্ক ছিল (তার মা ছিলেন বনু কালব গোত্রের) । তাই সিরিয়ার আনুগত্য ধরে রাখতে তিনি ইয়াজিদকে বেছে নেন।

রাজনৈতিক প্ররোচনাঃ ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী, কুফার তৎকালীন গভর্নর মুগীরা ইবনে শুবা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া-কে প্রথম পরামর্শ দেন যে, উম্মাহর রক্তপাত এড়াতে ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা উচিত। মুয়াবিয়া (রা.) এই প্রস্তাবটি পছন্দ করেন কারণ এটি তাঁর নিজের বংশের (উমাইয়া) হাতে ক্ষমতা রাখার একটি সুযোগও তৈরি করেছিল।

ইয়াজিদের তৎকালীন যোগ্যতা ও ইমেজঃ আমাদের কাছে কারবালার ঘটনার পর ইয়াজিদের চরিত্র যেভাবে উন্মোচিত হয়েছে, মনোনয়নের সময় (৫৫-৫৬ হিজরি) পরিস্থিতি হুবহু তেমন ছিল না। ইয়াজিদ তখন তরুণ, রোমানদের বিরুদ্ধে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং মক্কায় হজের আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল। মুয়াবিয়া (রা.) মনে করেছিলেন, শাসনকাজে ইয়াজিদকে তিনি নিজে তৈরি করেছেন, তাই সে রাষ্ট্র সামলাতে পারবে।

এই সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক প্রভাব: হযরত মুআবিয়া (রা.) যখন তাঁর জীবদ্দশায় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন এবং তার জন্য বাইআত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়া শুরু করেন, তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে, বিশেষ করে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র **মদিনায়** তীব্র প্রতিক্রিয়া ও আপত্তির সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সময়ে মদিনায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন কিছু বিশিষ্ট সাহাবী এবং সাহাবাপুত্র (আশাবায়ে কিরাম ও আবনাউস সাহাবা) জীবিত ছিলেন, যাঁরা ইয়াজিদের এই মনোনয়নকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের আপত্তি কেবল ব্যক্তিগত ছিল না, বরং তা ছিল নীতিগত ও আদর্শিক। ইয়াজিদের খিলাফতে যাদের প্রধান আপত্তি ছিল এবং তাঁদের যুক্তিগুলো হলো:

প্রধান আপত্তিকারী ব্যক্তিবর্গঃ ইয়াজিদের খিলাফতের বিরুদ্ধে মদিনার ৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন:

হযরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.)ঃরাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র এবং হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হোসাইন (রা.) ছিলেন ইয়াজিদের খিলাফতের সবচেয়ে বড় এবং প্রধান আপত্তিকারী। প্রথমত, ইমাম হাসান (রা.)-এর সাথে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর যে চুক্তি হয়েছিল, ইয়াজিদের মনোনয়ন ছিল তার স্পষ্ট লঙ্ঘন (চুক্তিতে ছিল মুআবিয়ার পর খিলাফত শুরার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে)। দ্বিতীয়ত, ইয়াজিদের ব্যক্তিগত আমল, চরিত্র এবং নৈতিকতা খিলাফতের মতো পবিত্র দায়িত্বের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না। ইমাম হোসাইন (রা.) মনে করেছিলেন, ইয়াজিদকে খলিফা মেনে নিলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীন এবং খিলাফতের আদর্শিক ভিত্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)ঃ তিনি ছিলেন প্রথম হিজরি সনে মদিনায় জন্মগ্রহণকারী মুসলমানদের প্রথম সন্তান এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৌহিত্র (হযরত

আসমা রা.-এর পুত্র)। তিনি ইয়াজিদের এই রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, খিলাফত কোনো পারিবারিক সম্পত্তি নয় যে পিতা পুত্রকে দিয়ে যাবেন। খলিফা নির্বাচনের অধিকার একমাত্র উম্মাহর এবং মদিনার শুরা কমিটির। তিনি ইয়াজিদের বাইআত সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরবর্তীতে মক্কায় গিয়ে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)ঃ হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছিলেন মদিনার অত্যন্ত সম্মানিত, পরহেযগার এবং বিখ্যাত ফকীহ সাহাবী। তিনি মূলত *"বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র"* চালুর তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি হযরত মুআবিয়া (রা.)-কে সরাসরি বলেছিলেন, **"এই পদ্ধতি তো রোমান (কায়সার) বা পারস্যের (কিসরা) রাজতন্ত্রের মতো, যেখানে রাজা মরলে তাঁর ছেলে রাজা হয়। ইসলামে তো এমন নিয়ম নেই।"** তবে তিনি স্বভাবগতভাবে ফিতনা ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তাই ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার পর যখন উম্মাহর একটি বড় অংশ বাধ্য হয়ে তাকে মেনে নেয়, তখন উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরে তিনি *শেষ পর্যন্ত নীরবতা* অবলম্বন করেন, কিন্তু শুরুর দিকে তার আপত্তি ছিল স্পষ্ট।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আলেম (*রইসুল মুফাসসিরীন*) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-ও ইয়াজিদের খিলাফত প্রাপ্তির পদ্ধতির তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনিও যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং শুরার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন। ইয়াজিদের মতো একজন অনভিজ্ঞ এবং বিতর্কিত তরুণকে খিলাফতের আসনে বসানো তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবে ইমাম হোসাইন (রা.) যখন কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন, তখন ইবনে আব্বাস (রা.) কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে মদিনা না ছাড়ার অনুরোধ করেছিলেন, যাতে বড় কোনো রক্তপাত না ঘটে।

<u>আপত্তির মূল কারণসমূহ (কেন তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন?)ঃ</u> সাহাবী ও মদিনাবাসীদের এই তীব্র আপত্তির পেছনে প্রধানত তিনটি বড় কারণ ছিল:

খিলাফতকে রাজতন্ত্রে রূপান্তর (الملكية)ঃ ইসলামের প্রথম চার খলিফা (খোলাফায়ে রাশেদীন) নির্বাচিত হয়েছিলেন জনগণের মতামত, সাহাবীদের পরামর্শ (শুরা) এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে। হযরত মুআবিয়া (রা.) কর্তৃক ইয়াজিদকে মনোনীত করার মাধ্যমে ইসলামের সেই গণতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক "খিলাফত" ব্যবস্থাটি রোমান বা পারস্য সাম্রাজ্যের মতো "বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রে" রূপান্তরিত হয়। সাহাবীরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, এর ফলে খিলাফতের পবিত্রতা নষ্ট হবে এবং যোগ্যতার চেয়ে বংশ পরিচয় বড় হয়ে উঠবে।

ইয়াজিদের যোগ্যতার অভাব ও বিতর্কিত চরিত্রঃ ইয়াজিদ তৎকালীন মদিনার শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের তুলনায় জ্ঞান, তাকওয়া (আল্লাহভীতি), প্রজ্ঞা এবং আমলের দিক থেকে বহুগুণ পিছিয়ে ছিল। তাছাড়া যুবরাজ থাকা অবস্থায় তার জীবনযাপন, শিকারপ্রিয়তা এবং কিছু বিতর্কিত অভ্যাস নিয়ে মদিনার ধার্মিক সমাজের মনে গভীর অসন্তোষ ছিল। ইসলামের খলিফা হবেন উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরহেযগার ব্যক্তি—এই মানদণ্ডে ইয়াজিদ কোনোভাবেই টিকছিল না।

পূর্ববর্তী চুক্তির লঙ্ঘনঃ হযরত ইমাম হাসান (রা.) যখন খিলাফত হস্তান্তর করেন, তখন শর্ত ছিল যে মুআবিয়া (রা.) তাঁর পরে কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে পারবেন না। ইয়াজিদকে যুবরাজ ঘোষণা করার মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক চুক্তিটি সরাসরি ভঙ্গ করা হয়, যা ইমাম হোসাইন (রা.)-সহ আহলে বায়তের অনুসারীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

<u>ওফাত বা ইন্তেকাল</u>

হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ওফাত বা ইন্তেকালের ঘটনাটি ঘটেছিল *৬০ হিজরির রজব মাসে (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ)* সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৮ থেকে ৮০ বছর। জীবনের শেষ দিনগুলোতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মারাত্মক অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা এই প্রবীণ শাসক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চরম আবেগপ্রবণ ও অনুতপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের ডেকে কিছু বিশেষ অসিয়ত করেন। তাঁর কাছে মহানবী (সা.)-এর একটি পবিত্র চাদর (কুর্তা), নখের কিছু অংশ এবং কিছু চুল গচ্ছিত ছিল। তিনি অসিয়ত করেন, *"আমি যখন মারা যাব, তখন নবীজি (সা.)-এর এই পবিত্র চাদরটি দিয়ে আমাকে কাফন পরাবে। আর তাঁর নখ ও চুলের অংশগুলো পিষে আমার চোখে এবং মুখের ভেতরে দিয়ে দেবে। এরপর আমাকে আল্লাহর দয়ার ওপর ছেড়ে দেবে।"* তিনি তাঁর ছেলে ইয়াজিদকে ডেকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়ে যান। তিনি বলেন, *"মদিনার মানুষ যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে তাদের ক্ষমা করো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর সাথে কখনোই খারাপ আচরণ করো না। যদি সে তোমার বিরুদ্ধে চড়াও হয় এবং তুমি তার ওপর বিজয়ী হও, তবুও তাকে ক্ষমা করে দিও। মনে রেখো, তাঁর ধমনিতে আল্লাহর রাসূলের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।"* (যদিও ইয়াজিদ পরবর্তীতে এই উপদেশ মানেনি)। ৬০ হিজরির ২২শে রজব (মতান্তরে রজব মাসের মাঝামাঝি) দামেস্কে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় পুত্র ইয়াজিদ দামেস্কের বাইরে একটি অভিযানে ছিলেন।

জানাজা, দাফন ও মাজার

ইয়াজিদের অনুপস্থিতিতে বিশিষ্ট সাহাবী *হযরত যাহহাক ইবনে কায়েস (রা.)* দামেস্কের কেন্দ্রীয় মসজিদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। পরবর্তীতে ইয়াজিদ দামেস্কে ফিরে এসে বাবার কবরের পাশে গিয়ে পুনরায় শোক প্রকাশ করে।হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে সিরিয়ার দামেস্ক শহরের ঐতিহাসিক "*বাব আল-সাগীর*" নামক বিখ্যাত কবরস্থানে দাফন করা হয়। আজও দামেস্কের সেই প্রাচীন গোরস্থানে তাঁর কবর বা সমাধি রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের একটি দীর্ঘ ২০ বছরের একক শাসনের অবসান ঘটে এবং তাঁর পুত্র ইয়াজিদের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে উম্মাহর মধ্যে এক নতুন ও রক্তক্ষয়ী সংকটের (কারবালার ট্র্যাজেডি) সূচনা হয়।

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনকাল (৬০ হিজরি থেকে ৬৪ হিজরি / ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত, রক্তক্ষয়ী এবং সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায়। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা মুসলিম উম্মাহকে চিরদিনের জন্য ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

ইয়াজিদের শাসনকালের প্রধান বাধাসমূহঃ ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ইয়াজিদকে তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়। তার প্রধান বাধাসমূহ ছিল-

বৈধতার সংকট: ইসলামের প্রতিষ্ঠিত 'শুরা' বা পরামর্শভিত্তিক খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালুর কারণে মক্কা, মদিনা এবং কুফার সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্ট সাহাবীরা তাকে খলিফা হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রধান চার ব্যক্তিত্বের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান: মদিনার সবচেয়ে প্রভাবশালী চারজন ব্যক্তিত্ব— ***হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.), **আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)*

এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ইয়াজিদের আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) দিতে সরাসরি অস্বীকার করেন।

কুফাবাসীদের বিদ্রোহ: ইরাকের কুফার জনগণ উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে গিয়ে হযরত হুসাইন (রা.)-কে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানায়।

কারবালা ট্র্যাজেডি (১০ই মহরম, ৬১ হিজরি): এটি ইয়াজিদের শাসনকালের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ও নৃশংস ঘটনা। কুফাবাসীদের হাজার হাজার চিঠির সাড়া দিয়ে হযরত হুসাইন (রা.) যখন সপরিবারে মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন ইয়াজিদ *উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ*-কে কুফার নতুন গভর্নর নিযুক্ত করে এবং যেকোনো মূল্যে এই বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেয়। ইবনে জিয়াদের ৪,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইন (রা.)-এর মাত্র ৭২ জনের কাফেলাকে (যার মধ্যে নারী ও শিশু ছিলেন) ফোরাত নদীর তীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তীব্র গরমে কয়েকদিন তাদের পানি বন্ধ করে রাখা হয়। ৬০ হিজরির ১০ই মহরম (৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ) ইয়াজিদের বাহিনী চরম নিষ্ঠুরতায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের (নবী বংশের মাসুম শিশুসহ) একে একে শহীদ করে। *শিমার ইবনে জিল জওশানের* নির্দেশে হযরত হুসাইনের পবিত্র মস্তক শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্শার ডগায় বিদ্ধ করে কুফা হয়ে দামেস্কে ইয়াজিদের দরবারে পাঠানো হয়।

ইয়াজিদের ভূমিকা: ঐতিহাসিকদের মতে, ইয়াজিদ প্রথমে এত বড় হত্যাকাণ্ডের তীব্রতা বুঝতে পারেনি এবং নবী বংশের নারীদের বন্দি অবস্থায় দামেস্কে আনার পর সে কিছুটা অনুতপ্ত হয়ে ইবনে জিয়াদের ওপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করে। তবে সে ঘাতকদের কোনো শাস্তি দেয়নি, যা প্রমাণ করে এই অপরাধে তার পরোক্ষ সম্মতি ছিল।

ইয়াজিদের অন্যান্য কাজ ও নৃশংসতা: কারবালার ঘটনার পর ইয়াজিদের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। এই ক্ষোভ দমাতে সে আরও দুটি ভয়াবহ অপরাধ সংগঠন করে:

হাররার যুদ্ধ ও মদিনা আক্রমণ (৬৩ হিজরি): কারবালার নির্মমতার প্রতিবাদে মদিনার মানুষ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং উমাইয়াদের মদিনা থেকে বের করে দেয়। ইয়াজিদ তখন *মুসলিম ইবনে উকবা* নামক এক নিষ্ঠুর সেনাপতির অধীনে মদিনায় বিশাল সৈন্যদল পাঠায়। 'হাররার যুদ্ধ'-এ মদিনার আনসার ও মুহাজিরদের বাহিনী পরাজিত হয়। ইয়াজিদের নির্দেশে মদিনা নগরীতে ৩ দিন ধরে তলোয়ার চালানো হয়, শত শত সাহাবী ও হাফেজকে শহীদ করা হয় এবং মসজিদে নববীতে ঘোড়া বেঁধে অপবিত্র করা হয়।

মক্কা অবরোধ ও কাবা শরিফে অগ্নিসংযোগ (৬৪ হিজরি): মদিনা ধ্বংস করার পর ইয়াজিদের বাহিনী মক্কায় আশ্রয় নেওয়া *আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)*-কে দমনের জন্য মক্কা অবরোধ করে। তারা মক্কার চারপাশের পাহাড় থেকে কাবা শরিফ লক্ষ্য করে পাথর ও অগ্নিগোলক (মিনজানিক দিয়ে) নিক্ষেপ করে। এতে কাবার গিলাফ পুড়ে যায় এবং কাবার দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবরোধ চলাকালীন অবস্থাতেই দামেস্ক থেকে ইয়াজিদের আকস্মিক মৃত্যুর খবর আসে।

ওফাত বা ইন্তেকাল

কাবা শরিফ অবরোধের মাত্র কয়েকদিনের মাথায়, *৬৪ হিজরির ১৪ই রবিউল আউয়াল* (৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া মাত্র ৩৬ থেকে ৩৮ বছর বয়সে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন অতিরিক্ত মদ্যপান ও যকৃৎ (Liver) নষ্ট হয়ে সে মারা যায়, আবার কেউ বলেন ঘোড়া থেকে পড়ে বা কোনো সংক্রামক

রোগে আক্রান্ত হয়ে তার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।তার এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুকে অনেকেই মদিনা ও কাবার ওপর আক্রমণ করার কারণে আল্লাহর গজব হিসেবে গণ্য করেন।

দাফন ও সমাধি

ইয়াজিদ দামেস্কের কাছে *'হুওয়ারিন'* নামক একটি এলাকায় মারা যায় এবং তাকে সিরিয়ার দামেস্কেরই *'বাব আল-জাবিয়া'* বা প্রাচীন উমাইয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। তবে ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত চরিত্রগুলোর একটি হওয়ায়, পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর যখন আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসে, তখন তারা উমাইয়া রাজাদের অধিকাংশ কবর খুঁড়ে ধ্বংস করে ফেলেছিল। ইয়াজিদের কবরের ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে দামেস্কে তার কবরের কোনো নির্দিষ্ট বা সম্মানিত চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।ইয়াজিদের সাড়ে তিন বছরের রাজত্বকাল ছিল ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার সময়, যা কারবালার ট্র্যাজেডি, মদিনা ধ্বংস এবং কাবা শরিফে আক্রমণের মতো তিনটি ক্ষমার অযোগ্য কলঙ্কজনক ঘটনার জন্য ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়া

পুরো নাম *মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ*—ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের তৃতীয় খলিফা। কারবালার কুখ্যাত খলনায়ক ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তাঁর এই তরুণ পুত্র দামেস্কের সিংহাসনে বসেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও আদর্শিক দিক থেকে তা ছিল এক নজিরবিহীন ও বিস্ময়কর অধ্যায়।

প্রাথমিক পরিচিতি ও ক্ষমতা গ্রহণঃ ৬৪ হিজরির (৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ) রবিউল আউয়াল মাসে পিতা ইয়াজিদের আকস্মিক মৃত্যুর পর সিরিয়ার উমাইয়া নেতারা তাঁর বড় ছেলে দ্বিতীয় মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ থেকে ২১ বছরের মধ্যে।তিনি তাঁর পিতা ইয়াজিদ বা দাদা প্রথম মুয়াবিয়ার মতো যুদ্ধপ্রিয় বা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না।তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, নরম মনের এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মানুষ। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তাঁর শিক্ষক *ওমর আল-মাকসুস (রহ.)* তাঁকে উমাইয়া রাজপরিবারের অন্যায় ও আহলে বায়তের (নবী পরিবারের) প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার গভীর প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল।

শাসনকালের ভয়াবহ রাজনৈতিক বাঁধাঃ তিনি যখন ক্ষমতা পান, তখন মুসলিম সাম্রাজ্য দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধে কাঁপছিল। তাঁর চারপাশের প্রধান বাঁধাসমূহ ছিল:

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.)-এর খেলাফত: মক্কায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেছিলেন এবং হেজাজ (মক্কা-মদিনা), ইরাক ও মিসরের মানুষ তাঁকে বৈধ খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

বৈধতার সংকট: কারবালায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত এবং মদিনা ও মক্কায় ইয়াজিদের বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের কারণে সাধারণ মানুষের মনে উমাইয়া বংশের প্রতি তীব্র ঘৃণা তৈরি হয়েছিল।

সীমিত নিয়ন্ত্রণ: দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার শাসন কেবল সিরিয়ার দামেস্ক এবং তার আশেপাশের কিছু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিক খুতবা এবং খিলাফত বর্জন (পদত্যাগ)ঃ ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৪০ দিন (কোনো কোনো বর্ণনায় ২০ দিন থেকে ২ মাস) পর দ্বিতীয় মুয়াবিয়া দামেস্কের কেন্দ্রীয় মসজিদে উমাইয়া

নেতা ও সাধারণ জনগণকে একত্রিত করেন। সেখানে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম কাঁপানো এক খুতবা (ভাষণ) দেন, যা উমাইয়া রাজপ্রাসাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি জনসমক্ষে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করেন: *"আমার দাদা মুয়াবিয়া খিলাফতের দাবিদার হয়েছিলেন এমন একজনের (হযরত আলী) বিরুদ্ধে, যিনি তাঁর চেয়ে সবদিক থেকে উত্তম ও যোগ্য ছিলেন। এরপর আমার পিতা ইয়াজিদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, অথচ তিনি তাঁর পাপ ও খিলাফতের অযোগ্যতার কারণে মোটেও এর উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহর দৌহিত্রকে হত্যা করেছেন এবং কাবা শরিফে আগুন দিয়েছেন।"*তিনি আরও বলেন: *"আমি আপনাদের এই খেলাফতের দায়িত্ব নিতে চাই না। আমি আল্লাহর দরবারে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হতে পারব না। আপনারা যাকে খুশি আপনাদের খলিফা নির্বাচন করে নিন।"*
উমাইয়া রাজপরিবারের তীব্র আপত্তি ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং নিজেকে রাজপ্রাসাদের একটি ছোট কামরায় বন্দি করে পুরোপুরি ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। তিনি তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী বা পরবর্তী খলিফাও মনোনীত করে যাননি।

ওফাত বা ইন্তেকাল এবং দাফন

খিলাফত বর্জনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর, *৬৪ হিজরির শেষের দিকে (৬৮৪ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে)* এই তরুণ সাবেক খলিফা *আকস্মিকভাবে* মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে দুটি মত রয়েছে। প্রথমত, তিনি জন্মগতভাবেই প্রচণ্ড অসুস্থ ও দুর্বল (Chronic illness) ছিলেন, খিলাফতের পর রোগ বেড়ে যাওয়ায় মারা যান। দ্বিতীয় ও সবচেয়ে *বহুল আলোচিত মত* হলো—উমাইয়া পরিবারের কিছু সদস্য তাঁর এই খিলাফত বর্জনের সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে *গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা* করেছিল। কারণ, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে উমাইয়াদের হাত থেকে ক্ষমতা চিরতরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের ঐতিহাসিক *'বাব আল-সাগীর'* কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী না রাখার কারণে উমাইয়াদের মধ্যে চরম নেতৃত্ব সংকট তৈরি হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর উমাইয়া রাজপরিবার সিদ্ধান্ত নেয় যে, ক্ষমতা এবার প্রথম মুয়াবিয়ার বংশ (সুফিয়ানীয় শাখা) থেকে সরিয়ে উমাইয়াদের অন্য শাখা **মারওয়ান ইবনুল হাকাম**-এর হাতে দেওয়া হবে। এভাবে মারওয়ান খলিফা হন এবং তাঁর বংশের হাত ধরেই পরবর্তীতে উমাইয়া শাসন দীর্ঘায়িত হয়। দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার সংক্ষিপ্ত শাসনকাল কোনো যুদ্ধ বা বিজয়ের জন্য নয়, বরং উমাইয়া রাজপরিবারে জন্ম নিয়েও নিজের সততা, খোদাভীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহাসন ত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

মারওয়ানি শাখার খলিফাগণ ও তাদের সংক্ষিপ্ত শাসন (৬৪ হিজরি - ১৩২ হিজরি)

দ্বিতীয় মুআবিয়ার পর উমাইয়াদের সুফিয়ানি শাখার অবসান ঘটে এবং **মারওয়ান ইবনে হাকাম**-এর মাধ্যমে মারওয়ানি উমাইয়া বংশের সূচনা হয়। ৬৪ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি পর্যন্ত এই শাখার মোট ১১ জন খলিফা দামেস্ক এবং পরবর্তীতে হাররান থেকে মুসলিম বিশ্ব শাসন করেন। এই পর্বের খলিফাগণ হলেন:

১. মারওয়ান ইবনে হাকাম (শাসনকাল: ৬৪ - ৬৫ হিজরি)ঃদ্বিতীয় মুয়াবিয়ার পদত্যাগ ও মৃত্যুর পর উমাইয়া বংশে তীব্র নেতৃত্ব সংকট তৈরি হলে সিরিয়ার জাবিয়া সম্মেলনে অভিজ্ঞ উমাইয়া নেতা মারওয়ান ইবনুল হাকামকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। তিনি মারজ রাহিল-এর যুদ্ধে জুবাইরপন্থী বাহিনীকে পরাজিত করে সিরিয়া ও মিসরে উমাইয়া শাসন পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ৯

মাস শাসনের পর ৬৫ হিজরিতে তিনি দামেস্কে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে (মতান্তরে তাঁর স্ত্রী উম্মে হাশিম কর্তৃক বিষপ্রয়োগে) ইন্তেকাল করেন এবং দামেস্কের বাব আল-সাগীর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (শাসনকাল: ৬৫ - ৮৬ হিজরি)ঃপিতা মারওয়ানের মৃত্যুর পর ৬৫ হিজরিতে দামেস্কের সিংহাসনে বসেন আব্দুল মালিক তাঁকে উমাইয়া বংশের *"দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা" বা প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা* বলা হয়। তিনি দীর্ঘ ২১ বছর শাসন করেন। তাঁর আমলেই ৭৩ হিজরিতে তাঁর সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মক্কা আক্রমণ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করেন এছাড়া মুখতার আল-সাকাফিকে পরাজিত করে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটান এবং পুরো মুসলিম বিশ্ব আবার একক উমাইয়া শাসনে আসে।তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করেন, প্রথম ইসলামী স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) চালু করেন এবং জেরুজালেমের বিখ্যাত *"কুব্বাতুস সাখরা"* নির্মাণ করেন। ৮৬ হিজরিতে তিনি দামেস্কে স্বাভাবিকভাবে ওফাত পান এবং দামেস্কে তাঁর জানাজা শেষে বাব আল-সাগীরে দাফন করা হয়।

৩. আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল: ৮৬ - ৯৬ হিজরি)ঃ পিতা আব্দুল মালিকের ওফাতের পর ৮৬ হিজরিতে কোনো রকম বাধা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে খিলাফতের দায়িত্বে আসেন আল-ওয়ালিদ। ওয়ালিদের ১০ বছরের শাসনকালকে উমাইয়া ইতিহাসের *"স্বর্ণযুগ"* বলা হয়। তাঁর সময়ে কোনো অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ছিল না এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা ইতিহাসের সর্বোচ্চ বিস্তার লাভ করে।তাঁর আমলেই মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু (ভারত) জয় করেন, কুতাইবা বিন মুসলিম মধ্য এশিয়া জয় করেন এবং তারেক বিন জিয়াদ স্পেন (ইউরোপ) জয় করেন। তিনি দামেস্কের বিখ্যাত উমাইয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। ৯৬ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ভাই সুলাইমান তাঁর জানাজা পড়ানোর পর দামেস্কের মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৪. সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক (শাসনকাল: ৯৬ - ৯৯ হিজরি)ঃ ভাই আল-ওয়ালিদের অসিয়ত অনুযায়ী ৯৬ হিজরিতে দামেস্কের খলিফা হন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক। তাঁর খিলাফতের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল রোমান রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অবরোধের জন্য বিশাল নৌবাহিনী পাঠানো, যদিও এই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। ৯৯ হিজরিতে সিরিয়ার দাবিক নামক স্থানে রোমান অভিযানের তদারকি করার সময় তিনি আকস্মিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে ওফাত পান এবং দাবিক অঞ্চলেই তাঁর জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়।তবে মৃত্যুর আগে তিনি নিজের সন্তানদের বাদ দিয়ে একজন যোগ্য ও পরহেযগার মানুষকে খলিফা মনোনীত করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

৫. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (শাসনকাল: ৯৯ - ১০১ হিজরি)ঃ খলিফা সুলাইমানের মৃত্যুর পূর্বে করা বিশেষ অসিয়ত বা উইলের মাধ্যমে ৯৯ হিজরিতে সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে খিলাফতের দায়িত্বে আসেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ। ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে *"পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদিন"* বা "দ্বিতীয় ওমর" বলা হয়। তিনি মাত্র আড়াই বছর শাসন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শাসনকাল ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের হুবহু প্রতিচ্ছবি। ক্ষমতা পেয়েই তিনি রাজকীয় সব বিলাসিতা বর্জন করেন, উমাইয়া রাজপরিবারের অন্যায়ভাবে দখল করা সম্পত্তি জনগণের মাঝে ফিরিয়ে দেন এবং রাজতন্ত্রের মোড়কে খিলাফতের আধ্যাত্মিক রূপ ফিরিয়ে আনেন। বিলাসী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের আদলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, বায়তুল মালের অপচয় বন্ধ করেন এবং প্রথমবার রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তাঁর সুশাসনে সাম্রাজ্য থেকে দারিদ্র্য এমনভাবে দূর হয়েছিল যে, যাকাত নেওয়ার মতো কোনো মানুষ পাওয়া যেত না। ১০১ হিজরিতে

উমাইয়া রাজপরিবারের কিছু ঈর্ষাপরায়ণ সদস্য তাঁকে বিষ প্রয়োগে শহীদ করে। তিনি সিরিয়ার দির সামআন (Dayr Sam'an) নামক স্থানে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ওফাত পান এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৬. ইয়াজিদ ইবনে আব্দুল মালিক (১০১ - ১০৫ হিজরি)ঃ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের ওফাতের পর সুলাইমানের পূর্ব অসিয়ত অনুযায়ী ১০১ হিজরিতে ইয়াজিদ দ্বিতীয় (দ্বিতীয় ইয়াজিদ) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে খারেজিদের পুনরায় উত্থান ঘটে এবং তিনি পূর্ববর্তী খলিফা ওমরের অনেক কল্যাণকর সংস্কার বাতিল করে পুনরায় উমাইয়াদের কঠোর শাসন ফিরিয়ে আনেন। ১০৫ হিজরিতে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে (মতান্তরে তাঁর প্রিয় দাসী হাবাবার মৃত্যুর শোকে) তিনি ওফাত পান এবং দামেস্কে তাঁর জানাজা শেষে উমাইয়া পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

৭.হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক (১০৫ - ১২৫ হিজরি)ঃ ভাই ইয়াজিদের মৃত্যুর পর ১০৫ হিজরিতে মারওয়ানি শাখার অন্যতম সফল ও দীর্ঘমেয়াদী খলিফা হিসেবে ক্ষমতা নেন হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক। তিনি প্রায় ২০ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন, রাষ্ট্রের অর্থনীতি পুনর্গঠন করেন, বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান চালান এবং ফ্রান্সে বিখ্যাত 'টুরসের যুদ্ধ' (Battle of Tours) তাঁর আমলেই সংঘটিত হয়। ১২৫ হিজরিতে রুসাফা (Resafa) নামক প্রাসাদে তিনি ওফাত পান এবং তাঁর জানাজা শেষে রুসাফাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৮. আল-ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ (১২৫ - ১২৬ হিজরি)ঃহিশামের মৃত্যুর পর ১২৫ হিজরিতে আল-ওয়ালিদ দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দামেস্কের সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন চরম বিলাসপ্রিয়, মদ্যপ এবং খিলাফতের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন, যার কারণে উমাইয়া রাজপরিবারের ভেতরেই তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের জন্ম নেয়। মাত্র এক বছর শাসনের পর ১২৬ হিজরিতে তাঁর চাচাতো ভাই ইয়াজিদ ইবনুল ওয়ালিদের অনুগত বাহিনী দামেস্কের কাছে এক প্রাসাদে তাঁকে অবরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং কোনো রাজকীয় সম্মান ছাড়াই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

৯.ইয়াজিদ ইবনে আল-ওয়ালিদ (১২৬ হিজরি)ঃ আল-ওয়ালিদ দ্বিতীয়কে হত্যার পর ১২৬ হিজরিতে দামেস্কের উমাইয়াদের সমর্থনে ইয়াজিদ তৃতীয় ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি রাষ্ট্রের অপচয় ও সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়ায় ইতিহাসে 'নাকিস' বা কমতি আনয়নকারী খলিফা হিসেবে পরিচিত হন এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তে উমাইয়াদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫ থেকে ৬ মাসের মাথায় ১২৬ হিজরির শেষের দিকে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দামেস্কে ওফাত পান এবং বাব আল-সাগীরে দাফন হন।

১০.ইব্রাহিম ইবনে আল-ওয়ালিদ (১২৬ হিজরি) ঃ ভাই ইয়াজিদ তৃতীয়-এর অসিয়ত অনুযায়ী ১২৬ হিজরির শেষের দিকে দামেস্কের নামমাত্র খলিফা হন ইব্রাহিম ইবনে আল-ওয়ালিদ। তাঁর খিলাফত উমাইয়া রাজপরিবারের অন্যান্য শক্তিশালী সেনানায়করা মেনে নেয়নি, যার ফলে সিরিয়াজুড়ে তীব্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। মাত্র দুই-তিন মাস ক্ষমতার থাকার পর মারওয়ান দ্বিতীয়-এর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে আত্মগোপন করেন এবং পরবর্তীতে ১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয়দের হাতে জাব নদীর যুদ্ধে নিহত হন।

১১.মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ (১২৬ - ১৩২ হিজরি)ঃ সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে ১২৬ হিজরিতে মারওয়ানি শাখার তথা সমগ্র উমাইয়া খিলাফতের সর্বশেষ খলিফা হিসেবে ক্ষমতা নেন মারওয়ান দ্বিতীয় (মারওয়ান আল-হিমার)। তিনি রাজধানী দামেস্ক থেকে হাররানে স্থানান্তর করেন এবং পতনোন্মুখ উমাইয়া সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু ততক্ষণে পারস্যে আব্বাসীয় আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয়। ১৩২ হিজরিতে ঐতিহাসিক 'জাবের যুদ্ধে' আব্বাসীয়দের

কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে তিনি মিসরে পালিয়ে যান এবং সেখানেই আব্বাসীয় সৈন্যদের হাতে নিহত হন; তাঁর মৃত্যুর পর মিসরের বুসির নামক স্থানে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায় তাঁর লাশ দাফন করা হয় এবং এর মাধ্যমেই মারওয়ানি উমাইয়া শাসনের চিরতরে অবসান ঘটে।

উমাইয়া খিলাফতের সাফল্য এবং ব্যর্থতা

ইসলামের ইতিহাসে ৪১ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি (৬৬১-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত প্রায় ৯০ বছরের উমাইয়া খিলাফত ছিল একাধারে গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য এবং কিছু মারাত্মক রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যর্থতায় ঘেরা। হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে শুরু করে শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে রাষ্ট্রের রূপরেখা পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল।

উমাইয়া খিলাফতের প্রধান সাফল্যসমূহঃ উমাইয়া আমল ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গতিশীল ও শক্তিশালী যুগ। এই যুগের বড় সাফল্যগুলো হলো:

অভূতপূর্ব সীমানা বিস্তারঃ উমাইয়া আমলেই মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করে। বিশেষকরে খলিফা আল-ওয়ালিদের আমলে তিনটি মহাদেশে ইসলামের পতাকা ওড়ে:

ইউরোপ বিজয়: ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারেক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী স্পেন (আন্দালুস) জয় করে এবং ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

ভারত বা সিন্ধু বিজয়: মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম সিন্ধু নদ পার হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে।

মধ্য এশিয়া বিজয়: কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে বুখারা, সমরকন্দ এবং চীনের সীমান্ত (কাষগড়) পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়।

শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনঃ হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর হাত ধরে মুসলিম নৌবাহিনীর যে সূচনা হয়েছিল, উমাইয়া আমলে তা পূর্ণতা পায়। ভূমধ্যসাগরে রোমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য গুঁড়িয়ে দিয়ে মুসলমানরা সাইপ্রাস, রোডস এবং ক্রিট দ্বীপ জয় করে।

প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারঃ খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের দূরদর্শিতায় রাষ্ট্র একটি আধুনিক রূপ পায়:

আরবিকরণ: পারসি বা গ্রিক ভাষার বদলে আরবিকে রাষ্ট্রের একমাত্র দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক ভাষা করা হয়।

ইসলামী মুদ্রা: রোমান ও পারসি মুদ্রার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে মুসলমানদের নিজস্ব স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) ও রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) চালু করা হয়।

ডাক বিভাগ (বারিড): যোগাযোগ ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য একটি অত্যন্ত দ্রুত ও সুশৃঙ্খল ডাক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

স্থাপত্য ও নগর উন্নয়নঃ উমাইয়া খলিফারা পৃথিবীর বুকে চমৎকার কিছু স্থাপত্য নিদর্শন রেখে গেছেন। জেরুজালেমের বিখ্যাত ও চোখধাঁধানো "*কুব্বাতুস সাখরা*" *আবদুল মালিকের* আমলে নির্মিত হয়।দামেস্কের ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম সেরা নিদর্শন "উমাইয়া মসজিদ" খলিফা ওয়ালিদ নির্মাণ করেন।এছাড়া তাঁরা বিভিন্ন কেল্লা, রাজপ্রাসাদ এবং মরু-উদ্যান গড়ে তোলেন।

খিলাফতের আদর্শে প্রত্যাবর্তন (হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ)ঃ উমাইয়া বংশেরই খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র.) রাজতন্ত্রের সব বিলাসিতা ও জুলুম বন্ধ করে

খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনপদ্ধতি ফিরিয়ে আনেন। তার শাসনামলে রাষ্ট্রে এত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এসেছিল যে, যাকাত নেওয়ার মতো কোনো দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না।

<u>উমাইয়া খিলাফতের প্রধান ব্যর্থতাসমূহঃ</u> উমাইয়াদের সামরিক ও প্রশাসনিক সাফল্য যত বড়ই হোক না কেন, তাদের কিছু নীতিগত ও রাজনৈতিক ভুলই তাদের পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজতন্ত্রের সূচনা ও শুরার বিলুপ্তিঃ উমাইয়াদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বা বিচ্যুতি ছিল খিলাফতের সনাতন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (শুরা বা জনগণের পরামর্শ) বাতিল করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র (Dynastic Rule) চালু করা। হযরত মুআবিয়া (রা.) কর্তৃক ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী করার মাধ্যমে যোগ্যতার চেয়ে বংশ পরিচয় বড় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মুসলমানরা সহজে মেনে নিতে পারেনি।

আহলে বায়তের ওপর চরম নির্যাতনঃ ইয়াজিদের আমলে কারবালার প্রান্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ড উমাইয়াদের গায়ে চিরস্থায়ী কলঙ্কের দাগ লাগিয়ে দেয়। এর পরবর্তীতেও (যেমন খলিফা হিশামের আমলে ইমাম যাইদ ইবনে আলীর শাহাদাত) বিভিন্ন সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধরদের ওপর উমাইয়া শাসকদের নির্মম অত্যাচার উম্মাহর একটি বড় অংশকে তাদের আজীবন শত্রু বানিয়ে দেয়।

আরব বনাম অ-আরব বৈষম্যউমাইয়া খলিফারা আরব জাতীয়তাবাদকে খুব বেশি প্রাধান্য দিতেন। পারস্য (ইরান), মিশর বা মধ্য এশিয়ার যেসব অ-আরব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (যাদের 'মাওয়ালী' বলা হতো), তাদের সাথে উমাইয়া প্রশাসন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করত। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নতুন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর অন্যায়ভাবে জিযিয়া কর চাপিয়ে রাখা হতো। এই চরম বৈষম্যের কারণে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে অ-আরব মুসলিমদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে।

মক্কা ও মদিনার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করাঃ ইয়াজিদের শাসনামলে 'হাররার যুদ্ধে' পবিত্র মদিনা নগরীতে মদ্যপ উমাইয়া বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ, শত শত সাহাবীকে হত্যা এবং মক্কা অবরোধ করে পবিত্র কাবা শরীফে পাথর ও অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করার ঘটনাগুলো মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এই নিষ্ঠুরতা উমাইয়াদের ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও নৈতিক পতনঃউমাইয়া খিলাফতের শেষ পর্বের খলিফারা (যেমন ২য় ওয়ালিদ) অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়, মদ্যপ এবং নৈতিকভাবে স্খলিত হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতার লোভ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, রাজপরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে এবং ভাই ভাইকে বা চাচা ভাতিজাকে হত্যা করতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে।

<u>উমাইয়া খিলাফতের অবসান কীভাবে হলো?</u>

উমাইয়াদের *দীর্ঘ ৯০ বছরের* (৪১-১৩২ হিজরি) রাজতান্ত্রিক খিলাফতের অবসান ঘটে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে, যা ইতিহাসে *"আব্বাসীয় বিপ্লব"* নামে পরিচিত। পতনের মূল কারণসমূহ:

<u>আহলে বায়তের ওপর নির্যাতন ও কারবালার ক্ষোভ:</u> কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের শাহাদাত এবং মদিনা-মক্কায় ইয়াজিদের ধ্বংসযজ্ঞ মুসলমানরা কখনোই মন থেকে ভোলেনি। উমাইয়াদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ জমা ছিল।

আরব-অন আরব বৈষম্য (মাওয়ালী নীতি): উমাইয়া খলিফারা আরবদের বেশি প্রাধান্য দিতেন। পারস্য (ইরান) বা মধ্য এশিয়ার যেসব অ-আরব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (যাদের 'মাওয়ালী' বলা হতো), তাদের সাথে উমাইয়া শাসকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করতেন এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর জিযিয়া কর চাপিয়ে রাখতেন। ফলে অ-আরব মুসলিমদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়।
রাজপরিবারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল: শেষ আমলের উমাইয়া শাহজাদারা ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করেন। ভাই ভাইকে, ভাতিজা চাচাকে হত্যা করতে থাকে, যার ফলে কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে।

চূড়ান্ত পতন ও আব্বাসীয়দের উত্থান: এই তীব্র অসন্তোষকে কাজে লাগায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর বংশধররা, যারা *"আব্বাসীয়"* নামে পরিচিত। তারা গোপনে ইরান ও খোরাসান অঞ্চলে উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের স্লোগান ছিল—"খেলাফতের অধিকার কেবল আহলে বায়ত বা রাসুলুল্লাহর বংশের।" আব্বাসীয়দের পক্ষে *আবু মুসলিম খোরাসানী* নামক এক পারস্য নেতার অধীনে এক বিশাল ও দুর্ধর্ষ বাহিনী গঠিত হয়। কালো পতাকা হাতে এই বাহিনী একের পর এক অঞ্চল উমাইয়াদের হাত থেকে মুক্ত করতে থাকে।

জাবের যুদ্ধ (১৩২ হিজরি/৭৫০ খ্রিস্টাব্দ): ১৩২ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে ইরাকের টাইগ্রিস নদীর উপনদী *"জাব নদীর তীরে"* উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের মধ্যে চূড়ান্ত ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংগঠিত হয়।এই যুদ্ধে আব্বাসীয় বাহিনীর কাছে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।দ্বিতীয় মারওয়ান প্রাণভয়ে মিশরে পালিয়ে যান, কিন্তু সেখানে আব্বাসীয়রা তাঁকে খুঁজে বের করে হত্যা করে।ক্ষমতায় বসেই প্রথম আব্বাসীয় খলিফা *আবু আব্বাস আস-সাফফাহ* (যার অর্থ রক্তপিপাসু) দামেস্কে উমাইয়া রাজপরিবারের জীবিত প্রায় সব সদস্যকে ডেকে এনে এক ভোজসভায় নির্মমভাবে হত্যা করেন। এমনকি পূর্ববর্তী উমাইয়া খলিফাদের কবর খুঁড়ে তাদের হাড়গোড় পুড়িয়ে ফেলা হয়।এই নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে উমাইয়া বংশের কেবল একজন তরুণ শাহজাদা অলৌকিকভাবে বেঁচে যান, তাঁর নাম ছিল *আবদুর রহমান।* তিনি সিরিয়া থেকে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকা হয়ে ইউরোপের *স্পেনে (আন্দালুস)* চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ১৩৮ হিজরিতে (৭৫৬ খ্রি.) নতুন করে উমাইয়া ইমারত প্রতিষ্ঠা করেন, যা আরও প্রায় ৩০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তবে দামেস্ক কেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় উমাইয়া খিলাফতের অবসান ১৩২ হিজরিতেই ঘটে এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব *আব্বাসীয় খিলাফতের* হাতে চলে যায়।

আব্বাসীয় খিলাফত খলিফাগণ ও তাদের সংক্ষিপ্ত শাসন (১৩২-৬৫৬ হিজরি)

আব্বাসীয় খিলাফত ছিল ইসলামের ইতিহাসের দীর্ঘতম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। ১৩২ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০৮ বছরে এই রাজবংশে মোট ৩৭ জন খলিফা শাসন পরিচালনা করেন। এই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রধান এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী খলিফাদের খিলাফতে ইতিহাস তুলে ধরা হলো:
আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ (১৩২ - ১৩৬ হিজরি): উমাইয়াদের নির্মম অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে খোরাসানে শুরু হওয়া ঐতিহাসিক আব্বাসীয় বিপ্লবের চূড়ান্ত সফলতায় ১৩২ হিজরিতে কুফার কেন্দ্রীয় মসজিদে আবুল আব্বাস নিজেকে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল জাব নদীর যুদ্ধে শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান দ্বিতীয়কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা এবং রক্তক্ষয়ী অভিযানের মাধ্যমে উমাইয়াদের ক্ষমতা পুনরুত্থানের

সমস্ত সম্ভাবনা চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া। ১৩৬ হিজরির জিলহজ মাসে তিনি আনবার নগরীতে গুটিবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে ওফাত পান এবং তাঁর ভাই আবু জাফর আল-মনসুর তাঁর জানাজা পড়ানোর পর আনবার প্রাসাদের ভেতরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

আবু জাফর আল-মনসুর (১৩৬ - ১৫৮ হিজরি): ভাই আস-সাফফাহ-এর মৃত্যুর পর ১৩৬ হিজরিতে খিলাফতের দায়িত্ব নেন আবু জাফর আল-মনসুর, যাঁকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান স্থপতি বলা হয়। তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ চরম বিশৃঙ্খলা, আবু মুসলিম খোরাসানির মতো ক্ষমতাধর বিপ্লবীদের দমন করেন এবং সবচেয়ে ঐতিহাসিক কাজ হিসেবে ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে দজলা নদীর তীরে বিশ্ববিখ্যাত ও সুপরিকল্পিত *বাগদাদ নগরী* প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৫৮ হিজরিতে হজের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওনা হয়ে মক্কার অদূরেই বীর আল-মাইমুন নামক স্থানে তিনি ওফাত পান এবং মক্কার আল-মুআল্লা গোরস্থানে অত্যন্ত গোপনে তাঁর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়।

আবু আব্দুল্লাহ আল-মাহদি (১৫৮ - ১৬৯ হিজরি): পিতা আল-মনসুরের অসিয়ত ও মনোনয়ন অনুযায়ী ১৫৮ হিজরিতে খিলাফতের সিংহাসনে বসেন তাঁর অত্যন্ত যোগ্য পুত্র আল-মাহদি। তিনি পিতার কঠোর রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এক উদার, ক্ষমাশীল ও জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেন, বন্দিদের মুক্তি দেন, ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি করেন এবং বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৬৯ হিজরিতে শিকার করতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে (মতান্তরে তাঁর এক উপপত্নীর দেওয়া বিষাক্ত খাবার খেয়ে) তিনি মাসাবদান নামক স্থানে ওফাত পান এবং তাঁর পুত্র আল-হাদি তাঁর জানাজা পড়ানোর পর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

আবু মুহাম্মদ আল-হাদি (১৬৯ - ১৭০ হিজরি): পিতা আল-মাহদির মনোনয়ন অনুসারে ১৬৯ হিজরিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আল-হাদি। তাঁর মাত্র ১ বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল ছিল খারেজি ও শিয়া বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত কঠোর, বিশেষ করে মক্কার কাছে ঐতিহাসিক ফাক-এর যুদ্ধে শিয়াদের বিদ্রোহ তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। ১৭০ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে বাগদাদের কাছে ঈসাবাদ প্রাসাদে তিনি আকস্মিকভাবে ওফাত পান (ধারণা করা হয় তাঁর মা খাইজুরানের ইঙ্গিতে তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল) এবং ঈসাবাদেই তাঁর জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

হারুন আল-রশিদ (১৭০ - ১৯৩ হিজরি): ভাই আল-হাদির মৃত্যুর পর ১৭০ হিজরিতে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও কিংবদন্তি খলিফা হারুন আল-রশিদ। তাঁর ২৩ বছরের শাসনকাল ছিল ইসলামি স্বর্ণযুগের (Islamic Golden Age) চূড়ান্ত শিখর, যেখানে তিনি বাগদাদকে বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত করেন, ফ্রান্সের রাজা শার্লামেনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়েন এবং জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত *"বাইতুল হিকমাহ"* প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩ হিজরিতে খোরাসানের একটি বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ইরানের তূস (বর্তমান মাশহাদ) নগরীতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে ওফাত পান এবং তূসের মাটিতেই তাঁর জানাজা শেষে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দাফন করা হয়।

আবু মুসা আল-আমিন (১৯৩ - ১৯৮ হিজরি): পিতা হারুন আল-রশিদের অসিয়ত ও প্রথম উত্তরাধিকারী হিসেবে ১৯৩ হিজরিতে বাগদাদের খলিফা হন আল-امين। তিনি খিলাফতে বসার পর পিতার উইল ভঙ্গ করে তাঁর সৎ ভাই আল-মামুনকে উত্তরাধিকারী থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করলে আব্বাসীয় ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ (চতুর্থ ফিতনা) শুরু হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছরের যুদ্ধের পর ১৯৮ হিজরিতে আল-মামুনের প্রধান সেনাপতি তাহির ইবনে হুসাইনের বাহিনী বাগদাদ

অবরোধ করে আল-আমিনকে বন্দি ও শিরশ্ছেদ করে হত্যা করে এবং কোনো রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল ছাড়াই বাগদাদের একটি সাধারণ কবরস্থানে তাঁর দাফন হয়।

আবু আব্বাস আল-মামুন (১৯৮ - ২১৮ হিজরি): ভাই আল-আমিনের নির্মম পতনের পর ১৯৮ হিজরিতে একক খলিফা হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন আল-মামুন, যিনি ছিলেন একাধারে পরম পণ্ডিত এবং দূরদর্শী শাসক। তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত "বাইতুল হিকমাহ"-কে এক বিশাল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেন, গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞান-দর্শন আরবিতে অনুবাদের জন্য বিশ্বব্যাপী অনুবাদ আন্দোলন (Translation Movement) শুরু করেন এবং সরকারিভাবে মুতাজিলা মতবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। ২১৮ হিজরির রজব মাসে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময় রোম সীমান্তের কাছে বুদানদুন (বর্তমান তুরস্কের তারসুস) নামক স্থানে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি ওফাত পান এবং তারসুসের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে তাঁর জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

আবু ইসহাক আল-মুতাসিম (২১৮ - ২২৭ হিজরি): ভাই আল-মামুনের মৃত্যুর পর ২১৮ হিজরিতে খিলাফতের দায়িত্ব নেন আল-মুতাসিম বিল্লাহ। তিনি বাগদাদের আরব ও পারসিয়ানদের প্রভাব কমাতে রাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীতে হাজার হাজার শক্তিশালী **তুর্কি দাস সেনা** (Mamluks) নিয়োগ করেন এবং তুর্কিদের জন্য বাগদাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে **সামাররা** নামক এক নতুন ও জমকালো রাজধানী শহর গড়ে তোলেন। ২২৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সামাররা রাজপ্রাসাদে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে ওফাত পান এবং তাঁর নতুন রাজধানী সামাররাতেই অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে তাঁর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

আবু জাফর আল-ওয়াশিক (২২৭ - ২৩২ হিজরি): পিতা আল-মুতাসিমের ওফাতের পর ২২৭ হিজরিতে সামাররার সিংহাসনে বসেন আল-ওয়াশিক বিল্লাহ। তিনি তাঁর পিতা ও চাচার মতো মুতাজিলা মতবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন এবং আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো সনাতনপন্থীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন অব্যাহত রাখেন, তবে তাঁর আমলে কৃষি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। ২৩২ হিজরির জিলহজ মাসে অতিরিক্ত মাত্রায় চর্বি ও জলীয় রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে ওফাত পান এবং সামাররার উমরিয়া প্রাসাদের পাশে তাঁর জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

জাফর আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২ - ২৪৭ হিজরি): ভাই আল-ওয়াশিকের মৃত্যুর পর ২৩২ হিজরিতে তুর্কি সেনাপতিদের সমর্থনে খলিফা হন আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ। তিনি দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় মুতাজিলা নীতি সম্পূর্ণ বাতিল করে সুন্নি ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটান, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে মুক্তি দিয়ে সম্মানিত করেন এবং সামাররার বিখ্যাত 'মালউইয়া' বা সর্পিল মিনারের মহামসজিদ নির্মাণ করেন। ২৪৭ হিজরির শাওয়াল মাসে তাঁর কট্টর সুন্নি নীতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর নিজের ছেলে আল-মুনতাসির এবং তুর্কি রক্ষীবাহিনীর এক যৌথ গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রে তিনি নিজ প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে নিহত হন এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সামাররাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সামাররার নৈরাজ্য ও পরবর্তী খলিফাগণ (২৪৭ - ৫৩০ হিজরি): খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের হত্যাকাণ্ডের পর আব্বাসীয় খিলাফত চরম রাজনৈতিক দুর্বলতার যুগে প্রবেশ করে, যা ইতিহাসে 'সামাররার নৈরাজ্য' নামে পরিচিত; এই দীর্ঘ সময়ে আল-মুনতাসির, আল-মুস্তাইন, আল-মুতাজ, আল-মুহতাদি এবং আল-মুতামিদের মতো একের পর এক খলিফারা তুর্কি সামরিক জান্তার হাতের পুতুলে পরিণত হন। এ সময় উম্মাহর রাজনৈতিক ক্ষমতা মূলত বুয়ী (Buyid) এবং সেলজুক (Seljuk) সুলতানদের হাতে চলে যায়, যার ফলে খলিফাদের কাজ কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এই যুগের অধিকাংশ খলিফাই আততায়ী

কর্তৃক নিহত বা পদচ্যুত হয়ে বাগদাদের বিভিন্ন পারিবারিক কবরস্থানে দাফন হন।
আল-মুসতাদীয় ও আল-নাসির (৫৩০ - ৬২২ হিজরি): দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার পর খলিফা আল-মুগতাফি এবং পরবর্তীতে ৫৭৫ হিজরিতে ক্ষমতা নেওয়া আল-নাসির লি-দ্বীনিলাহ-এর আমলে আব্বাসীয় খিলাফত পুনরায় নিজস্ব সামরিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়। আল-নাসির দীর্ঘ ৪৭ বছর অত্যন্ত সফলভাবে শাসন করেন, মধ্য এশিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করেন এবং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ক্রুসেড যুদ্ধকে পূর্ণ ধর্মীয় ও নৈতিক সমর্থন জোগান। ৬২২ হিজরির শবে বরাতের রাতে বাগদাদে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে তিনি ওফাত পান এবং বাগদাদের বিখ্যাত রুসাফা নামক উমাইয়া-আব্বাসীয় রাজকীয় গোরস্থানে তাঁর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।
আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (৬৪০ - ৬৫৬ হিজরি): ৬৪০ হিজরিতে আব্বাসীয় বংশের ৩৭ তম তথা সর্বশেষ খলিফা হিসেবে বাগদাদের সিংহাসনে বসেন আল-মুসতাসিম বিল্লাহ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, অদূরদর্শী এবং শিয়া উজির ইবনুল আলকামির চক্রান্তে অন্ধ, যিনি হালাকু খানের মঙ্গোল বাহিনীর শক্তিকে সম্পূর্ণ অবমূল্যায়ন করেছিলেন। ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) হালাকু খানের বর্বর মঙ্গোল বাহিনী বাগদাদ অবরোধ করে ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা চালায়, বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয় এবং খলিফা আল-মুসতাসিমকে একটি কার্পেটের ভেতর মুড়িয়ে ঘোড়ার খুরের নিচে পিষে নির্মমভাবে হত্যা করে; তাঁর এই ভয়াবহ শাহাদতের পর মঙ্গোলরা তাঁর জানাজা বা দাফনের কোনো সুযোগ দেয়নি, যার ফলে দজলা নদীর রক্ত ও ছাইয়ের মাঝেই এই দীর্ঘ গৌরবময় আব্বাসীয় খিলাফতের চিরতরে যবনিকা পতন ঘটে।

আব্বাসী খিলাফতের সাফল্য এবং ব্যর্থতা

আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০-১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রভাবশালী সাম্রাজ্য। দীর্ঘ ৫০৮ বছরের এই শাসনকালে আব্বাসীয়রা যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার শিখরে পৌঁছেছিল, তেমনি অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অদূরদর্শিতার কারণে একসময় ধ্বংসের মুখে পড়ে।

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান সাফল্যসমূহঃ আব্বাসীয় আমলকে ইসলামি ইতিহাসের *'স্বর্ণযুগ'* বলা হয়। তাদের প্রধান সাফল্যগুলো ছিল মূলত জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে:
জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিকাশ ও বাইতুল হিকমাহ: খলিফা হারুন আল-রশিদ এবং আল-মামুনের হাত ধরে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয় *'বাইতুল হিকমাহ'* । এটি ছিল একাধারে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি ও অনুবাদ কেন্দ্র। এখানে গ্রিক, ভারতীয়, পারসিয়ান এবং মিশরীয় দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হয়। আল-খোয়ারিজমি (বীজগণিতের জনক), ইবনে সিনা (চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক), এবং আল-কিন্দির মতো বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা এই আমলেই তাঁদের অবদান রাখেন।
বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা ও বৈশ্বিক কেন্দ্র: খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর কর্তৃক ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত 'বাগদাদ' (দারুস সালাম) তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক, সমৃদ্ধ এবং সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়। এটি ছিল বিশ্বের বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।
সামাজিক সমতা ও ইসলামি সংস্কৃতির বিশ্বায়ন: উমাইয়া আমলে যেখানে আরবদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হতো এবং অ-আরব মুসলিমদের (মাওয়ালি) বৈষম্য করা হতো, আব্বাসীয়রা সেই নীতি পরিবর্তন করে। পারসিয়ান, তুর্কি ও আফ্রিকান মুসলিমরা রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা ও উচ্চপদ পেতে শুরু করে, যার ফলে ইসলাম একটি বৈশ্বিক ও বহুমাত্রিক সংস্কৃতিতে রূপ নেয়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: আব্বাসীয় আমলে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়। চীন থেকে শুরু করে ইউরোপ ও আফ্রিকা পর্যন্ত মুসলিম বণিকরা সমুদ্র ও স্থলপথে বাণিজ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। কাগজের কল প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার (চেক বা 'সাক' প্রথা) সূচনা এই আমলেই হয়েছিল।

ইসলামি ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের সংকলন: এই যুগেই ইসলামের প্রধান চার ইমাম (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ফিকহ্-এর ভিত্তি মজবুত করেন। পাশাপাশি বুখারী, মুসলিমসহ 'সিয়াহ সিততাহ' বা প্রধান ৬টি হাদিস গ্রন্থ এই আমলেই সংকলিত হয়।

আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান ব্যর্থতাসমূহঃ সাফল্যের পাশাপাশি আব্বাসীয় খিলাফতের ভেতরের কিছু কাঠামোগত ত্রুটি ও ভুল সিদ্ধান্তই তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়:

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যের ভাঙন: আব্বাসীয় খিলাফত উত্তর আফ্রিকা থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু খলিফারা বাগদাদের আরাম-আয়েশে মগ্ন হয়ে পড়ায় দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে স্পেন (উমাইয়া), মিশর (ফাতিমীয়), উত্তর আফ্রিকা (আঘলাবীয়) এবং পারস্যে (সামানীয় ও বুয়ী) একের পর এক স্বাধীন রাজবংশ গড়ে ওঠে এবং খিলাফত সংকুচিত হয়ে পড়ে।

তুর্কি সৈন্যদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা: খলিফা আল-মুতাসিম নিজের সুরক্ষার জন্য হাজার হাজার তুর্কি দাস সৈন্য (মামলুক) নিয়োগ করেন। এটি ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। পরবর্তীতে এই তুর্কি সেনাপতিরা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, তারা খলিফাদের হাতের পুতুলে পরিণত করে। খলিফা কাকে বানানো হবে বা কাকে হত্যা করা হবে—তা তুর্কি সামরিক জান্তারা ঠিক করত।

ধর্মীয় ও মতাদর্শিক কোন্দল: খলিফা আল-মামুন কর্তৃক 'মুতাজিলা' (যুক্তিবাদী) মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় নীতি হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া এবং এর বিরোধিতা করায় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ সুন্নি স্কলারদের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতন (মিহনা) চালানো হয়। এটি খিলাফতের সাথে সাধারণ জনগণের দূরত্ব তৈরি করে। পরবর্তীতে শিয়া-সুন্নি দাঙ্গাও রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়।

বিলাসিতা এবং নৈতিক পতন: প্রথম দিকের খলিফারা কঠোর ও দূরদর্শী হলেও, হারুন আল-রশিদের পরবর্তী যুগের অধিকাংশ খলিফা রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা, মদ্যপান, নাচ-গান এবং হারেমের নারী-দাসীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে শূন্য হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং দুর্বল হয়ে পড়ে সামরিক বাহিনী।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবহেলা ও চূড়ান্ত পতন: খিলাফতের শেষ সময়ে মধ্য এশিয়া থেকে ধেয়ে আসা মঙ্গোলদের বর্বর শক্তির ব্যাপারে খলিফারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সর্বশেষ খলিফা আল-মুস্তাসিম তাঁর উজিরের কথায় অন্ধ হয়ে সামরিক বাজেট কমিয়ে দেন এবং সেনাবাহিনী ছাঁটাই করেন। যার খেসারত হিসেবে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের মঙ্গোল বাহিনী কোনো বাধা ছাড়াই বাগদাদ ধ্বংস করে এবং খলিফাকে ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে হত্যা করে খিলাফতের অবসান ঘটায়।

আব্বাসীয় খিলাফত মানব সভ্যতাকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির দিক থেকে শত বছর এগিয়ে দিয়েছিল (সাফল্য), কিন্তু রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা, সামরিক বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি (ব্যর্থতা)।

আব্বাসী খিলাফতের অবসান কীভাবে হলো?

আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ছিল ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ, রক্তক্ষয়ী এবং নির্মম একটি ট্র্যাজেডি। মূলত বাহ্যিক মঙ্গোল আক্রমণ এবং খিলাফতের অভ্যন্তরীণ চরম দুর্বলতার কারণে *১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে (৬৫৬ হিজরিতে)* এই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।খলিফা আল-মুসতাসিমের প্রধান উজির ইবনুল আলকামী ছিলেন একজন কট্টর শিয়া। তিনি গোপনে *মঙ্গোল নেতা হলাকু* খানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং খলিফাকে বোঝান যে, মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধ করার দরকার নেই, সেনাবাহিনী কমিয়ে খরচ কমানো হোক। তাঁর পরামর্শে খলিফা সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১ লাখ থেকে কমিয়ে মাত্র ১৫ হাজারে নামিয়ে আনেন। ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিকে হলাকু খান খলিফাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। খলিফা অহংকারবশত তা প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে হলাকু খানের প্রায় ২ লাখ মঙ্গোল সৈন্য বাগদাদ চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। খলিফার ক্ষুদ্র বাহিনী মঙ্গোলদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। কোনো উপায় না দেখে ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খলিফা আল-মুসতাসিম তাঁর পরিবার এবং দরবারের কর্মকর্তাদের নিয়ে হলাকু খানের তাঁবুতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। হলাকু খান খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। মঙ্গোলদের বিশ্বাস ছিল—রাজপরিবারের রক্ত মাটিতে পড়লে অভিশাপ নেমে আসে। তাই খলিফাকে একটি কার্পেটে বা চামড়ার বস্তায় মুড়িয়ে তার ওপর ঘোড়া দিয়ে পিষে থেঁতলে হত্যা করা হয়।

বাগদাদের গণহত্যা ও সাংস্কৃতিক ক্ষতি: খলিফাকে হত্যার পর হলাকু খান বাগদাদ নগরীতে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েও তা ভঙ্গ করে এবং মঙ্গোল সেনারা শহরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে বাগদাদে গণহত্যা চালানো হয়। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেওয়া হয়নি। সমকালীন ইতিহাসবিদদের মতে, প্রায় *৮ লাখ থেকে ২০ লাখ* মানুষকে জবাই করা হয়েছিল। টাইগ্রিস নদীর পানি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।মঙ্গোলরা 'বাইতুল হিকমাহ'সহ বাগদাদের শত শত লাইব্রেরি ধ্বংস করে দেয়। লক্ষ লক্ষ অমূল্য বই, পাণ্ডুলিপি তারা টাইগ্রিস নদীতে ফেলে দেয়। বইয়ের কালির কারণে নদীর পানি কালো হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়, মানব সভ্যতার ৫০০ বছরের জ্ঞান কয়েকদিনে মুছে দেওয়া হয়েছিল।

*পরবর্তী অধ্যায় (কায়রোতে নামেমাত্র খিলাফত):*১২৫৮ সালে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও স্বাধীন আব্বাসীয় খিলাফত চিরতরে শেষ হয়ে যায়। তবে এই হত্যাকাণ্ডের পর আব্বাসীয় বংশের একজন শাহজাদা অলৌকিকভাবে বেঁচে যান এবং মিশরে পালিয়ে যান। মিশরের শক্তিশালী *মামলুক সুলতানরা* তাঁকে আশ্রয় দেয় এবং ১২৬১ খ্রিষ্টাব্দে মিশরের রাজধানী *কায়রোতে* পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফত ঘোষণা করে। তবে কায়রোর এই আব্বাসীয় খলিফাদের কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা ছিল না, তাঁরা ছিলেন কেবল ধর্মীয় প্রতীক। পরবর্তীতে ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে উসমানীয় (অটোমান) সুলতান সেলিম কায়রো জয় করলে শেষ আব্বাসীয় খলিফা ৩য় আল-মুতাওয়াক্কিল উসমানীয়দের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন এবং এর মাধ্যমে আব্বাসীয় নামের চিরতরে অবসান ঘটে।

উসমানীয় বা অটোমান খিলাফত (১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ- ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

উসমানীয় বা অটোমান খিলাফতের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও গৌরবময়। (১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ ৬২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রাজবংশের ৩৬ জন শাসক (সুলতান) শাসন পরিচালনা করেন। তবে শুরুর দিকে তাঁরা কেবল 'সুলতান' উপাধি ব্যবহার করতেন; ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম সেলিম মিশরের মামলুকদের পরাজিত করার পর থেকে

এই রাজবংশ আনুষ্ঠানিকভাবে 'খিলাফতের' দায়িত্ব লাভ করে। খিলাফত যুগের প্রধান ও সবচেয়ে প্রভাবশালী উসমানীয় খলিফাদের ইতিহাস হলো:

সুলতান প্রথম সেলিম (১৫১২ - ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ): ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে পিতা দ্বিতীয় বায়েজিদকে সিংহাসন চ্যুত করে এক রক্তক্ষয়ী পারিবারিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন সুলতান প্রথম সেলিম (সেলিম ইয়াভুজ)। তিনি পারস্যের সাফাভিদের চালদিরানের যুদ্ধে এবং ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে মিশরের মামলুকদের মার্জ দাবিক ও রিদানিয়ার যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম এবং কায়রোর নিয়ন্ত্রণ নেন এবং আব্বাসীয়দের শেষ খলিফা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব উসমানীয় রাজবংশে স্থানান্তর করেন। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে একটি মারাত্মক চর্মরোগে (অ্যানথ্রাক্স বা সিরপেনকিল) আক্রান্ত হয়ে এদির্নে যাওয়ার পথে তিনি ওফাত পান এবং ইস্তাম্বুলের ফাতিহ মসজিদে তাঁর জানাজা শেষে তাঁর স্মরণে নির্মিত সুলতান সেলিম মসজিদে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলাইমান আল-কানুনী (১৫২০ - ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ): পিতা প্রথম সেলিমের ওফাতের পর ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে কোনো অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই উসমানীয় সাম্রাজ্যের দশম সুলতান এবং দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে ক্ষমতায় বসেন সুলাইমান (ইউরোপে যিনি 'সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট' নামে পরিচিত)। তাঁর ৪৬ বছরের দীর্ঘতম শাসনকাল ছিল উসমানীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যার অধীনে তিনি বেলগ্রেড, হাঙ্গেরি এবং রোডস দ্বীপ জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যকে ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যান, একটি সুসংগঠিত আইনি কোড (কানুন) তৈরি করেন এবং স্থাপত্যবিদ সিনানের মাধ্যমে বিখ্যাত সুলাইমানিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরির সিগেটভার দুর্গ অবরোধের সময় রাজকীয় তাঁবুতে তিনি স্বাভাবিকভাবে ওফাত পান এবং ইস্তাম্বুলে ফিরিয়ে এনে তাঁর জানাজা সম্পন্ন করার পর সুলাইমানিয়া মসজিদের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান দ্বিতীয় সেলিম (১৫৬৬ - ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ): পিতা সুলাইমানের ওফাতের পর ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বেঁচে থাকা একমাত্র পুত্র হিসেবে উসমানীয় খিলাফতের মসনদে বসেন দ্বিতীয় সেলিম। তিনি পিতার মতো নিজে যুদ্ধে সশরীরে অংশ না নিলেও তাঁর প্রধান উজির সোকোল্লু মুহাম্মদ পাশার মাধ্যমে সাইপ্রাস এবং তিউনিসিয়া জয় করে সাম্রাজ্যের সীমানা ধরে রাখেন এবং এদির্নে বিখ্যাত 'সেলিমিয়া মসজিদ' নির্মাণ করেন। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে তোপকাপি প্রাসাদের স্নানাগারে পা পিছলে পড়ে গিয়ে (মতান্তরে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে স্ট্রোক করে) তিনি ওফাত পান এবং ইস্তাম্বুলের বিশ্ববিখ্যাত হাজিয়া সোফিয়া (আইয়া সোফিয়া) মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

সুলতান প্রথম আহমেদ (১৬০৩ - ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দ): মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে পিতা তৃতীয় মুহাম্মদের আকস্মিক মৃত্যুর পর উসমানীয় সাম্রাজ্যের খলিফা হন প্রথম আহমেদ। তিনি রাজপরিবারে ভাই হত্যার নিষ্ঠুর প্রথা (Fratricide) বাতিল করে সবচেয়ে প্রবীণ ও যোগ্য সদস্যের ক্ষমতায় আসার 'একবারিয়াত' নিয়ম চালু করেন এবং ইস্তাম্বুলের বুকে পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর স্থাপত্য ব্লু মস্ক বা সুলতান আহমেদ মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৭ বছর বয়সে টাইফয়েড ও পাকস্থলীর মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি তোপকাপি প্রাসাদে ওফাত পান এবং তাঁর নিজের নির্মিত ব্লু মস্ক বা সুলতান আহমেদ মসজিদের পাশেই রাজকীয় সমাধিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩ - ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ): ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১১ বছর বয়সে চাচা প্রথম মুস্তাফাকে পদচ্যুত করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের খলিফা হন চতুর্থ মুরাদ, যার প্রাথমিক শাসনে তাঁর মা কোসেম সুলতান অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্র চালান। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর হস্তে রাষ্ট্রের দুর্নীতি দমন করেন, কফি ও তামাক নিষিদ্ধ করেন এবং সাফাভিদের

কাছ থেকে বাগদাদ ও ইরাক পুনরুদ্ধার করে উসমানীয় সামরিক গৌরব পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৭ বছর বয়সে অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত লিভার সিরোসিস বা গেঁটে বাতের তীব্র যন্ত্রণায় ভুগে তিনি ওফাত পান এবং ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমেদ মসজিদের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর জানাজা শেষে দাফন করা হয়।

সুলতান দ্বিতীয় মুস্তফা (১৬৯৫ - ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ): ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে চাচা দ্বিতীয় আহমেদের মৃত্যুর পর উসমানীয় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দ্বিতীয় মুস্তফা। তিনি ইউরোপে হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য নিজে হাঙ্গেরি অভিযানে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু জেন্তার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার কাছে ভয়াবহভাবে পরাজিত হয়ে ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে উসমানীয়দের জন্য ক্ষতিকর 'কার্লোউইটজ চুক্তি' সই করতে বাধ্য হন, যার ফলে ইউরোপে উসমানীয় পিছুটান শুরু হয়। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের জেনিসারি সৈন্যদের এক বিশাল বিদ্রোহের (এদির্নে ঘটনা) মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং এর মাত্র কয়েক মাস পর তোপকাপি প্রাসাদে বন্দি অবস্থায় ওফাত পান; পরবর্তীতে ইস্তাম্বুলের নতুন মসজিদের (ইয়েনি মসজিদ) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুলতান তৃতীয় আহমেদ (১৭০৩ - ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ): ভাই দ্বিতীয় মুস্তফার পদত্যাগের পর ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীদের সমর্থনে সিংহাসনে বসেন তৃতীয় আহমেদ। তাঁর শাসনকালকে উসমানীয় ইতিহাসে 'টিউলিপ যুগ' (Tulip Period) বলা হয়, যেখানে তিনি ইউরোপের সাথে শান্তি বজায় রেখে শিল্প, সংস্কৃতি, বাগান এবং প্রিন্টিং প্রেসের মতো আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটান, পাশাপাশি রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেটকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে পটরোনা হালিল নামক এক সাধারণ সৈনিকের নেতৃত্বে জেনিসারিরা তাঁর অতিরিক্ত বিলাসী জীবনযাপনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে বন্দি অবস্থায় ওফাত পাওয়ার পর ইস্তাম্বুলের ইয়েনি মসজিদের রাজকীয় সমাধিতে দাফন হন।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (১৮০৮ - ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ): ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানে ভাই চতুর্থ মুস্তফাকে হটিয়ে খিলাফতের ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় মাহমুদ, যাঁকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের আধুনিকায়নের প্রধান স্থপতি বা 'পিটার দ্য গ্রেট' বলা হয়। তিনি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বাধা উগ্র সামরিক বাহিনী 'জেনিসারি দল' কে এক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন (শুভ ঘটনা), আধুনিক ইউরোপীয় ধাঁচের সেনাবাহিনী গড়েন, সরকারি পোশাক ও কর ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইস্তাম্বুলে ওফাত পান এবং দিভানইয়োলু নামক স্থানে তাঁর জানাজা শেষে তাঁর জন্য নির্মিত বিশেষ এক জমকালো রাজকীয় সমাধিতে দাফন করা হয়।

সুলতান আব্দুল মজিদ (১৮৩৯ - ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ): পিতা দ্বিতীয় মাহমুদের ওফাতের পর ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১৬ বছর বয়সে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেন প্রথম আব্দুল মজিদ। তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে আধুনিক ও পশ্চিমা ধাঁচে পুনর্গঠন করতে বিখ্যাত 'তানজিমাত' (Tanzimat) সংস্কার যুগের সূচনা করেন, যেখানে মুসলিম-অমুসলিম সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়, কাগজের মুদ্রা চালু হয় এবং তোপকাপি প্রাসাদ ছেড়ে ইউরোপীয় ধাঁচের জমকালো দোলমাবাহচে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে পিতার মতোই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ওফাত পান এবং ইস্তাম্বুলের ঐতিহাসিক সুলতান সেলিম মসজিদের পাশে তাঁর জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (১৮৭৬ - ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ): ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ভাই পঞ্চম মুরাদকে মানসিক অসুস্থতার কারণে পদচ্যুত করে এক চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখে উসমানীয় খিলাফতের দায়িত্ব নেন দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। তিনি সাম্রাজ্যের প্রথম সংবিধান (কানুনি এসাসি) ঘোষণা করেন, হিজাজ রেলওয়ে ও প্যান-ইসলামিজম (মুসলিম ঐক্য)

আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধার চেষ্টা করেন এবং ইহুদিদের বিপুল অর্থের বিনিময়েও ফিলিস্তিনের মাটিতে বসতি স্থাপনের প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমা ঘেঁষা 'ইয়ং টার্কস' বিপ্লবীদের দ্বারা তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দি হন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বেল্যারবেয়ী প্রাসাদে ওফাত পাওয়ার পর ইস্তাম্বুলে তাঁর পিতা দ্বিতীয় মাহমুদের সমাধির পাশেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে দাফন করা হয়।

সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদউদ্দিন (১৯১৮ - ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষলগ্নে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ভাই পঞ্চম মুহাম্মদের মৃত্যুর পর চরম ধ্বংসোন্মুখ উসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান ও খলিফা হিসেবে ক্ষমতা নেন ষষ্ঠ মুহাম্মদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর কাছে উসমানীয়দের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর তিনি বাধ্য হয়ে অপমানজনক 'সেভরেস চুক্তি' সই করেন, যার ফলে ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়া মিত্রবাহিনী দখল করে নেয় এবং তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বাধীন তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি সুলতানাত বা রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করলে তিনি একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে করে মাল্টায় নির্বাসনে চলে যান এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালির সান রেমোতে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় ওফাত পান; পরবর্তীতে সিরিয়ার দামেস্কের সুলতান সুলাইমানিয়া মসজিদের প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।

খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ (১৯২২ - ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ): সুলতানাত বিলুপ্ত হওয়ার পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে উসমানীয় রাজবংশের শেষ আশার আলো হিসেবে কেবল ধর্মীয় প্রধান বা 'খলিফা' হিসেবে নির্বাচিত হন দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ, যাঁর কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতা ছিল না। তিনি মাত্র দেড় বছর নামমাত্র খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, কারণ ৩রা মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং উসমানীয় রাজপরিবারের সবাইকে তুরস্ক থেকে নির্বাসিত করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারিসে নির্বাসিত অবস্থায় তিনি ওফাত পান এবং দীর্ঘ আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতার কারণে ফ্রান্সে তাঁর লাশ ১০ বছর মর্গেই পড়ে থাকে; পরবর্তীতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের পবিত্র মদিনা নগরীর জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থায় এই শেষ উসমানীয় খলিফার জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়।

উসমানীয় বা অটোমান খিলাফতের সাফল্য এবং ব্যর্থতা

উসমানীয় বা অটোমান সাম্রাজ্য (১২৯৯-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশাল এক সাম্রাজ্য। তিনটি মহাদেশ জুড়ে (ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা) বিস্তৃত এই সাম্রাজ্য মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির প্রতীক ছিল।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রধান সাফল্যসমূহঃ উসমানীয়দের মূল শক্তি ছিল তাদের সামরিক শৃঙ্খলা, অনন্য শাসনব্যবস্থা এবং বিশ্ব রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান। তাদের প্রধান সাফল্যগুলো হলো:

কনস্টান্টিনোপল বিজয় (১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ): সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (দ্বিতীয় মুহাম্মদ) মাত্র ২১ বছর বয়সে তৎকালীন রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং অজেয় নগরী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন। এর মাধ্যমে মধ্যযুগের অবসান ঘটে, ইসলামের একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হয় এবং শহরটি 'ইস্তাম্বুল' নামে খিলাফতের নতুন রাজধানী হয়।

তিনটি মহাদেশে ইসলামি শাসন ও নিরাপত্তা: উসমানীয়রা তাদের সোনালী যুগে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ (বলকান অঞ্চল, হাঙ্গেরি, গ্রিস), সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপের

ওপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশাল অঞ্চলে তারা দীর্ঘ সময় ধরে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

খিলাফতের পুনরুজ্জীবন ও পবিত্র স্থানসমূহের খিদমত: ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান প্রথম সেলিম মিশরের মামলুকদের পরাজিত করে খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব উসমানীয়দের হাতে নেন। তাঁরা মক্কা ও মদিনার 'খাদেম' (সেবক) উপাধি ধারণ করেন। সুলতানদের তত্ত্বাবধানে পবিত্র কাবা শরিফ, মসজিদে নববী এবং জেরুজালেমের আকসা মসজিদের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়।

অনন্য আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো (Tanzimat & Kanun): সুলতান সুলাইমান আল-কানুনী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি যুগান্তকারী এবং সুসংগঠিত আইনি কোড তৈরি করেন, যা অপরাধ দমন, কর আদায় ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে অনন্য ছিল। পরবর্তীতে ১৯ শতকে 'তানজিমাত' সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়।

মিল্লাত ব্যবস্থা ও ধর্মীয় সহনশীলতা: উসমানীয় সাম্রাজ্যে 'মিল্লাত' (Millets) নামক একটি চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। এর অধীনে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মতো অমুসলিম সংখ্যালঘুরা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন ও আদালতের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনার পূর্ণ স্বাধীনতা পেত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের ওপর কোনো ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া হতো না।

স্থাপত্য ও শিল্পের বিকাশ: উসমানীয় স্থাপত্যশৈলী ছিল পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ। প্রধান স্থাপত্যবিদ সিনানের তৈরি 'সুলাইমানিয়া মসজিদ', ইস্তাম্বুলের 'ব্লু মস্ক' বা সুলতান আহমেদ মসজিদ এবং তোপকাপি প্রাসাদ উসমানীয় শিল্প ও ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

<u>উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যর্থতাসমূহ:</u> দীর্ঘ গৌরবময় অধ্যায়ের পর উসমানীয়দের কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা, ভুল সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক যুগের সাথে তাল মেলাতে না পারার ব্যর্থতাই তাদের পতনের দিকে ঠেলে দেয়:

আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্প বিপ্লবকে অবহেলা: ১৮ শতকে যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লব (Industrial Revolution) শুরু হয় এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কল-কারখানার ব্যাপক বিকাশ ঘটে, উসমানীয়রা তখন তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও যুদ্ধরীতির ওপর ভরসা করে বসে ছিল। তারা আধুনিক শিক্ষার চেয়ে সনাতন ধারায় আটকে থাকায় ইউরোপের চেয়ে প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়ে।

সামরিক বাহিনীর অবক্ষয় ও জেনিসারি ফিতনা: উসমানীয়দের মূল চালিকাশক্তি ছিল তাদের বিশেষ এলিট বাহিনী 'জেনিসারি' (Janissaries)। প্রথম দিকে এরা প্রচণ্ড অনুগত ও বীর হলেও, পরবর্তী সময়ে এরা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, কোনো সুলতান তাদের সংস্কার করতে চাইলে তারা সুলতানকেই সিংহাসনচ্যুত বা হত্যা করত (যেমন: সুলতান তৃতীয় সেলিম ও দ্বিতীয় উসমান)। ১৮২৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এই বাহিনীকে ধ্বংস করলেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

অর্থনৈতিক সংকট ও বিদেশী ঋণ: ইউরোপীয় দেশগুলো সমুদ্রপথে নতুন নতুন বাণিজ্যিক রুট (যেমন: ভারতের জলপথ এবং আমেরিকা আবিষ্কার) খুঁজে পাওয়ায় উসমানীয়দের নিয়ন্ত্রিত স্থলপথের সিল্ক রোডের গুরুত্ব কমে যায়। ফলে রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ১৯ শতকের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রের খরচ ও রাজপ্রাসাদের বিলাসিতা মেটাতে উসমানীয়রা ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেয় এবং একপর্যায়ে রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে যায়। এ কারণে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ইউরোপের দেশগুলো উপহাস করে *'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ'* বলত।

জাতীয়তাবাদের উত্থান ও সাম্রাজ্যের ভাঙন: ফরাসি বিপ্লবের পর ১৯ শতকে পুরো ইউরোপজুড়ে 'জাতীয়তাবাদ' (Nationalism)-এর জোয়ার আসে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়াসহ বলকান অঞ্চলের খ্রিস্টান জাতিগুলো স্বাধীনতার জন্য একের পর এক বিদ্রোহ শুরু করে। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর (বিশেষ করে রাশিয়ার) মদদে এই অঞ্চলগুলো উসমানীয়দের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্য ছোট হতে থাকে। একই সাথে আরব বিশ্বেও 'আরব জাতীয়তাবাদ' মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভুল পক্ষ নেওয়া ও চূড়ান্ত পতন: উসমানীয় খিলাফতের সবচেয়ে বড় এবং শেষ ঐতিহাসিক ভুল ছিল ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে (অক্ষশক্তি) যোগ দেওয়া। এই যুদ্ধে জার্মানি ও উসমানীয়রা ব্রিটিশ-ফরাসি জোটের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর ১৯২০ সালের 'সেভরেস চুক্তি' অনুযায়ী মিত্রবাহিনী উসমানীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং ইস্তাম্বুল দখল করে।উসমানীয় সাম্রাজ্য শত শত বছর ধরে ইসলামি বিশ্বের ঢাল হিসেবে কাজ করেছে এবং ইউরোপের বুকে ইসলামের পতাকা উড্ডীন রেখেছে (সাফল্য)। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রহণ না করা, অভ্যন্তরীণ সামরিক কোন্দল, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভুল সিদ্ধান্ত এই মহান খিলাফতের অবসান ঘটায় (ব্যর্থতা)।

উসমানীয় বা অটোমান খিলাফতের কিভাবে অবসান ঘটে

উসমানীয় বা অটোমান খিলাফতের অবসান কেবল একদিনে বা হঠাৎ করে হয়নি। এটি ছিল দীর্ঘ এক শতাব্দীর অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সামরিক পরাজয় এবং রাজনৈতিক ভুলের একটি চূড়ান্ত পরিণতি, যা *৩রা মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে* খিলাফতের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির মাধ্যমে শেষ হয়। এর অবসানের মূল ধাপগুলো হলো:

'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' এবং অঞ্চল হারানোঃ ১৯ শতকের দিকে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্প বিপ্লবে ইউরোপের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, জেনিসারি সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহ এবং তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের কারণে রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে যায়। এ সময় উসমানীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলো একে *'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ'* উপাধি দেয়। একে একে গ্রিস, বলকান অঞ্চল এবং আরব ভূখণ্ডে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সাম্রাজ্যের মানচিত্র ছোট হতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার মারাত্মক ভুল (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.)ঃখিলাফতের কফিনে চূড়ান্ত পেরেকটি ঠুকে দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে উসমানীয় খিলাফত তৎকালীন সুলতান ও সামরিক প্রধানদের অদূরদর্শিতার কারণে জার্মানির পক্ষে (অক্ষশক্তি) যুদ্ধে যোগ দেয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ও উসমানীয়রা ব্রিটিশ, ফরাসি ও রাশিয়ান জোটের (মিত্রবাহিনী) কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে খিলাফতের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। **সেভরেস চুক্তি এবং ইস্তাম্বুল দখল (১৯২০ খ্রি.)ঃ** যুদ্ধের পর বিজয়ী মিত্রবাহিনী (মূলত ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উসমানীয়দের ওপর অত্যন্ত অপমানজনক *'সেভরেস চুক্তি'* চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তি অনুযায়ী উসমানীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হয়।খিলাফতের রাজধানী ইস্তাম্বুল এবং আনাতোলিয়ার (বর্তমান তুরস্ক) সিংহভাগ এলাকা

ব্রিটিশ, ফরাসি ও গ্রিক বাহিনী দখল করে নেয়।তৎকালীন সুলতান ও খলিফা ষষ্ঠ মুহাম্মদ ওয়াহিদউদ্দিন মূলত ব্রিটিশদের হাতের পুতুলে পরিণত হন এবং তাদের সব শর্ত মেনে নেন।

মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ও তুর্কি স্বাধীনতা যুদ্ধঃ খলিফা ও ইস্তাম্বুল সরকার ব্রিটিশদের সামনে আত্মসমর্পণ করলেও, আনাতোলিয়ার সাধারণ তুর্কি জনগণ এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশ এই পরাধীনতা মেনে নেয়নি। উসমানীয় সেনাবাহিনীর একজন দক্ষ জেনারেল *মুস্তফা কামাল পাশা (পরবর্তীতে আতাতুর্ক)*-এর নেতৃত্বে তুর্কিরা বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে 'তুর্কি স্বাধীনতা যুদ্ধ' (Turkish War of Independence) শুরু করে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কামাল পাশার জাতীয়তাবাদী বাহিনী গ্রিস, ব্রিটেন ও ফরাসিদের তুরস্কের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'লোজান চুক্তি'-র মাধ্যমে আজকের স্বাধীন *'তুরস্ক প্রজাতন্ত্র'* প্রতিষ্ঠা করে।

সুলতানাত বা রাজতন্ত্র বিলুপ্তি (১৯২২ খ্রি.)ঃ স্বাধীন দেশ হিসেবে তুরস্কের নিয়ন্ত্রণ এখন সম্পূর্ণভাবে কামাল আতাতুর্কের 'তুর্কি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি' (সংসদ)-এর হাতে চলে আসে। ইস্তাম্বুলের সুলতান যেহেতু বিদেশী শত্রুদের সাহায্য করেছিলেন, তাই ১লা নভেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সংসদ উসমানীয়দের *'সুলতানাত' বা রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করে।* শেষ সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মদ একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। তবে, মুসলিম বিশ্বের আবেগ ও সেন্টিমেন্টের কথা চিন্তা করে আতাতুর্ক তখনো খিলাফত বিলুপ্ত করেননি। তিনি রাজপরিবারের আরেক সদস্য *দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে* রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন কেবল একজন 'নামমাত্র ধর্মীয় খলিফা' হিসেবে নিযুক্ত করেন।

ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা চূড়ান্ত বিলুপ্তি (৩রা মার্চ, ১৯২৪ খ্রি.)

কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে একটি আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) এবং পশ্চিমা ধাঁচের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, খিলাফত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখলে রক্ষণশীল শক্তিগুলো বারবার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তুরস্ককে উসমানীয় অতীতের সাথে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। অবশেষে, *৩রা মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪২ হিজরি)* তুর্কি সংসদে একটি ঐতিহাসিক আইন পাসের মাধ্যমে *ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা চিরতরে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।* একই সাথে শেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ এবং উসমানীয় রাজপরিবারের সমস্ত সদস্যকে রাতের অন্ধকারে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তুরস্ক থেকে নির্বাসিত করা হয়। এর মাধ্যমেই ইসলামের ইতিহাসের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তেরশো বছরের ধারাবাহিক খিলাফত ব্যবস্থার এবং ৬২৫ বছরের উসমানীয় সাম্রাজ্যের চিরতরে অবসান ঘটে।

খিলাফত থাকার সুবিধা সমূহ

ইসলামি ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আদর্শ *খিলাফত ব্যবস্থা* চালু থাকার বেশ কিছু বড় বড় সুবিধা বা ইতিবাচক দিক রয়েছে। মূলত একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ (কুরআন ও সুন্নাহ) এবং একক নেতৃত্বের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কারণে এই সুবিধাগুলো তৈরি হয়। খিলাফত ব্যবস্থার প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

বৈশ্বিক মুসলিম ঐক্যঃ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো, মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি হলেও তারা ৫০টিরও বেশি আলাদা রাষ্ট্রে বিভক্ত। ফলে ফিলিস্তিন বা কাশ্মীরের মতো সংকটে মুসলিম বিশ্ব একক কোনো শক্তিশালী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। খিলাফত ব্যবস্থায় সমস্ত

ভৌগোলিক ও জাতিগত (বাঙালি, আরব, তুর্কি) সীমানা ভেঙে পুরো মুসলিম সমাজ একটি একক রাষ্ট্রের অধীনে চলে আসে। এর ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি একীভূত হয়, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুসলিম বিশ্বকে পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

দ্রুত ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেকোনো আইন পাস বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে সংসদ, বিরোধী দল ও দীর্ঘ আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা অনেক সময় ধীরগতির কারণ হয়। খিলাফতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা খলিফা এবং তাঁর পরামর্শ সভার (শূরা) হাতে থাকে। যেহেতু খলিফার কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের তাড়া থাকে না এবং কোনো কর্পোরেট বা লবিস্ট গ্রুপের চাপ থাকে না, তাই দেশের যেকোনো জরুরি সংকটে অত্যন্ত দ্রুত এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

আইনের শাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারঃ আধুনিক অনেক রাষ্ট্রে দেখা যায়, ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অপরাধ করেও আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বের হয়ে যান, কিংবা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পার পেয়ে যান। খিলাফত ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো *ঐশ্বরিক আইন বা শরীয়া।* এই আইনে খলিফা থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক—সবাই সমান। ইসলামের ইতিহাসে দেখা গেছে, খলিফা আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে একজন সাধারণ অমুসলিম নাগরিক আদালতে মামলা করে জিতে গিয়েছিলেন। এই নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা সমাজে অপরাধের হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনে।

জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (সুদমুক্ত অর্থনীতি)ঃ পুঁজিবাদী (Capitalist) ব্যবস্থায় সম্পদ কিছু নির্দিষ্ট ধনীর হাতে কুক্ষিগত থাকে, আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা কেড়ে নেওয়া হয়। খিলাফতের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে *যাকাত, ওশর এবং সুদমুক্ত ব্যবস্থার* ওপর। এখানে সম্পদ জমিয়ে রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের সম্পদ বাধ্যতামূলকভাবে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের আমলে এই অর্থনৈতিক সুবিধার কারণে যাকাত নেওয়ার মতো কোনো গরিব মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জাতীয়তাবাদ এবং বর্ণবাদের অবসানঃ আধুনিক বিশ্বে বর্ণবাদ (যেমন: সাদা-কালো ভেদাভেদ) এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ (যেমন: আমার দেশ বা জাতিই সেরা) অনেক যুদ্ধ ও সংঘাতের জন্ম দেয়। খিলাফত ব্যবস্থার মূল কথাই হলো—কোনো আরবের ওপর অনারবের, কিংবা অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো সততা ও খোদাভীতি (তাকওয়া)। ফলে এটি একটি বহু-জাতিগত ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

সংখ্যালঘুদের জান-মালের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাঃ খিলাফতের অধীনে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের *'জিম্মি'* বা চুক্তিভুক্ত নাগরিক বলা হয়। ইসলামি আইন অনুযায়ী, অমুসলিমদের জীবন, সম্পদ এবং তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় রক্ষা করা রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজ)। তারা নির্দিষ্ট কর (জিজিয়া) প্রদানের বিনিময়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পায় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালন করতে পারে।

এক নজরে খিলাফতের মূল সুবিধা সমূহ

একক অভিভাবকত্ব: বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের বিপদে দাঁড়ানোর মতো একজন সুনির্দিষ্ট নেতা বা অভিভাবক থাকেন।

স্থিতিশীলতা: ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন বা নির্বাচনের পেছনে কোটি কোটি টাকা অপচয় হয় না, ফলে দীর্ঘমেয়াদী রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সহজে বাস্তবায়ন করা যায়।

দুর্নীতির অবসান: শাসক নিজেকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করেন বলে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কমে যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই সুবিধাগুলো কেবল তখনই পাওয়া সম্ভব, যখন খিলাফত ব্যবস্থাটি ইসলামের মূল নীতি (ন্যায়বিচার, পরমতসহিষ্ণুতা ও শূরা পদ্ধতি) মেনে **'খিলাফতে রাশেদা'**-র আদর্শে পরিচালিত হয়। স্বৈরতন্ত্র বা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে গঠিত কোনো ব্যবস্থায় এই সুফলগুলো পাওয়া যায় না।

খিলাফত না থাকার অসুবিধা সমূহ

১৯২৪ সালে খিলাফত ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হওয়ার পর গত এক শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্ব এবং বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে। একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা আদর্শিক অভিভাবকত্ব না থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহ এবং আন্তর্জাতিক সমাজ যেসব বড় বড় অসুবিধা বা সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, সেগুলো হলো:

একক অভিভাবকহীনতা ও মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্ব সংকটঃ খিলাফত না থাকার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের কোনো *কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অভিভাবক বা মুখপাত্র* নেই।ফিলিস্তিন, উইঘুর, কাশ্মী কিংবা রোহিঙ্গা সংকটের মতো বড় বড় মানবিক বিপর্যয়ে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার বা শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়ার মতো কোনো একক বিশ্বনেতা নেই। ওআইসি (OIC)-র মতো সংস্থাগুলো থাকলেও, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা না থাকায় তারা কেবল 'নিন্দা প্রস্তাব' পাস করা ছাড়া কার্যকর কিছুই করতে পারছে না।

উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাতঃ খিলাফত ব্যবস্থা মুসলিম দেশগুলোকে ভৌগোলিক বা জাতিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে 'এক উম্মাহ' বা এক জাতি হিসেবে ধরে রাখত। খিলাফত ভাঙার পর মুসলিম বিশ্ব ৫০টিরও বেশি আলাদা জাতিরাষ্ট্রে (Nation-States) বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে। আজ ফিলিস্তিনের সংকটে পাশের আরব দেশগুলো সরাসরি এগিয়ে আসতে পারে না তাদের 'জাতীয় স্বার্থ' বা সীমানার আইনি জটিলতার কারণে। এমনকি মুসলিম দেশগুলো নিজেদের মধ্যেই সীমান্ত, তেল বা রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে (যেমন: ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ইয়েমেন সংকট)।

চরমপন্থী ও উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থানঃ একটি বৈধ, সুশৃঙ্খল এবং ভারসাম্যপূর্ণ কেন্দ্রীয় খিলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে বিশ্বরাজনীতিতে এক বিপজ্জনক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে আল-কায়েদা বা আইএসআইএস (ISIS)-এর মতো চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে অপব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে। তারা নিজেদের মতো করে 'খিলাফতের' ভুল ও সহিংস ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তরুণদের মগজ ধোলাই করছে। যদি একটি মূলধারার বৈধ খিলাফত থাকত, তবে এই ধরনের উগ্রপন্থী দলগুলো কখনোই সাধারণ মুসলিমদের সমর্থন পেত না।

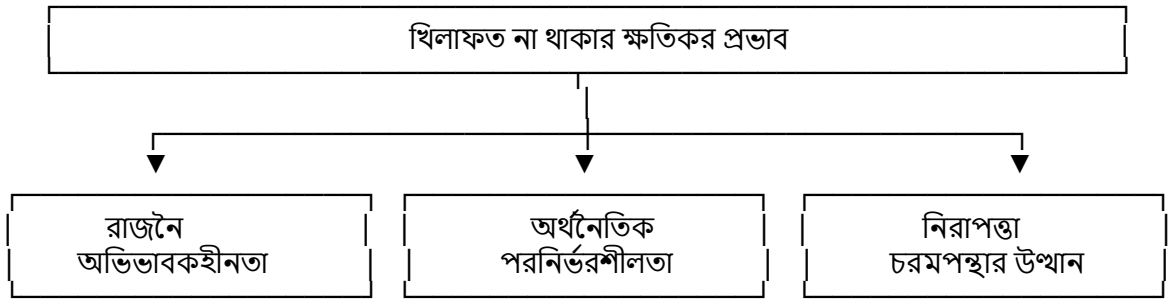
অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা ও সম্পদের অপচয়ঃমুসলিম বিশ্বের সিংহভাগ দেশ প্রাকৃতিকভাবে তেল, গ্যাস এবং খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ একীভূত করার কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা অর্থনৈতিক নীতি নেই। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পশ্চিমা ব্যাংকে রাখছে বা তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনছে, যা শেষ পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে সোমালিয়া বা ইয়েমেনের মতো মুসলিম দেশগুলো খাদ্যাভাবে ভুগছে। খিলাফতের কেন্দ্রীয় 'বাইতুল মাল' (রাষ্ট্রীয় তহবিল) ব্যবস্থা থাকলে এই চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকত না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুর্বল অবস্থান ও পরনির্ভরশীলতাঃ বর্তমান বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি জাতিসংঘ, আইএমএফ (IMF), বিশ্বব্যাংক এবং নিরাপত্তা পরিষদের মতো পশ্চিমা বা পরাশক্তি চালিত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ জনসংখ্যা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কোনো মুসলিম দেশের 'ভেটো' (Veto) দেওয়ার ক্ষমতা নেই। খিলাফত না থাকায় মুসলিম দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত দুর্বল এবং পরাশক্তিদের (যেমন: আমেরিকা, চীন বা রাশিয়া) তৈরি করা নিয়মের পুতুল হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ঃ খিলাফত ব্যবস্থা কেবল একটি রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, এটি সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বজায় রাখার একটি ঢাল ছিল। খিলাফত না থাকায় মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমা ভোগবাদী (Consumerist) ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির তীব্র প্রভাব পড়েছে। ফলে মুসলিম সমাজগুলোতে পারিবারিক ভাঙন, নৈতিক অবক্ষয় এবং আদর্শিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব দিন দিন প্রকট হচ্ছে।

খিলাফত না থাকার মূল অসুবিধা হলো—মুসলিম বিশ্ব আজ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একটি ছাতা বা অভিভাবক না থাকায় তারা বিপুল জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতিতে অত্যন্ত অসহায় এবং কোণঠাসা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

এক নজরে খিলাফত না থাকার মূল প্রভাব



খিলাফত না থাকার কারনে ইসলামের ক্ষতিসমূহ

খিলাফত ব্যবস্থা না থাকার কারণে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি *ইসলামের ধর্মীয়, আদর্শিক এবং কাঠামোগত* এক বিশাল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ইসলাম কেবল কিছু ব্যক্তিগত ইবাদতের সমষ্টি নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Deen)। আর এই জীবনবিধানকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে টিকিয়ে রাখার প্রধান মাধ্যম ছিল খিলাফত।খিলাফত না থাকার ফলে ইসলামের যে মৌলিক ক্ষতিগুলো হয়েছে, তা হলো-

'দ্বীন' বা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের সংকোচনঃ ইসলামের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সামাজিক বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় আইন (যাকে শরীয়া বলা হয়)। খিলাফত পতনের পর ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে সংকুচিত হয়ে কেবল মানুষের *"ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্মে"* পরিণত হয়েছে। ফলে ইসলামের একটি বিশাল অংশ (যেমন: সুদমুক্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, অপরাধ দমনের ইসলামি দণ্ডবিধি ইত্যাদি) কিতাবের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, বাস্তব জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

ইজতিহাদ (ইসলামি গবেষণা) স্থবির হয়ে পড়াঃ যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহর সামনে নতুন নতুন জটিল সমস্যা তৈরি হয় (যেমন: আধুনিক ব্যাংকিং, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি)। এসব সমস্যার ইসলামি সমাধানের জন্য প্রয়োজন *'ইজতিহাদ'* বা সম্মিলিত ইসলামি গবেষণা। অতীতে খিলাফতের অধীনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় আলেম ও গবেষকরা একসাথে বসে এসব সমস্যার সমাধান করতেন। এখন কোনো কেন্দ্রীয় খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় ডিক্রি (Decree) না থাকায় একেক দেশের আলেম একেক রকম ফতোয়া দেন। ফলে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ও বিভেদ দিন দিন বাড়ছে।

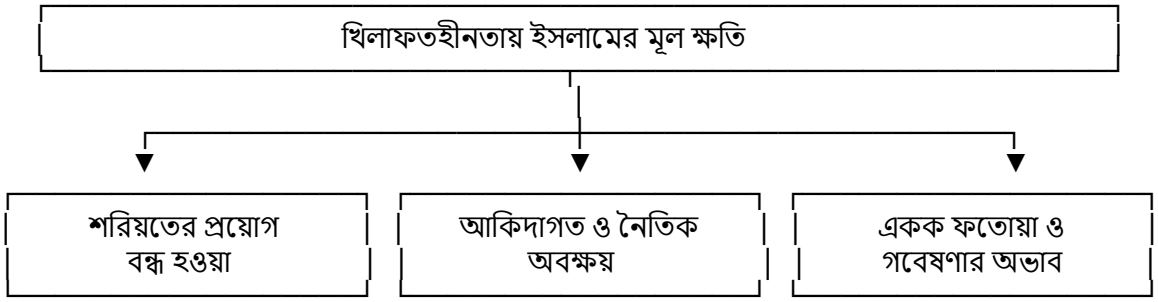
ইসলামি বিচারব্যবস্থা ও 'হুদুদ' (দণ্ডবিধি) বাতিল হওয়াঃ ইসলামি শরিয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে অপরাধ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শাস্তি বা 'হুদুদ' (যেমন: চুরি, ব্যভিচার বা হত্যার জন্য নির্ধারিত শাস্তি) রয়েছে। খিলাফত না থাকায় বিশ্বের সিংহভাগ মুসলিম দেশ থেকে ইসলামি বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে ঔপনিবেশিক আমলের পশ্চিমা আইন কার্যকর করা হয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজগুলোতেও এখন অনৈতিকতা, অপরাধ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি জেঁকে বসেছে।

উম্মাহর আকিদাগত ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়ঃ একটি শক্তিশালী অভিভাবক রাষ্ট্র থাকলে নাগরিকদের মধ্যে এক ধরনের আত্মমর্যাদা ও মানসিক শক্তি থাকে। গত এক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী কেন্দ্র না থাকায় মুসলিম যুবসমাজের মধ্যে এক ধরনের *হীনম্মন্যতা* তৈরি হয়েছে। তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং জীবনদর্শনকে ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে শুরু করেছে। এর ফলে মুসলিম সমাজ গুলোতে নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বস্তুবাদী (Materialistic) চিন্তার তীব্র বিস্তার ঘটছে।

ইসলাম প্রচার (দাওয়াত) এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির অভাবঃ ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং ইসলামের বিরুদ্ধে হওয়া অপপ্রচারের বুদ্ধিবৃত্তিক জবাব দেওয়ার জন্য বড় ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রয়োজন হয়। খিলাফতের পতনের পর ইসলামি দাওয়াতের কাজটি এখন কেবল কিছু দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিপর্যায়ে চলে গেছে। অন্যদিকে, ইসলামফোবিয়া বা ইসলামভীতি ছড়ানোর জন্য পশ্চিমা বিশ্ব বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, যার প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় মোকাবেলা করার মতো কোনো শক্তি মুসলমানদের নেই।

পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংকটঃ মক্কা, মদিনা এবং বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)—এই তিন পবিত্র স্থান ইসলামের প্রধান কেন্দ্র। খিলাফত না থাকার কারণে ইসলামের প্রথম কিবলা 'বায়তুল মুকাদ্দাস' আজ দীর্ঘ সময় ধরে অবরুদ্ধ ও দখলদারিত্বের শিকার। বাকি দুই পবিত্র স্থান (মক্কা ও মদিনা) ভৌগোলিকভাবে টিকে থাকলেও, তা এখন বৈশ্বিক মুসলিম উম্মাহর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের অধীন নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের রাজনৈতিক স্বার্থের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

এক নজরে ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতিসমূহ



খিলাফত না থাকার কারণে ইসলামের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে—*ইসলাম আজ তার "বাস্তবায়নকারী শক্তি" হারিয়ে ফেলেছে।* তলোয়ার ছাড়া খাপ যেমন কোনো কাজে আসে না, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও খিলাফতের ছায়া ছাড়া ইসলামের সুন্দর বিধানগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খিলাফত বনাম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা কোনো একক ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত না থেকে, সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে। সহজ কথায়, এটি জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট *আব্রাহাম লিংকনের* সেই বিখ্যাত সংজ্ঞাটি গণতন্ত্রের মূল কথাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে: *"Democracy is the government of the people, by the people, for the people." (গণতন্ত্র হলো জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।)*

গণতন্ত্র প্রধানত দুই প্রকার:

১. প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রঃ এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকরা সরাসরি শাসনকাজ এবং নীতি

নির্ধারণে অংশ নেন। প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বেশি হওয়ায় এটি পুরোপুরি সম্ভব নয়, তবে সুইজারল্যান্ডের মতো কিছু দেশে এখনও আংশিকভাবে (গণভোটের মাধ্যমে) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা দেখা যায়।

২. পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রঃ আধুনিক বিশ্বে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এখানে জনগণ সরাসরি শাসন না করে ভোটের মাধ্যমে নিজেদের **প্রতিনিধি (যেমন: সংসদ সদস্য বা এমপি)** নির্বাচন করেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জনগণের পক্ষে আইন তৈরি এবং দেশ পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ বা বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি সফল ও আদর্শ গণতন্ত্রের জন্য নিচের উপাদানগুলো থাকা অপরিহার্য:

জনগণের সার্বভৌমত্ব: সব ক্ষমতার উৎস জনগণ। সরকার জনগণের ইচ্ছায় গঠিত হয় এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

নিয়মিত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন: একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে, যেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের প্রতিনিধি বাছতে পারে।

আইনের শাসন: আইনের চোখে সবাই সমান। ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সবার জন্য একই আইন প্রযোজ্য হবে।

মৌলিক ও মানবাধিকারের সুরক্ষা: নাগরিকদের বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করা।

বহুদলীয় ব্যবস্থা: রাজনৈতিক অঙ্গনে একাধিক দল থাকার সুযোগ থাকতে হবে, যাতে জনগণের সামনে বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে।

সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা: সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে দেশ চললেও, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং মতামতকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

গণতন্ত্রের ভালো ও মন্দ দিক (সুবিধা ও অসুবিধা)ঃ কোনো শাসনব্যবস্থাই ত্রুটিহীন নয়। গণতন্ত্রেরও কিছু সবল ও দুর্বল দিক রয়েছে:

সুবিধা (Pros)	অসুবিধা (Cons)
জনগণের অধিকার রক্ষা: নাগরিকরা তাদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।	**ধীরগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** অনেক আলোচনা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় বলে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়।
স্থিতিশীলতা ও বিপ্লবের কম ঝুঁকি: ব্যালটের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন করা যায়, ফলে সহিংসতার ঝুঁকি কমে।	**যোগ্যতার চেয়ে জনপ্রিয়তার গুরুত্ব:** অনেক সময় যোগ্য প্রার্থীর চেয়ে অর্থ বা প্রচারণার জোরে অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারেন।
জবাবদিহিতা: ভুল বা অন্যায় করলে পরবর্তী নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয় থাকে বলে সরকার সতর্ক থাকে।	**সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার:** সঠিক বা ভুল বিচার না করে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভুল সিদ্ধান্তও পাস হয়ে যেতে পারে।

গণতন্ত্রের সফলতার শর্তাবলীঃ গণতন্ত্রকে কাগজে-কলমে রাখার চেয়ে বাস্তবে রূপ দেওয়া বেশ কঠিন। এটি সফল করতে প্রয়োজন:

১. **উচ্চ রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষা:** নাগরিককে তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

২. **সহনশীলতা:** অন্যের ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার মানসিকতা থাকতে হবে।

৩. **অর্থনৈতিক সমতা:** চরম দারিদ্র্য থাকলে মানুষ অর্থের বিনিময়ে ভোট বিক্রি করতে পারে, যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৪. **স্বাধীন বিচার বিভাগ:** সরকারের প্রভাবমুক্ত একটি বিচার ব্যবস্থা, যা সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, গণতন্ত্র কেবল একটি শাসন পদ্ধতিই নয়, এটি একটি জীবনবোধ এবং সংস্কৃতি—যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা এবং স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে।

গনতন্ত্রের কুফল

গণতন্ত্রকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা মনে করা হলেও, বিখ্যাত দার্শনিক থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এর বেশ কিছু বড় বড় ত্রুটি ও কুফল নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও সক্রেটিস তো গণতন্ত্রকে চরমভাবে অপছন্দ করতেন। আধুনিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের প্রধান কুফল ও সীমাবদ্ধতাগুলো হলো:

যোগ্যতার চেয়ে সংখ্যার গুরুত্ব (যোগ্যতার অবমূল্যায়ন)ঃ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় নীতি হলো "সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত"। এখানে ভোটের গুণগত বা গুণী মানের চেয়ে ভোটের **সংখ্যা** বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন উচ্চশিক্ষিত, সৎ ও দূরদর্শী নাগরিকের ভোটের যে মূল্য, একজন অপরাধী বা মূর্খ মানুষের ভোটের মূল্যও ঠিক একই। দার্শনিক সক্রেটিস একটি রূপক দিয়ে বলেছিলেন—*"একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন কে হবেন, তা জাহাজের যাত্রীদের ভোটের মাধ্যমে ঠিক করা উচিত নয়, বরং যিনি সমুদ্র এবং জাহাজ চালানো বোঝেন, তাকেই দায়িত্ব দেওয়া উচিত।"*

গণতন্ত্রে অনেক সময় শুধু সস্তা জনপ্রিয়তার জোরে অযোগ্য লোক ক্ষমতায় চলে আসে।

অর্থ ও পেশী শক্তির প্রভাবঃ তাত্ত্বিকভাবে গণতন্ত্রে সবার সমান অধিকার থাকলেও, বাস্তবে এটি *ধনী ও প্রভাবশালীদের খেলায়* পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে দাঁড়াতে এবং প্রচারণা চালাতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে সাধারণ বা সৎ মানুষের পক্ষে জনগণের প্রতিনিধি হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সময় বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানি বা ব্যবসায়ীরা রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থায়ন করে, যার ফলে দলগুলো ক্ষমতায় গিয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে সেইসব ধনীদের স্বার্থ রক্ষায় বেশি ব্যস্ত থাকে।

দলীয়করণের রাজনীতি ও সামাজিক বিভেদঃ গণতন্ত্রে টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিক দল গঠন অপরিহার্য, কিন্তু এটি সমাজে স্থায়ী বিভাজন তৈরি করে। সমাজ "ক্ষমতাসীন দল" এবং "বিরোধী দল"—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন: পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ) নিরপেক্ষতা হারিয়ে দলীয়করণ হয়ে যায়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে অনেকে চাকরি বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে ধীরগতি ও অস্থিতিশীলতাঃ গণতন্ত্রে যেকোনো আইন পাস বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে সংসদ, ক্যাবিনেট এবং বিভিন্ন কমিটির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। জরুরি বা সংকটকালীন মুহূর্তে (যেমন: অর্থনৈতিক ধস বা জাতীয় নিরাপত্তা সংকট) গণতন্ত্র অত্যন্ত ধীরগতিতে কাজ করে। তাছাড়া, প্রতি ৪ বা ৫ বছর পর পর সরকার পরিবর্তন হওয়ার কারণে দীর্ঘমেয়াদী কোনো জাতীয় পরিকল্পনা (Long-term Planning) সফলভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়। নতুন সরকার এসে আগের সরকারের ভালো প্রজেক্টগুলোও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে বন্ধ করে দেয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারঃ গণতন্ত্রে যেহেতু ৫১% ভোট পেলেই পুরো ১০০% ক্ষমতা পাওয়া যায়, তাই এটি অনেক সময় স্বৈরাচারী রূপ নিতে পারে। বিজয়ী দল কেবল তাদের ভোটার বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ দেখতে পারে। এর ফলে সমাজে বসবাসকারী ধর্মীয়, জাতিগত বা রাজনৈতিক সংখ্যালঘুরা চরম বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হতে পারে, কারণ আইনিভাবেই তাদের কণ্ঠস্বর চেপে দেওয়া সহজ হয়।

ভোটারদের অসচেতনতা ও আবেগীয় প্রচারণাঃ একটি সফল গণতন্ত্রের জন্য সচেতন ও শিক্ষিত ভোটারের প্রয়োজন, যা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শই অনুপস্থিত। সাধারণ মানুষ অনেক সময় দেশের প্রকৃত সমস্যা (যেমন: অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) না বুঝে আবেগ, ধর্ম, বর্ণ বা আঞ্চলিকতার টানে ভোট দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোও জনকল্যাণমূলক কাজ করার চেয়ে ভোটারদের আবেগকে উস্কে দিয়ে বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করে।

এক নজরে গণতন্ত্রের প্রধান কুফলসমূহ

দুর্নীতির সুযোগ: ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বা নির্বাচনে জেতার জন্য দুর্নীতি এবং কালো টাকার ব্যবহার বাড়ে।

নৈতিকতার অবক্ষয়: ক্ষমতা পাওয়ার জন্য যেকোনো ধরনের মিথ্যাচার বা অপপ্রচারকে বৈধ মনে করা হয়।

অপচয়: ঘন ঘন নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকার অপচয় হয়।

যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী *উইনস্টন চার্চিল* গণতন্ত্রের এই ত্রুটিগুলো স্বীকার করেই একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন: *"গণতন্ত্র হলো সবচেয়ে খারাপ শাসনব্যবস্থা, যদি না আমরা ইতিহাসে চেষ্টা করা বাকি শাসনব্যবস্থাগুলোকে হিসাবের বাইরে রাখি।"*

অর্থাৎ, ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অন্য সব ব্যবস্থার (যেমন স্বৈরতন্ত্র বা রাজতন্ত্র) চেয়ে এটি এখনো

মানুষের অধিকার রক্ষায় কিছুটা ভালো ভূমিকা রাখে।

গণতন্ত্র vs খিলাফত

গণতন্ত্র এবং খিলাফত হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি আদর্শ এবং রাজনৈতিক দর্শন থেকে উদ্ভূত শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো *জনগণের সার্বভৌমত্ব*, আর খিলাফতের মূল ভিত্তি হলো *আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং* ইসলামী শরীয়ার বাস্তবায়ন।

এই দুটি শাসনব্যবস্থার মূল পার্থক্যগুলো হলো:

সার্বভৌমত্ব এবং ক্ষমতার উৎস

গণতন্ত্র: গণতন্ত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস হলো **জনগণ**। জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং সেই প্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করেন। এখানে মানবসৃষ্ট আইনই প্রধান।
খিলাফত: খিলাফতে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতার উৎস হলেন একমাত্র **আল্লাহ**। খিলাফতের প্রধান বা খলিফা নিজে কোনো নতুন মৌলিক আইন তৈরি করতে পারেন না; বরং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর (ইসলামী শরীয়া) আইন বাস্তবায়ন করাই তার মূল দায়িত্ব।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া

গণতন্ত্র: সংসদ বা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে যেকোনো আইন পাস, পরিবর্তন বা বাতিল করা যেতে পারে (এমনকি তা যদি ধর্মীয় বা নৈতিক রীতির পরিপন্থীও হয়)।
খিলাফত: কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিধানের বাইরে কোনো আইন তৈরি করার অধিকার কারো নেই। তবে যেসব বিষয়ে সরাসরি কোনো টেক্সট বা বিধান নেই, সেসব ক্ষেত্রে যুগের প্রয়োজনে ইসলামী আইনবিদ ও বিশেষজ্ঞরা *ইজতিহাদ* (গবেষণা) এবং *শূরা* (পরামর্শ সভা)-র মাধ্যমে আইন বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

নেতা নির্বাচন ও যোগ্যতা

গণতন্ত্র: নির্দিষ্ট বয়স ও শর্ত সাপেক্ষে যেকোনো নাগরিক নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন এবং ভোটে অংশ নিতে পারেন। এখানে সততা বা ধর্মীয় যোগ্যতার চেয়ে **জনপ্রিয়তা ও ভোটের সংখ্যা** মুখ্য।
খিলাফত: খলিফা হওয়ার জন্য কঠোর কিছু যোগ্যতা (যেমন: গভীর ইসলামী জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদি) আবশ্যক। খিলাফতে সাধারণত কেউ নিজে পদের জন্য প্রার্থী হতে বা প্রচারণা চালাতে পারে না। সমাজের জ্ঞানী, বিজ্ঞ এবং সৎ ব্যক্তিদের একটি পরিষদ (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) খলিফা নির্বাচন করেন এবং জনগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য (বাইয়াত) প্রকাশ করে।

মেয়াদকাল

গণতন্ত্র: সরকারের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে (যেমন: ৪ বা ৫ বছর)। মেয়াদ শেষে পুনরায় নির্বাচন হতে হয়।
খিলাফত: খলিফার পদের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদকাল নেই। একজন খলিফা আমৃত্যু বা যতদিন তিনি শারীরিকভাবে সক্ষম এবং ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে দেশ পরিচালনা করবেন, ততদিন দায়িত্বে থাকবেন। যদি তিনি শরীয়া লঙ্ঘন করেন বা স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন, তবে তাকে অপসারণের বিধান রয়েছে।

এক নজরে গণতন্ত্র ও খিলাফতের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	গণতন্ত্র	খিলাফত
মূল ভিত্তি	জনগণের অধিকার ও মানবতাবাদ।	আল্লাহর আইন ও ইসলামী আদর্শ।

আইনের উৎস	মানুষের তৈরি সংবিধান ও আইনসভা।	কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।
নেতার জবাবদিহিতা	জনগণের কাছে (পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে)	আল্লাহর কাছে এবং জনগণের কাছে (শরীয়া অনুযায়ী)
বিরোধী দলের ভূমিকা	বৈধ এবং এটি ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য জরুরি।	গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শের সুযোগ থাকে, তবে বিভেদ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা নিষিদ্ধ।
সংখ্যালঘুদের অধিকার	নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার (আইন অনুযায়ী)।	'জিম্মি' বা চুক্তিভুক্ত নাগরিক হিসেবে জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পূর্ণ সুরক্ষা।

<u>উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য (মিল)</u> ঃসম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শন হওয়া সত্ত্বেও, কিছু জায়গায় দুটির মধ্যে বাহ্যিক মিল দেখা যায়:

পরামর্শ ভিত্তিক শাসন: গণতন্ত্রে যেমন সংসদ বা ক্যাবিনেট থাকে, খিলাফতেও তেমনি *"শূরা" বা পরামর্শ সভা* থাকে। খলিফা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই সভার পরামর্শ নিতে বাধ্য।

জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন: গণতন্ত্রে শাসক যেমন আইনের ঊর্ধ্বে নন, খিলাফতেও খলিফা আইনের ঊর্ধ্বে নন। সাধারণ একজন নাগরিকও খলিফার কাজের সমালোচনা বা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারেন (যেমনটি ইসলামের প্রথম চার খলিফার যুগে দেখা গেছে)।

জনগণের সম্মতি: খিলাফতেও জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল সমর্থিত নয়; জনগণের বা তাদের প্রতিনিধিদের সম্মতি (বাইয়াত) খলিফা নিযুক্তির অন্যতম শর্ত।

গণতন্ত্র হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি ধর্মনিরপেক্ষ বা ইহজাগতিক শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে, খিলাফত হলো একটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা পরকালীন জবাবদিহিতা এবং ঐশ্বরিক আইনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

<u>ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমত্ব'</u>

ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তা ও দর্শনে **'সার্বভৌমত্ব'** ধারণাটি আধুনিক পশ্চিমা রাজনৈতিক ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের এমন এক চূড়ান্ত ও সীমাহীন ক্ষমতাকে বোঝায়, যার ওপরে আর কোনো কর্তৃত্ব নেই (যেমন—জনগণ বা সংসদ)। কিন্তু ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরম ক্ষমতার মালিক মানুষ বা কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, সার্বভৌমত্বের মূল নীতিগুলো হলো:

চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরঃ ইসলামি আকীদা অনুযায়ী, মহাবিশ্বের সৃষ্টি, মালিকানা এবং শাসনের চূড়ান্ত ও একমাত্র অধিকার মহান আল্লাহর। মানুষ কেবল আল্লাহর জমিনে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এই ধারণাকে বলা হয় *"হাকিমিয়াহ"* বা আল্লাহর আইনগত সার্বভৌমত্ব।পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে: *"জেনে রেখো, সৃষ্টি যাঁর, নির্দেশও চলবে একমাত্র তাঁরই।" — (সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪)*

"বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।" — (সূরা ইউসুফ: ৪০)

খিলাফত বা মানুষের প্রতিনিধি হওয়ার মর্যাদাঃ আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর *'খলিফা'* বা

প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। এর অর্থ হলো, মানুষ পৃথিবীতে ক্ষমতার আসল মালিক নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া আমানত বা ক্ষমতার ব্যবহারকারী মাত্র।

সীমাবদ্ধ ক্ষমতা: একজন শাসক বা সংসদ আল্লাহর আইন বা শরীয়ার সীমার ভেতরে থেকে শাসন পরিচালনা করতে পারেন। আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোনো আইন তৈরি করার অধিকার মানুষের নেই।

আমানতদারিতা: ক্ষমতা একটি পরীক্ষা। শাসককে তার প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য পরকালে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলামি সার্বভৌমত্বের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণাটি মূলত কয়েকটি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

শরীয়ার প্রাধান্যঃ ইসলামি রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ আইন হলো **পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ**। রাষ্ট্রের সংবিধান বা যেকোনো আইনকে অবশ্যই শরীয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যদি কোনো শাসক শরীয়া বিরোধী কোনো নির্দেশ দেন, তবে তা অমান্য করা নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" (মিশকাত)*

শূরা বা পরামর্শ ভিত্তিক শাসনঃ যদিও সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, কিন্তু দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার জন্য শাসককে জনগণের বা বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করতে হয়। একে বলা হয় *'শূরা'।*কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—*"এবং তাদের (মুসলিমদের) কাজকর্ম সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।" (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)*

আইনের চোখে সবাই সমানঃ ইসলামি সার্বভৌমত্বে শাসক নিজে আইনের ঊর্ধ্বে নন। খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানকেও সাধারণ নাগরিকের মতোই আদালতের মুখোমুখি হতে হয়। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন: *"আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করব, আপনারা ততদিন আমার আনুগত্য করবেন। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হই, তবে আমার প্রতি আপনাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"*

আধুনিক বনাম ইসলামি সার্বভৌমত্ব (পার্থক্য)

বিষয়	আধুনিক/পশ্চিমা ধারণা	ইসলামি ধারণা
সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক	জনগণ, সংসদ বা রাষ্ট্রপ্রধান।	একমাত্র মহান আল্লাহ।
আইন প্রণয়ন	মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো আইন তৈরি বা পরিবর্তন করতে পারে।	আইন প্রণয়ন কেবল শরীয়ার সীমানার ভেতরেই সম্ভব (ইজতিহাদ)।
জবাবদিহিতা	মূলত জনগণের কাছে (পরবর্তী নির্বাচনে)	প্রথমত আল্লাহর কাছে (পরকালে), দ্বিতীয়ত জনগণের কাছে।
নৈতিকতা ও রাজনীতি	রাজনীতি ও ধর্মকে আলাদা রাখা হয় (ধর্মনিরপেক্ষতা)।	প্রথমত আল্লাহর কাছে (পরকালে), দ্বিতীয়ত জনগণের কাছে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, সার্বভৌমত্ব কোনো মানুষের বা মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত হতে পারে না। মানুষ কেবল আল্লাহর দেওয়া সীমানার মধ্যে থেকে আইন বাস্তবায়ন ও প্রশাসনিক তদারকি করতে পারে। তাই ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি হলো—*"সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব ও আমানত) মানুষের।"*

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে খিলাফত

১৯২৪ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে অটোমান বা উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর, মুসলিম বিশ্বে একক রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা খিলাফতের প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বের অবসান ঘটে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে খিলাফতের ধারণাটি আর কোনো একক বাস্তব রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি *তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বে* রূপ নিয়েছে।উসমানীয় (অটোমান) সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত খিলাফতের ধারণাটি মুসলিম সমাজে প্রধানত *চারটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা চিন্তাধারায়* চর্চা হচ্ছে।

১. আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণঃ অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এবং সুফি ঘরানার আলেমদের কাছে খিলাফত এখন কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা নয়, বরং একটি আত্মিক বিষয়। মানুষের অন্তরে আল্লাহর দাসত্ব এবং রাসুলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাই হলো আসল খিলাফত। ব্যক্তি যদি নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজে ইসলামের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তারা রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে *ব্যক্তি গঠন ও আত্মশুদ্ধিকে (তাজকিয়াহ)* অগ্রাধিকার দেন।

২. আধুনিক বৈশ্বিক ঐক্য বা প্যান-ইসলামিজমঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এবং বহু ইসলামি চিন্তাবিদ মনে করেন, বর্তমান যুগে একজন মাত্র শাসকের অধীনে পুরো বিশ্বকে নিয়ে আসা বাস্তবসম্মত নয়। এর বদলে তারা *"মুসলিম ব্লকের"* ধারণা দেন।ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মতো মুসলিম দেশগুলোর একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট থাকবে।কমন কারেন্সি (যেমন: ইসলামি দিনার), মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এবং একটি যৌথ সামরিক বাহিনী গঠন করা। এর মাধ্যমে প্রতিটি দেশ স্বাধীন থাকবে, কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে তারা একটি একক শক্তি বা 'উম্মাহ' হিসেবে কাজ করবে (যা খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য)।

৩. রাজনৈতিক ও সংস্কারবাদী আন্দোলনঃ বিভিন্ন ইসলামি রাজনৈতিক দল ও সংগঠন খিলাফতকে আধুনিক সেক্যুলার বা পশ্চিমা ব্যবস্থার বিকল্প একটি *আদর্শ শাসনব্যবস্থা* হিসেবে প্রচার করে।তারা মনে করেন, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং জনমত গঠনের মাধ্যমে সমাজকে প্রস্তুত করতে হবে।পর্যায়ক্রমে মুসলিম দেশগুলোর সংবিধানে শরীয়া আইনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটানো এবং একসময় তাদের মধ্যে ভৌগোলিক সীমানার প্রাচীর ভেঙে খিলাফতের আদলে ফেডারেশন গড়ে তোলা।

৪. চরমপন্থী বা উগ্রবাদী অপব্যাখ্যা (The Extremist Deviation)ঃ কিছু উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠী খিলাফতের পবিত্র আবেগকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।তারা আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক আইনকে পুরোপুরি অস্বীকার করে এবং অস্ত্রের জোরে ভূখণ্ড দখল করে 'খিলাফত' ঘোষণা করে (যেমন: ২০১৪ সালে আইএসআইএস-এর উত্থান)। মূলধারার মুসলিম বিশ্ব ও শীর্ষ আলেম সমাজ একে সম্পূর্ণ *প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা* করেছেন। কারণ, ইসলামে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল এবং নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে খিলাফত কায়েমের কোনো নিয়ম নেই।

বর্তমান বিশ্বের বড় বাস্তব চ্যালেঞ্জ ও খিলাফতের "বাস্তবতা"

বাস্তবতার নিরিখে আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদদের বড় অংশ মনে করেন—আজকের দিনে একক একজন খলিফা খোঁজার চেয়ে, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন, আইনের শাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই খিলাফতের মূল চেতনাকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র বাস্তবসম্মত উপায়। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে খিলাফত এখন আর

কোনো *"চলমান শাসনব্যবস্থা"* নয়, বরং এটি মুসলমানদের একটি *"আদর্শিক লক্ষ্য ও প্রেরণা"*। কারন-

ভৌগোলিক বাস্তবতা: একটি অসম্ভব দেয়ালঃ আজকের মুসলিম বিশ্ব ৫0টিরও বেশি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রে (Nation-States) বিভক্ত।বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, সৌদি আরব বা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর নিজস্ব সংবিধান, জাতীয় পতাকা, সেনাবাহিনী এবং ভৌগোলিক সীমানা রয়েছে।কোনো দেশই তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো দেশের (বা একজন খলিফার) অধীনে চলে যেতে রাজি হবে না। উদাহরণস্বরূপ, সৌদি আরব বা তুরস্ক কেউই চাইবে না অন্য দেশ থেকে এসে কেউ তাদের ওপর শাসন করুক।

অর্থনৈতিক ও আইনি বাস্তবতা:বর্তমান পুরো পৃথিবী একটি একক অর্থনৈতিক ও আইনি কাঠামোর সুতোয় বাঁধা।আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা (SWIFT), জাতিসংঘ (UN) এবং আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা বর্তমান বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত। খিলাফত ব্যবস্থা মূলত সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাংকিং (সুদমুক্ত) ও নিজস্ব আইনি (শরীয়া) কাঠামোতে বিশ্বাসী। আজকের দিনে কোনো দেশ যদি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বা বিশ্বব্যাংকের এই বৈশ্বিক জাল থেকে বের হয়ে একক খিলাফত রাষ্ট্র ঘোষণা করতে চায়, তবে মুহূর্তের মধ্যে চরম অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা (Sanctions) এবং সামরিক আক্রমণের মুখে পড়বে।

অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা: মুসলিমরা ধর্মীয়ভাবে এক 'উম্মাহ' হলেও রাজনৈতিক বা মাজহাবি (দলীয়) দিক থেকে চরমভাবে বিভক্ত। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব (যেমন: ইরান ও সৌদি আরবের রাজনৈতিক বৈরিতা) এবং আরব-অনারব মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব অত্যন্ত প্রকট। যদি কখনো খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়াও হয়, তবে প্রথম প্রশ্ন উঠবে—*"খলিফা কে হবেন?"* একজন তুর্কি, একজন আরব নাকি একজন এশীয়? কোন ফিকহ বা মাজহাব অনুযায়ী আইন চলবে? এই প্রশ্নের সমাধান মুসলিম বিশ্বের কাছে আজ তৈরি নেই।

তাহলে বর্তমান খিলাফত আন্দোলনের "বাস্তব" রূপটি কী?

বাস্তবতার নিরিখে খিলাফতের আন্দোলন বা চিন্তাধারা এখন ৩টি রূপে টিকে আছে:

এটি একটি রাজনৈতিক স্লোগান: অনেক ইসলামি দল ভোটারদের আকৃষ্ট করতে বা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য 'খিলাফত' শব্দটিকে একটি রোমান্টিক স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে।

চরমপন্থীদের হাতিয়ার: আইএসআইএস (ISIS)-এর মতো দলগুলো খিলাফতের এই পবিত্র আবেগকে পুঁজি করে তরুণদের মগজ ধোলাই করে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়।

একটি অবাস্তবায়িত স্বপ্ন বা নস্টালজিয়া: সাধারণ মুসলমানদের কাছে এটি অতীত গৌরবের একটি স্মৃতি মাত্র। যখনই মুসলিম বিশ্বে কোনো সংকট বা নির্যাতন (যেমন ফিলিস্তিন বা উইঘুর ইস্যু) তৈরি হয়, তখন মুসলমানরা অনুভব করে—"*আহা! আমাদের যদি একজন অভিভাবক বা খলিফা থাকত, তবে আজ এই দশা হতো না।*"

তাই আধুনিক চিন্তাবিদদের চোখে "বিকল্প বাস্তবতা"

আজকের যুগের শীর্ষস্থানীয় ইসলামি গবেষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শত বছর আগের সেই উসমানীয় বা আব্বাসীয় খিলাফতের হুবহু মডেল আজ আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এর বদলে বাস্তবসম্মত সমাধান হলো:

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মতো মডেল: মুসলিম দেশগুলো নিজেদের স্বাধীনতা ঠিক রেখেই একটি শক্তিশালী *"মুসলিম ব্লক"* তৈরি করতে পারে। যেখানে সবার একটি যৌথ মুদ্রা (যেমন: ইসলামি দিনার) থাকবে, সীমানা শিথিল থাকবে এবং একটি যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি থাকবে।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার: বাইরে খিলাফতের চিৎকার না করে, যার যার নিজের দেশে দুর্নীতি রোধ করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, অর্থনৈতিক সমতা আনা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (যা খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য ছিল) কায়েম করা।
বর্তমান বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক বা ভৌগোলিক "খিলাফত রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করা একটি রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক অসম্ভবতা। তবে মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত ঐক্য গড়ে তোলা অত্যন্ত সম্ভব এবং সময়ের দাবি।

খিলাফতের বাধা কারা?

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত পুনর্জাগরণের পথটি অত্যন্ত জটিল ও বহুবিধ চ্যালেঞ্জে আমূল বাধাগ্রস্ত। খিলাফত প্রতিষ্ঠার বাধাসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়:

১. বাহ্যিক ও বৈশ্বিক বাধাঃ

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা এবং পশ্চিমা আধিপত্য: বর্তমান জাতিসংঘ (UN), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এবং বিশ্বব্যাংক (World Bank) নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এবং পুঁজিবাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই পরাশক্তিগুলো এমন যেকোনো শাসনতান্ত্রিক আদর্শের ঘোর বিরোধী যা তাদের তৈরি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে যেতে চায়।
জাতিরাষ্ট্রের (Nation-State) কৃত্রিম সীমানা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর 'সাইকস-পিকট চুক্তি' (Sykes-Picot Agreement)-র মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমানায় টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। এই জাতিরাষ্ট্রের ধারণা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ (Nationalism) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একত্বের পথে সবচেয়ে বড় মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল।
ইসলামোফোবিয়া এবং মিডিয়া প্রোপাগান্ডা: বৈশ্বিক গণমাধ্যমগুলোতে 'খিলাফত' শব্দটিকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে উগ্রবাদ, মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং সন্ত্রাসের সমার্থক হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। ফলে অমুসলিম তো বটেই, সাধারণ মুসলিমদের একটি বড় অংশের মনেও খিলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের ভীতি ও ভুল ধারণা তৈরি করা হয়েছে।
ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ: মুসলিম বিশ্বের যেকোনো অঞ্চলে ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক উত্থান ঘটলেই আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলো সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (যেমন: অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা সামরিক আগ্রাসন) হস্তক্ষেপ করে তা নস্যাৎ করে দেয়।

২. অভ্যন্তরীণ ও উম্মাহগত বাধাঃ

মুসলিম শাসকগোষ্ঠীর অনীহা ও আনুগত্য: বর্তমান মুসলিম দেশগুলোর অধিকাংশ শাসকই পশ্চিমা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল এবং তারা স্ব-স্ব ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে বিশ্বব্যবস্থার অনুগত। শরিয়াহভিত্তিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলে তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটবে, এই ভয়ে তারা নিজেই খিলাফতের ধারণার বড় বিরোধী।
মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঔপনিবেশিকতা (Mental Colonization): সুদীর্ঘকাল পশ্চিমা উপনিবেশে (Colonialism) থাকার কারণে মুসলিম সমাজের শিক্ষিত ও নীতিনির্ধারক শ্রেণীর একটি বড় অংশ মানসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধভাবে অনুগত হয়ে পড়েছে। তারা মনে করে ইসলাম কেবল একটি ব্যক্তিগত উপাসনার ধর্ম, রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা এর নেই।

উম্মাহর অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও উপদলীয় কোন্দল: বর্তমান মুসলিম বিশ্ব শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব, গোত্রবাদ এবং নানা ধরনের সালাফি, সুফি বা রাজনৈতিক দল-উপদলে বিভক্ত। এই চরম অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ির কারণে একটি সর্বজনীন খিলাফতের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা উম্মাহর মধ্যে অনুপস্থিত।

তাত্ত্বিক ও বাস্তবমুখী গবেষণার (ইজতিহাদ) অভাব: সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি বড় অংশ খিলাফত বলতে কেবল অতীতের উমাইয়া বা আব্বাসীয় মডেলকে হুবহু বোঝেন। আধুনিক জটিল অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক আইন ও আমলাতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খিলাফতের একটি 'আধুনিক ও বাস্তবসম্মত রূপরেখা' দাঁড় করাতে না পারাটা একটি বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যর্থতা।

আবেগসর্বস্ব ও উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উত্থান: অতীতে কিছু উগ্রপন্থী ও চরমপন্থী সংগঠন (যেমন: আইএসআইএল বা দায়েশ) ইসলামের মূলনীতির বাইরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া 'খিলাফত' ঘোষণা করে সাধারণ মানুষের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, তা বিশ্বব্যাপী খিলাফতের পবিত্র ধারণাকে চরমভাবে কলঙ্কিত করেছে। এটি সত্যিকারের খিলাফত আন্দোলনের জন্য একটি বড় অভ্যন্তরীণ ধাক্কা।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাহ্যিক শত্রুদের ষড়যন্ত্র যতটা না দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী মুসলিম উম্মাহর নিজেদের অভ্যন্তরীণ নৈতিক অবক্ষয়, বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব এবং নেতৃত্বের কোন্দল। তাই বাহ্যিক বাধা দূর করার আগে অভ্যন্তরীণ বাধাগুলো দূর করাই প্রকৃত গবেষণার সারবত্তা।

খিলাফত বাস্তবায়নে সাধারন মানুষের করনীয়

তাত্ত্বিক আলোচনা এবং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে—*"একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার এখন কী করা উচিত?"* ইসলামি স্কলার, চিন্তাবিদ এবং গবেষকদের মতে, খিলাফতের মতো একটি বৃহৎ ও আদর্শিক শাসনব্যবস্থা একদিনে বা কোনো জাদুবলে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এর জন্য সমাজের একদম নিচু স্তর থেকে বা ব্যক্তিজীবন থেকে পরিবর্তন শুরু করতে হয়। বর্তমান যুগে খিলাফতের আদর্শ ও চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে একজন সাধারণ মানুষের ৫টি প্রধান করণীয় হলো:

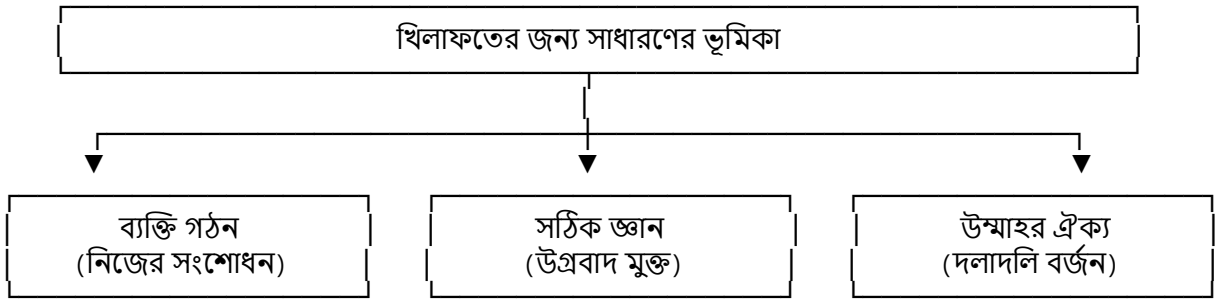
১. নিজের জীবনে ইসলামের পূর্ণ প্রতিফলন (ব্যক্তিগত খিলাফত)ঃ ইসলামের পরিভাষায়, প্রতিটি মানুষই আল্লাহর জমিনে একেকজন 'খলিফা' বা প্রতিনিধি। তাই রাষ্ট্রীয় খিলাফতের স্বপ্ন দেখার আগে নিজের ওপর ইসলামের হুকুম কায়েম করা জরুরি। নিজের ইবাদত (নামাজ, রোজা), সততা, এবং নৈতিকতা ঠিক করা। আপনি যদি একজন ব্যবসায়ী হন—ব্যবসায়ে সততা বজায় রাখা; যদি চাকরিজীবী হন—ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে দূরে থাকা। নিজের পরিবারে দ্বীন চর্চা বাড়ানো।

২. ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান অর্জনঃ খিলাফতের নামে বর্তমান বিশ্বে অনেক উগ্রপন্থা ও ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে। তাই সঠিক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। আবেগ দিয়ে না চলে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের সোনালী ইতিহাস (বিশেষ করে খিলাফতে রাশেদার যুগ) গভীরভাবে অধ্যায়ন করা। ইসলামি রাজনীতি, অর্থনীতি (সুদমুক্ত ব্যাংকিং) এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে পড়ালেখা করা, যাতে কেউ খিলাফতের ভুল বা উগ্র ব্যাখ্যা দিয়ে মগজ ধোলাই করতে না পারে।

৩. উগ্রপন্থা পরিহার এবং শান্তির বার্তা ছড়ানোঃআজকের দিনে খিলাফতের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলো (যেমন: ISIS)। তারা অস্ত্রের জোরে সাধারণ মানুষ হত্যা করে খিলাফত কায়েম করতে চেয়েছে, যা ইসলাম সমর্থন করে না। সব ধরনের উগ্রবাদ, চরমপন্থা ও

হিংসাত্মক পথ পরিহার করা। ইসলাম যে শান্তি, সুশাসন ও ন্যায়বিচারের ধর্ম—তা নিজের আচরণ দিয়ে প্রমাণ করা। সমাজে পরমতসহিষ্ণুতা (অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা) ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।
৪. মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করা (বিভাজন দূর করা)ঃ খিলাফত না থাকার কারণে মুসলিমরা আজ শিয়া-সুন্নি, হানাফি-লা মাযহাবি বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে উপদলে বিভক্ত। সাধারণ মানুষ হিসেবে এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এবং দলাদলি থেকে দূরে থাকা। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়াতে ভূমিকা রাখা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিতর্ক না করে ইসলামের মৌলিক ও বড় বিষয়গুলোতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো।
৫. সমাজসেবা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাঃ খিলাফতের মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষের সেবা করা এবং সমাজে জাস্টিস বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ওমর (রা.)-এর যুগে খিলাফতের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ক্ষুধার্ত মানুষের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিত। নিজ এলাকায় সামাজিক কাজে অংশ নেওয়া। গরিব, অসহায় ও এতিমদের পাশে দাঁড়ানো। সমাজে অন্যায়, জুলুম বা হকের অপচয় দেখলে নিজের সাধ্যমতো (আইন নিজের হাতে না তুলে) তার প্রতিবাদ করা এবং সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখা।

এক নজরে সাধারণ মানুষের পদক্ষেপ



ইসলামের বিখ্যাত পণ্ডিতদের মতে—*"তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জমিনে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ফিরিয়ে দেবেন।"*

তাই একজন সাধারণ মানুষের মূল কাজ হলো কোনো সহিংস আন্দোলনে না জড়িয়ে নিজেকে একজন আদর্শ, সৎ, শিক্ষিত ও পরোপকারী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা। এটিই খিলাফত ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় এবং বাস্তব ভিত্তি।

উপসংহার

মানবজাতির কল্যাণ, সামাজিক সাম্য এবং পরম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা ও খিলাফত একটি শাশ্বত ও অনন্য মডেল। এই সুদীর্ঘ গবেষণায় খিলাফতের ঐতিহাসিক বিবর্তন, আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনের সাথে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রাসঙ্গিকতা ও চ্যালেঞ্জসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে ঐশী ও মানবিক শাসনের সূচনা হয়েছিল, তা কেবল একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ছিল না; বরং তা ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বৈপ্লবিক ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্রদর্শন। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ছিল খিলাফতের আদর্শিক ও স্বর্ণালী সময়, যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, শুরা (পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত), এবং 'আদল' (ন্যায়বিচার) এর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছিল। পরবর্তীকালে উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং উসমানীয় (অটোমান) খিলাফতের যুগে শাসনব্যবস্থার রূপরেখায় কিছুটা রাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটলেও, এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামি খিলাফত বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি,

অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে উসমানীয় খিলাফতের পতন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ ছিল, যা তাদের বৈশ্বিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। খিলাফতের এই গৌরবময় ইতিহাসের বিপরীতে সমকালীন বিশ্বে প্রচলিত আধুনিক 'ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র' এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই গবেষণায় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধাগুলো স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্র বহুলাংশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বৈরাচার, পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ, নৈতিক অবক্ষয় এবং সীমাহীন দুর্নীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। যেখানে মানুষের তৈরি আইন প্রতিনিয়ত শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে, সেখানে ইসলামি খিলাফত স্রষ্টার আইনের অধীনস্থ হওয়ায় তা ধনী-দরিদ্র ও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার নিশ্চিত করে। ফলে, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার শোষণ ও বৈষম্যের বিপরীতে খিলাফত এক অপরাজেয় ও মানবিক বিকল্প হিসেবে প্রমাণিত হয়। তবে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে খিলাফত ব্যবস্থার পুনর্জাগরণের পথটি সহজ নয়। এই গবেষণায় চিহ্নিত হয়েছে যে, সমকালীন ভূ-রাজনীতি, জাতীয়তাবাদের কৃত্রিম দেয়াল, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের একপেশে নীতি, মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক আধিপত্য—খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রধান বৈশ্বিক বাধা। এই জটিল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর করণীয় আজ অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। খিলাফত কোনো আকস্মিক রাজনৈতিক বিপ্লবের বিষয় নয়, বরং এটি একটি সুদীর্ঘ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। মুসলিমদের প্রথম করণীয় হলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক পুনর্জাগরণ ঘটানো। ইসলামি রাষ্ট্রদর্শনের সঠিক ও আধুনিক উপস্থাপন, ইজতিহাদের (গবেষণা) মাধ্যমে সমকালীন অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্যার ইসলামি সমাধান বের করা এবং সমাজস্তরে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সংস্কার সাধন করা অপরিহার্য। একই সাথে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধাপে ধাপে একটি ব্লক বা জোট গঠন করা প্রয়োজন, যা ভবিষ্যতে বৃহত্তর ঐক্য তথা খিলাফতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলিম বিশ্ব যে নেতৃত্বহীনতা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো খিলাফতের আদর্শে ফিরে যাওয়া। এই থিসিসটি এটিই প্রমাণ করে যে, খিলাফত কেবল অতীতের কোনো হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় নয়, বরং এটি বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের একমাত্র টেকসই ও ঐশী সমাধান। যুগে যুগে রূপ পরিবর্তিত হলেও, ইসলামের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতিসমূহ শাশ্বত; আর তাই সঠিক কৌশল, নৈতিক নেতৃত্ব এবং অবিচল ঈমানী দূরদর্শিতার মাধ্যমে খিলাফতের পুনর্জাগরণ কেবল একটি আদর্শিক স্বপ্ন নয়, বরং মানবতার মুক্তির জন্য একটি অনিবার্য ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনাঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনতান্ত্রিক আদর্শ, পরবর্তী খিলাফতসমূহের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক গণতন্ত্রের কাঠামোগত ব্যর্থতা পর্যালোচনার পর, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামি শাসন ব্যবস্থার পুনর্জাগরণ ও মুসলিম উম্মাহর উত্তরণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করা জরুরি:

বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক পুনর্জাগরণঃ খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ কোনো রাজনৈতিক অভ্যুত্থান নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কার। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের সমান্তরালে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক দর্শনকে অ্যাকাডেমিক ও

প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারার যে আধিপত্য মুসলিম মানসে জেঁকে বসেছে, তা দূর করতে একটি বিকল্প ও শক্তিশালী ইসলামি বয়ান (Narrative) তৈরি করতে হবে।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে ইজতিহাদের (গবেষণা) দ্বার উন্মোচনঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের মূলনীতিগুলোকে অক্ষুণ্ন রেখে আধুনিক জটিল রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিচালনার জন্য 'ইজতিহাদ' বা সমকালীন গবেষণার ওপর সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে। আধুনিক ব্যাংকিং, আন্তর্জাতিক চুক্তি, কর ব্যবস্থা, এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ইসলামি সমাধান কী হবে, তা সমকালীন ফকীহ ও বিশেষজ্ঞদের যৌথভাবে নির্ধারণ করতে হবে। খিলাফতকে কেবল 'অতীতের ইতিহাস' হিসেবে না রেখে 'ভবিষ্যতের আধুনিক রূপরেখা' হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

ধাপে ধাপে আঞ্চলিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠনঃ বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং জাতিরাষ্ট্রের (Nation-State) সীমানা ডিঙিয়ে রাতারাতি একটি একক বিশ্ব খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। তাই ভবিষ্যৎ কৌশল হতে হবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

প্রথম ধাপ: মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্লক তৈরি করা (যেমন: নিজস্ব মুদ্রা বা কমন মার্কেট)

দ্বিতীয় ধাপ: সামরিক ও কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধি করে ন্যাটো (NATO) এর মতো শক্তিশালী জোট গঠন করা। এই আঞ্চলিক জোটগুলোই একসময় বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য বা খিলাফতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

যোগ্য ও নৈতিক নেতৃত্ব তৈরিঃইসলামি শাসন ব্যবস্থার মূল প্রাণশক্তি হলো শাসকের তাকওয়া বা নৈতিকতা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্য থেকে এমন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে যেমন পারদর্শী হবেন, তেমনি ইসলামি শরিয়াহ ও নীতিশাস্ত্রে হবেন আপসহীন। নেতৃত্ব তৈরির এই প্রক্রিয়াটি শুরু হতে হবে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের স্তর থেকে।

আধুনিক গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারঃ বিশ্ববাসীর সামনে আধুনিক পশ্চিমা গণতন্ত্রের অসুবিধাগুলো (যেমন: পুঁজিপতিদের আধিপত্য, নৈতিক অবক্ষয়, নীতিহীন আইন প্রণয়ন) যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে হবে। এর বিপরীতে খিলাফত ব্যবস্থা কীভাবে মানুষের তৈরি আইনের বদলে স্রষ্টার আইনের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মানবাধিকার, সাম্য এবং অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে, তা বিশ্বমঞ্চে প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে হবে।

অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের স্পষ্ট রূপরেখা তৈরিঃ ভবিষ্যৎ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল, ইজ্জত এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার শতভাগ নিশ্চয়তা মদিনা সনদ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের আলোকে পুনর্ব্যক্ত করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia) বা ইসলামভীতি দূর করতে এটি অত্যন্ত জরুরি, যেন বিশ্ববাসী বুঝতে পারে খিলাফত কোনো উগ্রবাদ নয়, বরং সবার জন্য শান্তির গ্যারান্টি।

সংক্ষেপে, ভবিষ্যতের মূল মন্ত্র হতে হবে—*"আদর্শিক সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং ধাপে ধাপে কৌশলগত ঐক্য।"* আবেগভিত্তিক বা হঠকারী কোনো পদক্ষেপ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মক্কী জীবনের ধৈর্য ও প্রস্তুতি এবং মাদানী জীবনের দূরদর্শিতাকে ধারণ করেই মুসলিম উম্মাহকে তার হারানো গৌরব ও খিলাফত ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে।

সমাপ্ত